শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

২৫টি নতুন ভূত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
২৫টি
নতুন
ভূত

২৫টি নতুন ভূত

২৫টি নতুন ভূত

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পা রু ল

ভূমিকা

পঁচিশটি নতুন ভূতের গল্প এক অভিনব পরিকল্পনা। এই সংকলনে গ্রথিত গল্পগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, সরাসরি সংকলনে স্থান পেয়েছে। কাজেই পাঠকদের একবার পড়া গল্প আবার পড়ার বিরক্তি থাকছে না।

লেখকরা সকলেই অল্পবিস্তর পাঠকমহলে পরিচিত। কাজেই তাঁদের সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। প্রশ্ন তো আছেই। ভূত আছে কি নেই—এই সনাতন প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি হয়রান হয়েছি কম নয়। থাক বা না-থাক, তাদের নিয়ে গল্প লিখতে তো অসুবিধে নেই। কত নেই জিনিস নিয়েই তো গল্প লেখা হয়।

পারুল প্রকাশনী এরকম নানা পরিকল্পনায় বই ছেপে থাকা প্রকাশনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষারও প্রয়োজন আছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচি

ভূতের পাল্লায়

শক্তিপদ রাজগুরু

বন-পাহাড়ে ঘোরা, আমাকে যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। তাই দিশাহীন হয়ে বের হয়ে পড়তাম। ভারতের বহু অরণ্যে। মায় দুর্গম সুন্দরবনের গভীরে নৌকাতেই কাঠুরিয়াদের সাথে বেশ কিছুদিন বাসও করেছি। এইসব যাত্রায় মাত্র সমীরই আমার সঙ্গী হয়েছে। অন্য বন্ধুরা বিপদসংকুল এই অরণ্যজীবনের সাথি হতে চায় না।

সেবার সারান্দা অরণ্যে যাচ্ছি। গভীর-গহিন অরণ্য। আর সাতশো পাহাড়ের দেশ সারান্দা। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। পাহাড়গুলোয় রয়েছে দামি আয়রন, নিকেল, তামা। আর প্রবাদ আছে এখানে নাকি কোন পাহাড়ে সোনার সন্ধানও পেয়েছেন তখনকার ইংরেজরা। তার প্রমাণ হিসেবে এখানের নদীর বালিতেও নাকি অনেকে সোনার কণা পায়। আর আছে হাতির দল। বাইসনের পাল। হরিণ-সম্বর তো আছেই। বনের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ভিতরে রয়েছে বনবিভাগের অফিস, ওখানেই রয়েছে দু-একটা বাংলো। সেই থলকাবাদ বনাঞ্চলেই আমাদের যাত্রা। বাইরের শহর থেকে সাতদিনের মতো চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল মায় আলু-পেঁয়াজ, দেশলাই-মোমবাতি, যা যা লাগে সবই তুলে নিতে হয়েছে। কারণ ওই গভীর অরণ্যে হাটবাজার নেই। সব রসদ নিয়ে জিপে তুলে যাত্রা শুরু হল বন-পাহাড়ের পথে।

গভীর অরণ্য। বিশাল গাছগুলোর গুঁড়িতে শ্যাওলা জমেছে। সূর্যের আলোও ঢোকে না। পাতা পড়ে রাস্তাই ঢেকে গেছে। গাছপালার ডাল ভেঙে পড়ে আছে। সমীর বলে,—এ কোথায় এলাম রে!

আমি বলি—বন-পাহাড়ের দেশে এসে বন দেখবি না, তাই কী হয়? বেশ আতঙ্কময় পরিবেশ। বন চলেছে চড়াই-এর পথে। আর্তনাদ করে সেও যেন তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো চলেছে। বেশ খানিক পাহাড় উতরাই পার হয়ে আমরা একটু ফাঁকা জায়গায় এসেছি। জায়গাটা বেশ সমতল, উপত্যকার মতো। চারদিকে গভীর বনে ঢাকা পাহাড়ের প্রহরা। এইটাই থলকাবাদ। ওদিকে বনবসতি। কিছু ছড়ানো-ছিটানো প্রাচীন শালগাছের নীচে আদিবাসীদের বসতি। একটা নদী ওই রহস্যাবৃত বন-পাহাড়ের বুক চিরে বের হয়ে এসেছে। নদীতে বালিই বেশি। সামান্য জলধারা বয়ে চলেছে। হাঁটুভোর স্বচ্ছ জলধারা, পাথরে ঘা খেয়ে চঞ্চল গতিতে ছুটছে মৃদু শব্দ তুলে। ড্রাইভার এদেশীয় লোক। এই বনে সে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আসে। সেই-ই বলে, সাবজি, এই সোনা নদী। এর বালিতে সোনার কণা খোঁজে আদিবাসীরা। এই বনে কোথাও নাকি সোনার পাহাড়ও আছে। সাহেবরা এখানে সোনার কারখানা গড়ার জন্য এসেছিলেন। ওদিকে একটা বাংলো। দেখে মনে হয় ইংরেজ আমলেই তৈরি। সমীর বলে,—এযে সাহেবি বাংলো রে! এখন সাহেব নেই, চল দেখি কী ব্যবস্থা আছে!

ড্রাইভার বলে—এখানেই থাকবেন নাকি? বনবাংলোতো ওদিকে, ফরেস্ট কলোনিতে!

এখানের পরিবেশটা মনোরম। একটা ছোটো পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিতে বাংলো। নীচ থেকে একটা মোরাম ঢালা পথ পাহাড়ের গায়ে পাক দিয়ে উপরে উঠেছে। সেই সোনা নদীটা পাহাড়ের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে বের হয়েছে। বাতাসে প্রবাহমান জলধারার গুঞ্জরন ওঠে। নদীর উপর একটা কাঠের ব্রিজও আছে। পাহাড়ের চারদিকে কলকে ফুলের বন। হলুদ ফুলে পথটা ঢেকে আছে। স্তব্ধতার মাঝে নদীর জলের শব্দ আর পাখিদের ডাক শোনা যায়। আমি বলি,

—চল না, যদি ওখানেই ঠাঁই পাই! সুন্দর পরিবেশ!

ড্রাইভার আর কথা বলে না। গাড়ি নিয়ে উপরের বাংলোর দিকে যেতে থাকে। ঘুরপাক খেয়ে পথটা পাহাড়ের উপর বাংলোর কাছে এসে থামল। এককালে বাংলোর সামনে সুন্দর বাগান ছিল। এখন সেই বাগানের চিহ্ন হিসেবে দু-চারটে ফুলের গাছ এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকি জায়গাটা আগাছায় ভরে গেছে। তবু বাংলোটা ঠিকঠাকই রয়েছে। দেখে মনে হয় লোকজনের যাতায়াত বেশি হয় না। চারদিকে স্তব্ধতা। কেউ আশপাশে নেই। দরজায় তালা। হাঁক পাড়ি,

—চৌকিদার, চৌকিদার—

কোনো সাড়া নেই! গাড়ি থেকে নেমে ওই আগাছার মধ্যে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠি। বারান্দাটা সাফসুতরো। চৌকিদারকে হাঁক দিই। হঠাৎ ঝোপের দিক থেকে একটা লোক দাঁড়ায়। ওদিকে কী যেন করছিল সে। লোকটাকে দেখে চমকে উঠি। ওর মুখের একদিকটা যেন খাবলানো। একটা চোখ স্থির। বাঁ-হাতটাও কেমন চোট খাওয়া। অন্য চোখটা বেশ জ্বলজ্বল করছে। ওর চেহারাটাই কেমন বীভৎস, বিকৃত।

লোকটা ভাঙা গলায় বলে,

—হামি, চৌকিদার আছে!

আমরা অবাক হয়ে চৌকিদারকে দেখছি। চৌকিদারও বুঝেছে তার দিকে চেয়ে চমকে উঠেছি। লোকটা সেই ভীত-চকিত ভাব কাটাবার জন্যই বলে,

—ভালুক হামাকে পাকড়েছিল। সেই ভালুককে হামভি খতম করে দিয়েছিলাম। লেকিন উভি এইসা জখমি করে দিল—

বুঝলাম, বনে এমন আরও বিকৃত চেহারার মানুষ আছে যারা কোনো পশুর সাথে লড়াই করে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

একটা ছোটো পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিতে বাংলো...

আমি বলি,—দরজা খোলো। এখানে ক-দিন থাকা যাবে তো?

লোকটা ইতিউতি করছে। আমরা যে থাকতে চাইছি এখানে, সেটা যেন ওর মনঃপূত নয়। বলে—ইখানে থাকবেন?

এসব চৌকিদারকে কী করে হাতে আনতে হয় তা বনে ঘুরে জেনেছি। পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলি,—তালা খোলো। ক-দিন তুমিও আমাদের খানা পাকাবে, সাথমে খাবে।

লোকটা টাকাটা ফতুয়ার পকেটে পুরে এবার নীরবে দরজার তালা খোলে।

বেশ সুন্দর ঘর। মেঝেতে স্যাটিং পাতা। ওদিকে দুটো খাট, বিছানাও রয়েচে। লাগোয়া বাথরুমও বেশ ভালোই। তবে জল আনতে হয় নীচে ওই নদী থেকে। বাংলোয় খান চারেক ঘর।

একটা ঘরই খুলেছে সে আমাদের জন্য। ওদিকে ব্রিটিশ আমলের ফায়ার প্লেস, চিমনি। দুটো জানলা খুলে দিতে ওদিকের ঘন জঙ্গলের দৃশ্য ভেসে ওঠে। সমীর বলে,

—ঘরটা ভালোই!

এর মধ্যে ড্রাইভার আমাদের মালপত্র সব নামিয়ে দিয়ে ত্রিশ কিলোমিটার বন পার হয়ে শহরে ফিরে যায়। আমরা সভ্যজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক-দিন থাকব এই বনের গভীরে। সাতদিন পর ও ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

জিপটা চলে যেতে আমাদের মনে হয় আমরা যেন সত্যিই বনবাসে নির্বাসিত হয়ে গেছি। বন-কলোনিও অনেক দূরে।

এখানে আমরা মাত্র দুজন। অবশ্যই চৌকিদারও আছে। ওর নাম সুখরাম। সে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে বাঁকে দু-দিকে দুটো বালতি ঝুলিয়ে ঝোরা থেকে জল নিয়ে এসেছে। ওদিকেই একটা টিনের চালায় রান্নার জায়গা। সেখানে কাঠের উনুনে রান্নাও চাপিয়েছে। লোকটা কথা কম বলে। তবে কাজটা ঠিকঠাকই করে।

ক্লান্ত দেহ। তাই দুপুরে খাওয়ার পর বেশ ছোটোখাটো ঘুমও দিয়ে উঠেছি। তখন রোদের তেজও কমে গেছে। চারদিকে উঁচু পাহাড়। বিকাল হতেই সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। তাই বিকাল এখানে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সন্ধ্যার ছায়া নামে বন-পাহাড়ে। বাংলোর বাগানের বাইরে ঠিক পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর বসার জায়গাও আছে। কাঠের পাটাতন করা একটা ছোটো বারান্দা মতো। নীচ থেকে গাছগুলোর মাথা পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে। সেখানে বসে আছি। বাতাসে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব শোনা যায়।

সুখরাম কাজে বেশ নিপুণ। বিকালের চা-টা এখানেই এনে বলে—সাবজি, রাতের খাবার বানিয়ে রেখে যাব, খেয়ে নেবেন। আমাকে বসতিতে ফিরতে হবে সন্ধ্যার পরই।

অবাক হই।—রাতে বাংলোয় থাকবে না?

সুখরাম বলে—নেহি সাব, ঘর যানা হ্যায়! ফিন সুবাহ মে চলে আসব হামি।

সমীরও বলে—রাতে এখানে থাকবে না তুমি?

—না, সাব,—ঘর যানা হ্যায়।

লোকটা তার মতামত জানিয়ে চলে গেল! আমি বলি,

—লোকটা ওইভাবে চলে গেল!

সমীর বলে—তাহলে রাতে আমরা দুজনে এখানে থাকব।

আমি বলি—থাকব! আরে বাব্বা, এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

কী করে রাত কাটল টেরই পাবি না।

তখন সন্ধ্যা নামছে। তারাগুলো মেঘমুক্ত আকাশের এখানে-ওখানে জ্বলজ্বল করছে। স্তব্ধ বাতাসে নদীর কলকল শব্দ শোনা যায়। আর বাতাসে মহুয়ার সুবাস যেন মাতাল করে দেয়। সুখরাম তার রাতের খাবার পোঁটলা বেঁধে যাবার জন্য তৈরি। বলে সে,—আব চলে সাবজি থোড়া হুঁশিয়ার, রহিয়েগা—আভি আন্দার যাইয়ে। বাহারমে হাতি-ভালু ভি আতা হ্যায় ইধার।

সাবধান বাণী শুনিয়ে সে হন হন করে চলে গেল। সারা বাংলোয় আমরা দুটি প্রাণী। চারদিকে অন্তহীন, স্তব্ধতা। পাহাড়ের নীচেই বনভূমি। বন কাঁপিয়ে শাঁখের আওয়াজের মতো শব্দ ভেসে আসে। বুনো হাতির পাল কালো পাথরের মতো চলমান কয়েকটা জীব নদীর জল খাচ্ছে। উপর থেকে অস্পষ্ট দেখা যায় তাদের। সমীর বলে,—বুনো হাতির পাল।

আমরাও এবার উঠে বাংলোয় আসি। বাইরে থাকা সত্যিই নিরাপদ নয়। কে জানে, ভাল্লুকও আসবে এবার মহুয়া ফুল খেতে। হ্যারিকেনের ম্লান আলো জ্বলছে। ঘরের ভিতর পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া, আলোর আভাস।

আমাদের চলমান ছায়াগুলোই যেন রহস্যময় হয়ে কী বিচিত্র শিহরণ তোলে মনে। দুজনে পাশাপাশি বসে যেন কী অজানা একটা ভয়ে কথা বলতেও ভুলে গেছি। মন থেকে সেই অহেতুক আতঙ্কের ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য বলি—চল, পেসেন্স খেলি। তাস বের কর। রাত তো সবে আটটা।

সমীর ব্যাগ থেকে তাস বের করে। কিন্তু খেলাতেও মন বসে না। স্তব্ধ বাংলোয় আমরা ছাড়াও যেন আরও কারও অস্তিত্ব টের পাই। দরজায় যেন শব্দ ওঠে—খটখট! ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেখা যায় জানলার বাইরের গাছগাছালি। কে যেন ডাকছে। সমীর দরজা খুলতে যাবে। আমিই বাধা দিই।

—দাঁড়া, কে এল আগে দেখি।

জানলা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে দেখা যায় একটা বড়োসড়ো কালো লোমশভালুক বারান্দায় উঠে এসে পিছন দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারছে। সমীরকে বলি,

—কাকে দরজা খুলে ঘরে আসতে দিচ্ছিলি দ্যাখ!

ভালুকটা তখন দরজা ঠেলেই চলেছে নির্বিকার ভাবে। ওকে তাড়াতে হবে। একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে বাইরে জানলা দিয়ে তার দিকে ছুড়ে দিতে আগুন দেখে সে পালাল। সমীর বলে,—কী সর্বনাশ হত বলত?

তখন কিছুটা সাহস আমরা ফিরে পেয়েছি। রাতে খাবার পর দুজনে শুয়ে শুয়ে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছি। হ্যারিকেনটা তবু জ্বেলে রেখেছি টিম টিম করে। রাত কত হবে জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সন্ধ্যার পর আকাশে কখন মেঘ জমেছিল দেখিনি। রাতে সেই মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকে ঘুম ভেঙে যায়। দুজনেই উঠে পড়েছি। দমকা হাওয়ায় জানলাটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত অরণ্য-পর্বত যেন মোহময়ী হয়ে উঠেছে। সেই দৃশ্য দেখার জন্যই জানলার সামনে এসেছি। ওদিকের বন্ধ ঘরে বেশ কয়েকটা জানলা ছিল। সেই ঘরটাই চেয়েছিলাম থাকার জন্য। সুখরাম ওই ঘরের চাবি খোলেনি। ওটা নাকি ভি আই পি রুম। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব দেখছি। হঠাৎ ওপাশে বন্ধ ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেল। দেখি একজন লম্বা চওড়া লোক, পরনে দামি স্যুট, হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক। মাথার হ্যাট নিয়ে বারান্দায় বের হয়ে এইদিকেই এগিয়ে আসছে। সমীর বলে—আর কেউ এসেছে নাকি?

ভদ্রলোক এদেশি নয়, বিদেশিই। তবে তার মুখচোখ দেখলে কেমন আতঙ্ক বোধ হয়। চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। চলছে কেমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে। জানলার কাছে এসেই দাঁড়াল সে। দেখছে এদিকে। এই সময় দমকা হাওয়ায় জানলাটা বন্ধ হয়ে যায়। আমিও লাফ দিয়ে ঘরে আসি। খোলা জানলাটা এবার ছিটকে খুলে যায়। ওদিকে বন্ধ দরজাও হাওয়ার প্রচণ্ড লাথিতে খুলে গেছে। বিদ্যুতের ঝলকে দেখতে পাই চোখের তারা দুটো যেন জ্বলছে লাল অঙ্গারের মতো। আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে হাতের লাঠিটা শক্ত করে তুলে। সমীর ভয়ে খাটের নীচে, আর সাহেবের উদ্যত লাঠি পড়েছে বিছানায়। সমীর থাকলে ওর ঘাড়েই লাঠির আঘাত পড়ত। এই আক্রমণে আমি হকচকিয়ে চিৎকার করি—কে আপনি? মারতে চান কেন?

লোকটা এবার সমীরকে বের করে নিজের পকেট থেকে রিভলবার বের করতে সমীর নিমেষের মধ্যে খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াল। সাহেবও তার পিছু নিয়েছে। ওরা বের হতে আমি ভাবছি, সমীরকে কেন মারতে এল লোকটা? বাইরে তখন চলেছে মেঘের গর্জন। সমীর কোথায় গেল জানি না।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় জানলাটা খুলে গেল।

বিদ্যুতের আলোয় দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই মূর্তি, হাতে পিস্তল। এবার তার চোখে বিজয়ীর হাসি। গলার স্বরটা কেমন গম্ভীর আর ফ্যাসফ্যাসেও। আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলে,—একটার ব্যবস্থা করেছি, এবার তোমার পালা!

সাহেব যে ভালো বাংলা জানে তা বোঝা গেল। আমি তখন ঘামছি। রাতদুপরে নির্জন বাংলোয় কোন খুনির পাল্লায় পড়লাম জানি না।

লোকটা এবার সমীরকে বের করে নিজের পকেট থেকে রিভলবার বের করতে সমীর নিমেষের মধ্যে খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াল...

সাহেব গর্জে ওঠে পিস্তল তুলে,

—কাম অন-কাম! তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করেছি। এখানে সব ব্যবস্থাই আছে।

ওর কণ্ঠস্বরে যেন একটা কী শক্তি আছে! লোকটা এবার আমাকে নিয়ে বন্ধ দরজার কাছে আসে। তখনও ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে গেছে। আমি বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে চলেছি। সাহেব আমাকে ওদিকের ঘরে এনেছে। জানি না কী করবে। ঘরের টেবিলটা মেঝের মাঝখানে। দেখি, কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে! ওটা ফাঁস নয়, যেন মৃত্যুফাঁদ। সাহেব বলে—এবার এই

টেবিলে উঠে গলায় ফাঁসটা পরো। আমি টেবিলটা সরিয়ে নেব। ওমনি দু-তিনটে ঝটকা। ব্যাস-ক্লিয়ার। কাম অন ইউ ব্লাডি ফুল!

এভাবে মরতে রাজি নই! একপাশে ফাঁসির দড়ি, অন্যদিকে রিভলবারের বুলেট! মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখব ভাবিনি। সমীরকেও শেষ করেছে। এবার আমাকেও শেষ করবে। আমি কিছু বলার চেষ্টা করি। সাহেব হেসে ওঠে,

—নো মারসি! আমাকেও কেউ দয়া করেনি। আমিও করব না। ফিনিশ-কাম অন।

এবার সে শক্ত হাতে আমার গলাটা ধরে। ঠান্ডা বরফের মতো হাত। মাংস নেই, যেন হাড়ের সমষ্টি। ওর স্পর্শে সারাদেহ শিউরে ওঠে। আমাকে সে টেবিলে তুলেছে! চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে!

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। কাদের কোলাহলে আর ঠান্ডা জলের ঝাপটায় চোখ মেলে দেখি, সামনে সমীর আর বেশ কয়েকজন লোক। সমীর বলে,—কেমন আছিস?

আমি অপলক চেয়ে আছি ওর দিকে। তখন ভোরের আলো ফুটেছে। ঝড়ও থেমে গেছে! আমি জিজ্ঞাসা করি,

—সেই খুনি সাহেবটা কোথায়?

এবার এগিয়ে আসে এখানের রেঞ্জ অফিসার। তিনিই বলেন,—বন-বাংলো থাকতে এই সাহেব ভূতের বাংলোয় এসেছিলে?

অবাক হই—সাহেব ভূত!

অফিসার বলেন—এখানে সোনার খনির প্রজেক্ট নিয়ে এক সাহেব এসেছিলেন। তিনিই এই বাংলো তৈরি করেন। তারপর প্রজেক্ট ফেল করায় দেউলিয়া হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করে। এখনও নাকি তার আত্মা ঝড়-বৃষ্টির রাতে সজীব হয়ে ওঠে। এইভাবে আগেও এই বাংলোয় মারা গেছে। সমীরবাবু গিয়ে খবর দিতে আমরাও এসে দেখি আপনি টেবিলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কী সর্বনাশ যে হত কে জানে!

সকালের আলো ফুটেছে। মেঘমুক্ত আকাশ! বৃষ্টির জলে সব মালিন্য মুছে শাল-পিয়াল বনে সবুজের স্নিগ্ধতা। আমরা সেই ভূত বাংলো থেকে বেরিয়ে বন বাংলোয় এসে উঠলাম। গত রাতের দুঃস্বপ্নের কথা ভুলে এই অরণ্য পর্বতের চিরসবুজ রূপকে উপভোগ করার সুযোগ হারাতে চাইনি।

এ কী আজব গল্প

শৈলেন ঘোষ

আমি তোতা। আমার নাম শুনে হাসছ না কি? ভাবছ নাকি? আমি পাখি? না, না, আমি পাখি নই। আমি তোমাদেরই মতো, তোমাদেরই এক বন্ধু। আমি তোমাদেরই মতো ইস্কুলে পড়ি। বাড়িতে আমার মা আছেন, বাবা আছেন। আর আমি তো আছিই। মা ঘর-সংসার সামলান। বাবা ইস্কুলে পড়ান। আমি ওই ইস্কুলেরই ক্লাস এইটের ছাত্র। বাবা ইস্কুলে অঙ্ক শেখান। বুঝতেই পারছ বাবা খুব ভালো অঙ্ক জানেন। কিন্তু মজার কথা কী, আমার সব ভালো, ওই অঙ্কতেই যত আতঙ্ক। তার মানে এই নয়, আমি অঙ্ক বুঝি একেবারেই পারি না। পারি। কিন্তু বাবা যা চান ততটা আমি পারি না। সে আর কী করা! বাবা সেটা ভালোই জানেন। তাই চাপও বেশি দেন না। এমনকী আমার ওপর রাগও করেন না। আশ্চর্য কী, আমি বাবাকে কোনোদিনই কারও ওপর রাগ করতে দেখিনি। বাবা রাগতে জানেন না। তা-ই ইস্কুলে মাস্টারমশায়রা যেমন বাবাকে খুব পছন্দ করেন, তেমনই ছাত্ররাও ভালোবাসে। ছাত্ররা তো ভালোবাসবেই। কেন-না, বাবা প্রথমেই ক্লাসে ঢুকে চক-খড়ি দিয়ে বোর্ডে নানান সংখ্যা লিখে অঙ্কের ধাঁধায় কারও মনকে হারিয়ে যেতে দেন না। হ্যাঁ, তিনি অঙ্কও শেখান, তার সঙ্গে গল্পও বলেন। বাবা যে কত গল্প জানেন আমি শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে যাই। আমি বাবার কাছেই শুনেছি, এই যে আমরা আজ এতসব ভোগের রসদ পাচ্ছি, এই যেমন ধরো টেলিভিশন থেকে হালফিল ফেসবুক পর্যন্ত, কিংবা ধরো ওয়াশিং মেশিন থেকে রেফ্রিজারেটার, অথবা রকেট ছুড়ে অন্য গ্রহের খবর সংগ্রহ, এর খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি বানাবার বুদ্ধিটা মানুষের মাথায় আসছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো গড়ছে কে? আমাদের হাত। আমাদের দু-হাতের দশটা আঙুল।

বটেই তো, তোমার শরীরে সব ঠিকঠাক আছে, অথচ দুটো হাত নেই! হাতের দশটা আঙুল নেই! কী হত তখন! ভাবলে ভয়ে ছমছম করে ওঠে বুকের ধুকধুকি। আরে বাবা মেশিন কি আর আঙুলের কাজ করতে পারে? তোমার বই-এর পাতা ওলটাবে কে? হাতের আঙুল। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার কলম ধরবে কে? হাতের আঙুল। কম্পিউটারের মাউস ঘোরাবে কে? হাতের আঙুল। তোমার পিঠ সুড়সুড় করছে, কে চুলকোবে? সে-ও হাতের আঙুল। হাত আর হাতের আঙুল ছাড়া তোমার মুখে কি খাবারই উঠত?

যাকগে যাক, এসব কথা ছাড়ান দাও! বাবার মনে এমনতর আরও কত যে গল্প জমা হয়ে আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। সে-সব গল্প বলতে গেলে আসলে আমার নিজের গল্পটাই বলা হবে না। সে এক সাংঘাতিক ঘটনা। সেই গল্পটাই বলি এবার।

সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবা আমায় সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে যেতেন। তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি। ছোটো ছিলুম বলে ছুটির পর ইস্কুল থেকে ফিরতুম বাবার সঙ্গে। এখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। বাবার সঙ্গে ইস্কুলে যাওয়ার সেই অভ্যেসটা এখন চালু আছে। তবে বড়ো হয়েছি বলে ইস্কুলের ছুটির পর এখন আর বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরি না। ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে হই-হই করে বাড়ি ফিরি। অবশ্য, এ ব্যাপারে বাবা কোনো আপত্তি করেননি কোনোদিন। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি থেকে ইস্কুলটা একটু দূরে। তবে, এমন নয় যে হাঁটতে হাঁটতে দমছুটে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে হাঁটতে মজাই লাগে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যখন বন্ধুরা যে-যার নিজের বাড়ি পৌঁছে যায়, তখন আমি একেবারে একা হয়ে পড়ি। তখনও আমাদের বাড়ির গলিটার নাগাল পেতে আমাকে আরও মিনিট পাঁচেক মুখ বুজে পা ফেলতে হয়! আমাদের বাড়ির গলিটা বেশ নির্জন। এই বিকেলেও তেমন লোকজন দেখা যায় না। এই গলির মুখ থেকে আমাদের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়।

গলিতে ঢুকেই আমি ছুটি। রোজ ছুটে বাড়ি ফিরতে আমার খুব মজা লাগে। কিন্তু একদিন যে এক ভয়ানক বিপদ আমার জন্যে ওত পেতে লুকিয়েছিল, সেটা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

রোজ যেমন হয়, সেদিনও তেমন ইস্কুলের ছুটির পর নিয়মমতো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছি। একে একে বন্ধুরাও যে-যার বাড়ির রাস্তা ধরল। আমিও খানিক একলা হেঁটে আমাদের বাড়ির গলির মুখে পৌঁছে গেলুম। ওমা! গলিতে ঢুকতে যাব, হঠাৎ কী হল কে জানে, একটা লোক কোত্থেকে ছুটে এসে আমার নাকের কাছে একটা রুমাল নেড়ে দিল। একটা অসহ্য ঝাঁঝাল গন্ধ আমার নাকে ঢুকতেই—আমি আর কিছু জানি না। মানে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, কেমন করে, কবে কোথায় আমার জ্ঞান ফিরল আমি জানি না। আমি যে-ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি, মনে হল, যে যেন আমারই বিছানা। দেওয়ালে যে-ছবিটা টাঙানো, তাতে দেখছি আঁকা একটা বাড়িতে আগুন লেগে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। দেখে, আমার কোনো হেলদোলই নেই। আমায় যে একটা লোক আমার নাকে রুমাল ঠেকিয়ে, ঝাঁঝাল গন্ধ শুঁকিয়ে, আমাকে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে, সেটা পর্যন্ত আমার মন থেকে উবে গেছে! এমনকী আমাদের যে একটা বাড়ি আছে, বাড়িতে আমার মা-বাবা আছেন, তা-ও আমার মন থেকে বিলকুল মুছে গেছে। আমার চোখে কিছুই উদ্ভট লাগছে না। মনেও কোনো ভয় নেই, চোখেও কোনো জল নেই। ভাবছ নিশ্চয়ই, কী আশ্চর্য! আশ্চর্যই বটে! কেন-না, আমার জ্ঞান ফেরার পর আমি বেমালুম উঠে বসতে পারলুম। উঠে বসতেই একটা হোঁতকা মতো লোক আমার সামনে এসে আগড়ুম-বাগড়ুম কী যে বকছে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। অথচ আমি যে তাকে দেখে, তার বকবকানি শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি, তেমনও নয়। উলটে আমি সিধেসাপটা তাকে বললুম, বেশ ঘুমিয়েছি।'

...একটা লোক কোত্থেকে ছুটে এসে আমার নাকের কাছে একটা রুমাল নেড়ে দিল...

এবার সেই হোঁতকা লোকটা আগড়ুম-বাগড়ুম বকবকানি থামিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'উঠে পড়ো। তাড়াতাড়ি মুখ হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। যেতে হবে। কী খাবি? কালকের মতো আলুর চপ মুড়ি, না মামলেট-টোস্ট?'

তোমাদের খুব আশ্চর্য লাগলে আমি আর কী করব! সত্যি বলতে কী, আজ নয়, কালও যে আমার নিয়মমতো ঘুম ভেঙেছিল, কাল যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি মুড়ি আলুর চপ খেয়েছি, একদম

খেয়াল নেই। আসলে, কাল সারাদিন যে কী করেছি, আর আজ যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে কোথায় যেতে হবে, তার একবর্ণও আমার জানা নেই। অথচ অবাক কথা, আমি লোকটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলুম, 'কাল যখন মুড়ি আলুর চপ খেয়েছি, আজ তবে মামলেট-টোস্টই হোক।'

তো, যেমন কথা, তেমনই মামলেট-টোস্টই খাওয়া হল। এবার কোথায় যাওয়া হবে তা তো জানি না।

'নে, এই প্যান্টটা আর শার্টটা পরে নে।' লোকটা অন্য আর একটা ঘর থেকে প্যান্ট-শার্টটা নিয়ে এসে আমায় দিলে। দেখে মনে হল নতুন আমি। চটপট পরেও ফেললুম। তারপর লোকটার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটা দিলুম। কোন রাস্তায় হাঁটছি, চেনা, না-অচেনা, হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাচ্ছি, এসব নিয়ে কোনো দুর্ভাবনাই আমার মনে চেপে বসল না।

এরই ফাঁকে হঠাৎ কানে এল ক-টা কুকুরের বেদম চিৎকারের ডাক, ঘেউ-উ, ঘেউ-উ! পেছন ফিরে দেখি, একটা লোক যাচ্ছে, তার কাঁধে একটা বাঁদর বসে। আর তা-ই দেখে একদল কুকুর ঘেউ-উ ঘেউ-উ করে তার পিছু নিয়েছে। দেখে তো আমি হেসে মরি। লোকটার কিন্তু থোড়াই কেয়ার। দিব্যি নির্ভয়ে হেঁটে চলেছে! আমি যে হোঁতকা লোকটার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, সে আমায় সাবধান করে বলল, 'এই, চুপ! চুপ! অমন করে হাসিস না। কুকুরে কামড়ে দেবে!'

আমি থতোমতো খেয়ে মুখের হাসি থামিয়ে ফেললুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম পেটের ভেতর হাসিটা দারুণ কিলবিল করছে। সেই হাসিটাকেই কোনো রকমে পেটের ভেতরই আটকে রেখে এগিয়ে চললুম।

আর একটুখানি হাঁটতেই কাঁধে-বাঁদর লোকটা একটা গলির পথে ঢুকল, আর আমরা যেমন সিধে পথে হাঁটছিলুম, তেমনই সিধে পথে চললুম। কিন্তু কুকুরগুলো আর লোকটার পিছু-পিছু গলিতে ঢুকল না। গলির মুখে কিছুক্ষণ ঘেউ-উ, ঘেউ-উ করে যে যার নিজের রাস্তা দেখল।

হোঁতকা লোকটা আমার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর খুব মজা লেগেছে না?'

আমি উত্তর দিলুম, 'মজা বলে মজা। দেখেছ, বাঁদরটা ওর কাঁধে বসে ল্যাজ দিয়ে গলাটা কেমন জড়িয়ে ধরে এদিক-ওদিক জুলজুল করে তাকাচ্ছিল!'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বাঁদর দেখলে খুব মজা লাগে না?'

আমি বললুম, 'মজা তো লাগেই, তার ওপরে ওদের রকমসকম দেখলে ভীষণ হাসি পায়।'

সে আবার বলল, 'কত রকমের জন্তু আছে বল পৃথিবীতে!'

আমি উত্তর দিলুম, 'আছেই তো। বাঘ-সিংহ থেকে শুরু করে....আমার কথা শেষ করতে না-দিয়ে, কথার মাঝখানেই সে জিজ্ঞেস করল, 'পৃথিবীতে এত যে জন্তু, তোর সবচে পছন্দ কোন জন্তু?'

আমি একনিশ্বাসে উত্তর দিলুম, 'ঘোড়া।'

লোকটা একটু অবাকই হল। বলল, 'সে কী রে! এত থাকতে ঘোড়া!'

আমি একটু হাসিমাখা মুখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণ—'

তাকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে আমি উত্তর দিলুম, 'ধুত! ঘোড়ার কাছে ওরা খোঁড়া।'

লোকটা এবার আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'ধর, তোকে যদি এখন আমি একটা ঘোড়া উপহার দিই, তুই কী করবি?'

'ঘোড়ার পিঠে বসব। বগল বাজিয়ে এদিক-ওদিক যেদিকে খুশি ছুটে বেড়াব।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুই ঘোড়ার নাচ দেখেছিস কোনোদিন?'

আমি উত্তর দিলুম, 'তা অবশ্য দেখিনি।'

'দেখবি।'

'দেখালে নিশ্চয়ই দেখব।'

'তবে চ, তোকে ঘোড়ার নাচ দেখিয়ে আনি।'

আমি বললুম, 'তাই চলো।' বলে আনন্দে ডগমগ করতে করতে লোকটার সঙ্গে আমি ঘোড়ার নাচ দেখতে চললুম সেই সিধে রাস্তাটা ধরে।

তোমাদের বলব কী, সেই হোঁতকা লোকটা যেখানে আমায় নিয়ে এল, সেখানটা দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। কী যে এলাহি কাণ্ড চলছে সেখানে, কী বলব! অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা তাঁবু খাটানো। সেটা যেমন উঁচু, তেমনই পেল্লাই। চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। সে বলল, 'চল, ভেতরে যাব।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এর ভেতরে ঘোড়ার নাচ হবে?'

সে বলল, 'শুধু ঘোড়ার নাচ নয়, ভেতরে আরও অনেক কিছু হবে। সার্কাস হবে, সার্কাস।'

আমি ক্লাস এইটে পড়ি তখন, এ কথা তোমরা সবাই জানো। বাবা কতবার যে আমায় সার্কাসে নিয়ে গেছেন, সে আর নতুন করে কী বলব। কিন্তু এখন কোন জাদু বলে যে এই হোঁতকা লোকটা আমার মন থেকে সব লোপাট করে দিয়েছে, কে বলবে! তাই সার্কাসের নাম শুনে আমি হাঁদার মতো তার মুখের দিকে তাকালুম। সে আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে চলল। ভেতর মানে যেখানে সার্কাস হয়, সেখানে নয়। একটা অন্য নিরিবিলি ঘরে। ঘরে ঢুকে দেখি, ছিমছাম পোশাক পরা একজন লোক চেয়ারে বসে টেবিলে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই, সেই ছিমছাম পোশাক পরা লোকটি চমকে তাকিয়ে হোঁতকা লোকটিকে ডাক দিল, 'আরে তুমি, এসো এসো!'

হোঁতকা লোকটা আমায় সঙ্গে নিয়েই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এই যে, আপনার কথামতো এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি। 'ছেলেটি বলছিল, ঘোড়ার পিঠে বসে ছোটাছুটি করতে ওর খুব ভালো লাগে।'

'তাই নাকি! তবে তো ভালোই হল। এই রকমই একটি ছেলের এখন আমার খুব দরকার। যে-ছেলেটি এতদিন ঘোড়ার খেলা দেখাত সে হঠাৎ কাউকে কিছু না-বলে ছেড়েছুড়ে চলে গেছে। আমি পড়েছি বিপদে। আমি এখন ঘোড়ার খেলাই দেখাতে পারছি না। তুমি আমায় বিপদ থেকে বাঁচালে। দেখে তো মনে হচ্ছে, ছেলেটি বেশ চালাক-চতুর। দেখতে শুনতেও ভালো। ঘোড়ার পিঠে দু-চার দিন ট্রেনিং দিলেই অনেকটা রপ্ত করে ফেলবে বলে মনে হয়।' এই পর্যন্ত বলেই ছিমছাম লোকটি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

আমি একদম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। আসলে, তখন তো আমার নামটা পর্যন্ত আমার মন থেকে মুছে গেছে। চোখের পলকে হোঁতকা লোকটার দিকে তাকাতেই আমার কী মনে হল, আমি বলে ফেললুম, 'আমার নাম বরবটি।'

আমার নাম শুনে হোঁতকা আর ছিমছাম দুটো লোকই হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি বোকার মতো ওদের হাসি দেখে নিজেও হাসতে লাগলুম।

অবশ্য হাসিটা বেশিক্ষণ গড়াল না। ছিমছাম লোকটি হোঁতকা মতন লোকটিকে বলল, 'ঠিক আছে বাবা। বরবটি এখন এখানে একটু বসুক, তুমি এসো আমার সঙ্গে। আসল কাজটা সেরে ফেলা যাক।' বলতে বলতে দুটো লোকই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একা চুপচাপ বসে রইলুম, আর সার্কাসে যেসব জীবজন্তু খেলা দেখায় তাদের, হট্টগোল শুনতে লাগলুম আমার একবারও মনে হল না, আসল কাজটা কী, কী কাজ সারতে গেল দুজনে!

তার পরের ঘটনাগুলো খুব সোজা :

হাসিমুখে দুজনে ফিরে এল একটু পরেই।

হোঁতকা লোকটা আমায় বলল, 'সাবধানে থাকিস রে বরবটি। আমি চলি এখন। পরে আবার আসব।'

সেদিন থেকে ক-দিন নিয়মিত একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে আমায় নানান ধরনের খেলা দেখানোর কায়দা শেখানো চলল। সত্যি বলতে কী ঘোড়াটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন থেকে এমন ভালো লেগে গেল! কী শান্ত ঘোড়াটা। ঘোড়াটার যেন আমাকেও খুব ভালো লেগে গেছে। কেন না, আমি যখন ওর পিঠে দাঁড়িয়ে খেলা শিখি, আমি বুঝতে পারি বেচারির কষ্ট হচ্ছে, তবুও আমাকে কোনো দিনও লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঝটকা

মেরে ওর পিঠ থেকে ফেলে দেয়নি। সুতরাং খেলা শিখতে আমার মনে ভয় ছিল না কোনো। কত সহজে শিখে ফেললুম কত শক্ত শক্ত খেলা। সেই খেলাটা কী শক্ত, যেটা বাজনার তালে তালে ঘোড়ার নাচের খেলা। পেছনের দু-পা মাটিতে রেখে নাচে ঘোড়া। সামনের দু-পা শূন্যে। আমি শূন্যের সেই দু-পা মাটি থেকে লাফিয়ে ধরে ডিগবাজি খাই। একটা-দুটো, পাঁচটা-ছ-টা, দশটা পর্যন্ত। তা-ও সেই নাচের বাজনার তালে তালে। ভাবতে পারবে না, কী হাততালি পড়ে তখন!

এই ভাবেই বেশ চলছিল। ওরা আমার এই ঘোড়ার নাম রেখেছিল 'কামাল'। কামাল বলেই সবাই ডাকত। আমি ডাকতুম 'বন্ধু' বলে। আমি একাই ডাকতুম। বললে বিশ্বাস করবে না, কী গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের। আমি যেমন ভালোবাসতুম তাকে, সে-ও তেমনই ভালোবাসত আমায়। আমাকে সামনে না-দেখলে সে খাবারই মুখে দিত না।

তার পরেই ঘটে গেল সাংঘাতিক ঘটনা।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। ভিড়ের ঠেলায় সার্কাসের গ্যালারি উপচে পড়েছে। এক-একটা খেলা শেষ হচ্ছে, হাততালিতে ফেটে পড়ছে সার্কাসের ঘেরাটোপ। যখন ঘোড়ার নাচের বাজনা বেজে উঠল, আর আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে যখন খেলার চত্বরে হাজির হলুম, তখন যদি দর্শকদের আনন্দের ধুম দেখতে, নির্ঘাত ভাবতে, এ যেন খুশির তুফান আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে! প্রথমে যেমন রোজ হয়, সেদিনও তেমন ক-টা খেলা হল ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে। ক-টা খেলা হল, ঘোড়ার পেটে ঝুলে, ঘাড়ে দুলে। তারপরে শুরু হল ঘোড়ার নাচের খেলা। প্রথমে ঘোড়ার চার পায়ে ঝুমুর পরিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়া বাজনার তালে তালে চার পা ফেলে, কোমর দুলিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে ক-টা মজাদার নাচ দেখাল। তারপর, চারপায়ে নাচতে নাচতে হঠাৎ সামনের দু-পা শূন্যে তুলে ধেই-ধেই করতে লাগল, অমনই আমি ঘোড়ার শূন্যে তোলা দু-পা ধরার জন্যে মেরেছি লাফ। সঙ্গে সঙ্গে মট করে একটা আওয়াজ। আমি ভয়ে চমকে উঠেছি। বুঝতে পারলুম আমার লাফানোটা বেকায়দায় হয়ে গেছে। ফলে আমার শরীরের ভারে ঘোড়ার একটা পা বোধ হয় ভেঙে গেল। আর বলতে, সত্যি তাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আমি পড়লুম ছিটকে দশহাত দূরে। তারপর আমি আর কিছু জানি না। জ্ঞান হারালুম। হঠাৎ যখন আমার জ্ঞান ফিরল, দেখে-শুনে আমি আঁতকে উঠেছি। মনে হল, আমি একটা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। আমার শরীরের এখানে-ওখানে ব্যান্ডেজ। আমার আশে-পাশে আরও অনেক রুগি বিছানায় শুয়ে। অনেক নার্স এদিক-ওদিক ব্যস্ত পায়ে ঘোরাফেরা করছেন। আমার কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আচমকা আমার বাড়ির কথা সব মনে পড়ে গেল! এখানে আমি কেমন করে এলুম! আমার মা কই? বাবা কই? আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলুম। নার্স ছুটে এসেছেন, 'কী হয়েছে?'

আমি তেমনই চিৎকার করে বললুম, 'আমি বাড়ি যাব।'

নার্স বললেন, 'ডাক্তারবাবু ছুটি না-দিলে তুমি বাড়ি যাবে কেমন করে? তোমার যা আঘাত, তাতে এত তাড়াতাড়ি তোমার ছুটি হবে কী করে?'

আমি নাছোড়বান্দা। নার্সকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন লাগল আঘাত? কেমন করে লাগল আমার, আমি তো জানি না।'

নার্স উত্তর দিলেন, 'সে কী কথা! সার্কাসে ঘোড়ার খেলা দেখাতে গিয়ে তুমি যে পড়ে গেছলে, তা তোমার খেয়াল নেই? কী সাংঘাতিক ঘটনা! ভগবানের দয়ায় তুমি খুব বেঁচে গেছ। ঘোড়াটাকে তো বাঁচানো যায়নি!'

নার্সের এই কথা শোনার পর, কী আশ্চর্য, আমি যা একেবারেই ভুলে গেছলুম, একটি একটি করে তার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা হোঁতকা মতো লোক আমার নাকের কাছে একটা রুমাল নেড়ে দিতেই তার ঝাঁঝাল গন্ধে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান ফিরলে একেবারে অন্য মানুষ। সার্কাসে আমি ঘোড়ার খেলা দেখাই। ঘোড়াটা আমার ভীষণ

ভালোবাসে। আমিও ভালোবাসি। তাকে বন্ধু বলে ডাকি। হ্যাঁ, কাল সেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। আমি বেঁচে গেছি। নার্স বলছেন আমার বন্ধু ঘোড়া বেঁচে নেই। শুনে আমি এখন কান্নায় ভাসছি, আর ভাবছি আমি এখন কেমন করে মা আর বাবার কাছে যাব! তাঁরা না-জানি আমাকে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন!

আমি কোথায় এসেছি জানি না। আমাদের বাড়ি কোনদিকে তা-ও আমার জানা নেই। কিন্তু না, আমার আঘাত যতই গুরুতর হোক, ডাক্তারবাবু আমাকে ছুটি না-দিলেও আমি লুকিয়ে পালাব এখান থেকে। কিন্তু কেমন করে! আমি কি উঠে বসতে পারছি! দেখি তো! নার্সের সামনেই আমি উঠে বসার চেষ্টা করলুম। বসতে পারলুম। নার্স একটু ব্যস্ত হয়ে ধমক দিলেন 'একী করছ? উঠছ কেন?'

'আমি একটু বাথরুমে যাব', বলে আমি পা বাড়াবার চেষ্টা করলুম মাটিতে পা ফেলার।

নার্স হন্তদন্ত হয়ে আমাকে ধরে ফেললেন। ততক্ষণে আমার মাটিতে পা পড়ে গেছে। আমি দিব্যি একপা, দু-পা করে হেঁটেও ফেলেছি। বুঝতে পারলুম হাঁটতে আমি পারব। আঘাতটা আমার পায়ে লাগেনি। লেগেছে হাতে আর মাথায়। এই দু-জায়গাতেই ব্যান্ডেজ জড়ানো। আর যা লেগেছে, তার কোথাও কেটেছে, কোথাও ছড়েছে। তবে মাথার ভেতরে একটা যন্ত্রণা আমায় কষ্ট দিচ্ছে। বাঁ-হাতটা ভেঙেছে মনে হয়। কবজিটা মনে হচ্ছে, প্লাস্টার করে দিয়েছে।

নার্স আমায় আটকালেন। চেঁচালেন, 'তোমায় বাথরুম যেতে হবে না। এখানে, বেডেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমিও জেদ ধরলুম, যাবই।

অগত্যা নার্স আমায় ধরে ধরে নিয়ে চললেন বাথরুমে। আমি বুঝতে পারলুম, হাঁটতে আমার কষ্ট হল না।

কে না-জানে, এই আলো-ঝলমল দিনেরবেলায় তো আর নার্সের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালানো যায় না। সুতরাং আমাকে গভীর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমার দেখা হয়ে গেছে, হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে না, সুযোগ পেলে আমি ঠিক পালাতে পারব। সুতরাং গভীর রাতের অপেক্ষায় আমি সময় গুনতে লাগলুম।

ইতিমধ্যে সার্কাসের বড়োকর্তা হাসপাতালে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। তিনি এতটাই মুষড়ে পড়েছেন যে, ছলছল চোখে আমাকে বলে যেতে ভুললেন না, অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়াটাকে বাঁচানো গেল না।

সেটা আমি জানি। ঘোড়াটার জন্যে যে আমার মনও কতটা ভার হয়ে আছে, সেকথা আমি ছাড়া আর কে জানে! কিন্তু সে যা হবার সে তো হয়েই গেছে। তাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন সব ছেড়ে মন যে আমার বাড়ির জন্যে ভীষণ ছটফট করছে। আমি মাকে, বাবাকে কখন যে দেখতে পাব, কেমন করে যে তাদের কাছে যাব, তার যে কিছুই জানি না আমি। আমার কী হবে? সার্কাসের মালিক যদি আমাকে না-ছাড়েন! ছাড়ার কথাও নয়। কারণ, এই বয়সের এমন একটা ওস্তাদ ছেলেকে সার্কাসের কোনো মালিকই কি ছেড়ে দেয়! সুতরাং কাউকে কোনো জানান না-দিয়েই আমাকে পালাতে হবে। পালাতে হবে গভীর রাতে হাসপাতাল থেকে।

অবশ্য, এখন আর দিনের আলো নেই। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। দিনেরবেলা যে নার্সরা রুগিদের দেখাশোনা করছিলেন, তাঁদের ডিউটি শেষ। এখন রাতের নার্স এসেছেন। আমাকে যিনি দেখাশোনা করবেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, ভালোমানুষ। এঁকে বোধহয় ফাঁকি দিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। দেখা যাক, কী হয়।

ঘুমের রাত এল। ঘুম আসার আগে, হাসপাতালেই যেসব ডক্তারবাবুরা থাকেন, তাঁরা প্রত্যেক রুগিকেই একবার করে দেখে গেলেন। এবার আলো নিভবে একটি একটি করে। খুব ঝিমঝিমে একটা আলো শুধু জ্বালা থাকল। এখন ঘুমোও।

আমার বেড দোতলায়। আমি দেখে রেখেছি, বাথরুম যেদিকে, সেদিকে একটু এগিয়েই নীচে নামার সিঁড়ি। সুতরাং গভীর রাতে নার্সের চোখ ঘুমে যদি একটুও ঢুলু-ঢুলু করে, তখনই পালানোর সুযোগটা নিতে হবে। আর যদি দেখে ফেলেন, তখন তো বলা যেতেই পারে বাথরুমে যাচ্ছি।

অবাক কথা কী, গভীর রাতে এমনই একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেলুম। মিটিমিটি আলো। সবাই ঘুমে অচেতন। চারদিক সুনসান। এমনকী, নার্সও ঘুমোচ্ছেন। আমি নিঃসাড়ে বেড থেকে নেমে একাই বাথরুমের দিকে আলতো পায়ে হাঁটা দিলুম। বাথরুম পেরিয়ে সিঁড়িতে পা ফেললুম। নেমেও গেলুম। এমনই বরাত, দেখি গেটের দরোয়ানও দেওয়ালে মাথা এলিয়ে বেমালুম নাক ডাকাচ্ছে। ছুট্টে পেরোতে গেলুম গেটটা, পারলুম না। কোমরটা টনটন করে উঠল। বুঝতে পারলুম প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে। ছোটাছুটি করার ক্ষমতা নেই। পালাতে হবে সাবধানে পা ফেলে। শেষপর্যন্ত সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলুম হাসপাতাল থেকে। রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা লুকিয়েছাপিয়ে, আর অনেকটা হাঁসফাঁস করে খোলা, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলুম।

এইবারেই মুশকিল। যদিও তখন গভীর রাত। চারদিক ফাঁকা। কোথাও জনপ্রাণী নেই, তবুও ভয়তো আমার পিছু ছাড়ছে না। এমন করে ফাঁকা পথে হাঁটলে যে, আমি যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি, সেটা কে না-জানে। আমায় এখনই কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় লুকোব? আমি তো এখানকার ধুলো-মাটি কিছুই চিনি না।

আমি অনেকক্ষণ হেঁটেছি। আর কত হাঁটব! সত্যি বলছি, আর পারছি না। মনে হচ্ছে, গভীর রাত হালকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার ততই মাথা ঝিমঝিম করছে। হাঁটতে হাঁটতে পা-ও আর বইছে না। সামনে কী আছে। কোথায় যাব! কিছু জানি না। আমায় যে একটু বসতে হবে এখনই। নইলে নির্ঘাত মাথা ঘুরে পড়ে যাব। ওই দিকে মনে হচ্ছে, কয়েকটা গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। একটু ঝোপঝাড়ও আছে। ওইদিকেই পা বাড়ালুম। এখানে এসে আর টাল সামলাতে পারলুম না। এসে গেছি ঝোপের কাছে। ঝোপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। তারপর হাঁপাতে লাগলুম।

একটু সামলে আবার উঠে পড়েছি। মনে হল, এই ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা যায়, কিন্তু লুকিয়ে থাকা যায় না। দিনের আলো ফুটলে কারও নজরে পড়ে যেতে পারি। সুতরাং কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে আবার পা ফেললুম ঝোপ ডিঙিয়ে।

একটু হাঁটতেই মনে হল, এদিকটা যেন জঙ্গল-জঙ্গল। আর একটু হাঁটতেই দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা গাড়ি, না, কী একটা পড়ে আছে। হ্যাঁ, কাছাকাছি গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তা-ই, একটা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। বসা যাবে কি? বসতে পারলে বেশ হয়। লুকিয়ে থাকা যাবে, আবার ধকলও সামলানো যাবে।

হ্যাঁ, অন্ধকারে আন্দাজে পা ফেলে ভাঙা গাড়িটার ভেতর ঢুকে বসার মতো একটু জায়গা পেয়ে গেলুম। এখানে আজকের রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। এই ঘুপচিতে কারও সাধ্যি নেই আমাকে খুঁজে বার করে।

আঃ! এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেলুম। না, গাড়ির ভেতর আরাম করে বসতে তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। এবার আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে! অবশ্য এখানে নির্ভাবনায় একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। সুতরাং ঘুমে চোখ বুজে গেল আমার।
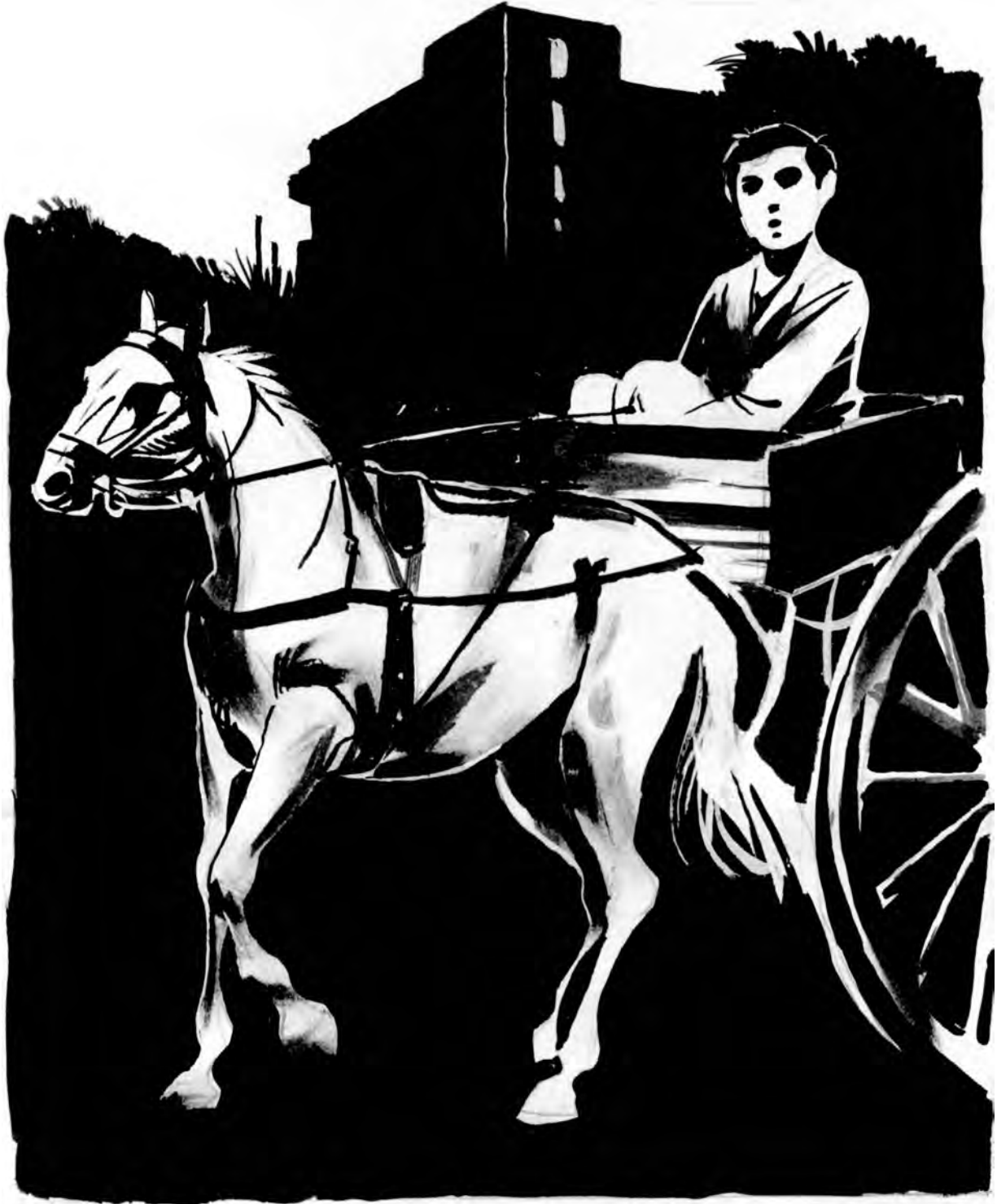
সাহস হল না গাড়ি থেকে নামতে...

ওমা! একী! হঠাৎ আমার ঘুম কেন ভেঙে যায়! আমার মনে হল ভাঙা গাড়িটা যেন ছুটছে। তাই তো! এ কী অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড! ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসছে কানে। কোত্থেকে ঘোড়া এল। গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখি, আরে এ যে সেই সার্কাসের সেই সাদা ঘোড়া, আমার বন্ধু! আশ্চর্য! সবাই বলল, সে তো মরে গেছে। ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়! আমাকে সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমাকেও সে মেরে

ফেলতে চায় নাকি! আমি আর কিছু ভাবতে না-পেরে আর্তনাদ করে উঠলুম, 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'

অবাক কাণ্ড, চোখের পলকে গাড়িটা থেমে গেল! কোথায় থামল অন্ধকারে আমি ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। কেউ আমাকে বাঁচাতেও এল না। ঢিপ ঢিপ করে কাঁপতে লাগল আমার বুক। থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার সারা শরীর।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা পাখি ডেকে উঠল। একটা কাকও কা-কা করে ডাক দিল। অনেকটা ভয় কাটল আমার পাখির ডাক শুনে। আর দেরি নেই, এবার ভোরের আলো দেখা যাবে। আচ্ছা, গাড়িটা তো থামল। কিন্তু ঘোড়াটার তো আর কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তার টগবগিয়ে ছোটার শব্দ না-হয় থামল, কিন্তু তার পরে ঘোড়ার দম ফেলার আবছা শব্দও তো কানে আসবে! কই তেমন তো কিছু শুনছি না! সাহস হল না গাড়ি থেকে নামতে। ভোরের নরম আলোয় আবার উঁকি দিলুম। কই, আমার সেই বন্ধু ঘোড়াকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল! ভোরের আলো আরও একটু উজ্জ্বল হতে, আমার কেমন যেন সাহস বেড়ে গেল। আমি খুব চাপা স্বরে ডাক দিলুম, 'বন্ধু!' ডাকতে ডাকতে গাড়ি থেকে নেমেও পড়লুম। তারপরেই থ হয়ে গেলুম। এ যে গাড়ি আমাদেরই বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে! একী সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছি! আমি থাকতে পারলুম না। চিৎকার করে উঠলুম, 'মা—, বাবা—,' চিৎকার করে দুড়দাড়িয়ে ছুটে গেলুম দরজার দিকে। মারলুম ধাক্কা। দরজা খুলে গেল। দেখি সামনে মা। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম মায়ের বুকে। লাগল আমার ভাঙা হাতটায়। মাথাটাও কেমন যেন ঝিনঝিন করে উঠল। কিন্তু সে কি আর তখন মায়ের বুক জড়িয়ে ধরতে আমায় বাধা দিতে পারে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলুম। মা-ও কাঁদছেন। ছুটে এসেছেন বাবাও। বুঝতে পারলুম তিনি আমার মাথা আলতো হাতে ছুঁয়ে ধরেছেন। আমি মুখ তুলে তাকালুম। দেখলুম, তাঁরও চোখে জল। মুখে হাসির আভাস। কান্না-হাসির সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ছেলেকে যে ফিরে পেয়েছেন! সত্যি বলতে কী, আনন্দ যে মানুষকে এমন করে কাঁদায়, সে কথা কি এতদিন আমি জানতুম! না, আমার এই বয়সে তা জানার কথাও নয়। আজই প্রথম জানলুম!

আর, সব শেষে বলি, আমার বন্ধু ঘোড়া, যে গাড়িটা টেনে আমায় মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেই গাড়িটাও দেখি কোথায় উধাও হয়ে গেছে! আর কোনোদিন দেখতেও পেলুম না। এ কী আজব গল্প!

উপাস্য দেবতা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূতের কোনো ঠিকানা থাকে না। শৈশবে এক রকমের ভূত, বড়ো হয়ে আর এক রকমের ভূত। ভূতেরা নানারূপে নানা ঘটনায় জীবনে হাজির থাকবেই। শৈশবের ভূতের কথাই বলা যায়। যেমন আমাদের দেশে শরৎকালে পূজার বাদ্যি বাজলেই আশ্চর্য এক নেশা জড়িয়ে যেত শরীরে। মা আসছেন। মা আমাদের অন্নপূর্ণা। প্রকৃতই তিনি মা দুর্গা না-খড়কুটোর একটি মূর্তি কখনও ভাবিনি।

মহালয়ার দিনের কথাও মনে হয়। আমার বাবামশায় যাবেন নদীতে ডুব দিতে। সূর্যোদয়ের আগে বাবা ডুব দেবেন গঙ্গায়। তখন দেশ থেকে এসে আমার বাবা সবে জঙ্গলে বাড়িঘর বানিয়েছেন।

তখন আমাদের সম্বল বলতে বাঁশের খলষা দিয়ে খড়ের দুটো কুঁড়েঘর। একটিতে আমরা থাকি। আমরা অর্থাৎ বাবা-মা আমি আর আমার ছোটো দুই ভাই। আর একটায় থাকে একটা বেয়াড়া গোরু। দুধ দেয় না। তবে তার গোবরটুকু বামুনের পরিবারে বড়ো কাজে আসে। কারণ সকালে আমার মা-র কাজই ছিল জলে গোবর গুলে বাড়ির উঠোনে, বাড়ির গাছপালা জঙ্গলে—যাই কিছু থাক না চারপাশে সর্বত্র গোবর ছড়া দিয়ে বাড়িটাকে অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করবে।

আমাদেরও বিশ্বাস অটুট। রাতের অন্ধকারে যতই ভূতেরা জঙ্গলের মধ্যে নৃত্য করুক, বাড়ির ত্রিসীমানায় তারা যে কিছুতেই ঢুকতে সাহসই পাবে না, কারণ বাড়ি এবং তার চারপাশ এই গোবর ছড়ার গুণে মন্ত্রপূত হয়ে আছে। আমরা নির্ভয়ে তখন তিন-ভাই কোথাও দূরে শনিপূজার প্রসাদ নিতে গেলে, ভূতের জায়গাগুলোতে রাম নাম জপ করতাম। না-গিয়েও উপায় থাকে না, বাবা আমার একাই গেছেন শনিপূজা করতে, জমি গাছপালা জঙ্গল পার হয়ে আবার বড়ো বড়ো আমের বাগানও পার হতে হয়—তখন মানুষজন এ দেশে আসছে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে, সবে দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায়, আমার বাবা-জ্যাঠারা যেমন যতটুকু সঙ্গে নেওয়া যায় তাই নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন কিছুকাল আগে। তেমন আরও যারা পরে আসছেন, তাদের কাছেও বানজেটিয়ার জঙ্গল এবং পাশের রাজা-মহারাজাদের আমবাগান মাইলের পর মাইল বসবাসের জায়গা হয়ে গেল।

তখন আমাদের সম্বল বলতে বাঁশের খলষা দিয়ে খড়ের দুটো কুঁড়েঘর...

আর আমাদের বাড়ি থেকে রাতে বের হওয়া সোজা কথা ছিল না। সামনে কিছু জমি পার হলেই সিপাইদের ট্রেনিং সেন্টার—সকালে আর সন্ধ্যায় দু-বার নিয়ম করে বিউগিল বাজানো হয়। তখন যতই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার থাকুক, কিংবা কারবালা কবর ভূমি থেকে যতই ভূতেরা নাচানাচি করার জন্য জঙ্গলের প্রকৃষ্ট অন্ধকারে ঢুকে যাক না, আমরা ভয় পেতাম না। কারণ অদূরেই বিউগিল বাজে। অবশ্য আমাদের বিনা অনুমতিতে পুলিশ সেন্টারে ঢোকার নিয়ম ছিল না। যাই হোক আমরা আমাদের অবধারিত সত্যকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা নিশুতি রাতেও ঘর থেকে বের হতে ভয় পাই না।

যেমন বাবা বলতেন, পকেটে ঠাকুরের বেলপাতা আছে তো?

আছে।

কোমরের ঘুনসিতে জালকাঠি আছে তো?

আছে।

আসলে জালকাঠি বস্তুটি লোহার তৈরি। খেপলা জালে মাছ ধরার নিমিত্ত ব্যবহার হয়ে থাকে। বাবার আমার মাছ ধরার স্বভাব আছে বলে, দেশ থেকে, অর্থাৎ আমাদের সেই সুদূর দূর দেশ, অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমি থেকে যা আমরা ফেলে এসেছি, যেমন জমি ঘরবাড়ি আমাদের প্রিয় গোপাট, পুকুরপাড়ের সুস্বাদু আম জাম নারকেলগাছ এবং জ্যাঠামশায় বাবাকে ধমকও দিয়েছিলেন, সব চলে যাচ্ছে, আর তোর খ্যাপলা জাল হিন্দুস্থানে কি স্মারক হিসেবে নিয়ে যাবি!

বাবার কাতর উক্তি, কি করি সোনাভাই, মন যে মানে না।

তা মন নাই মানতে পারে। যদি কারও বাবা দেশে শুধু পূজাআর্চা করে বেড়ান, বাড়ির গৃহদেবতারও পূজা দেন দু-বেলা, আর যার কোনো কাজ নেই, কারণ সংসার কীভাবে চলবে, দখিরে বাজার থেকে কোন মুদির ঘর থেকে সওদা হবে, উত্তরের বিলের জমিতে আমনধানের কোন বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হবে, এবং তরমুজের জমি থেকে কোন পাইকারকে তরমুজ বিক্রি করা হবে তার সব সিদ্ধান্ত আমার দুদুকাকার। বাবা, দুদুকাকা অর্থাৎ তার ছোটো ভাইকে বিশেষ সমীহ করতেন। ডালু যখন কইছে নিয়া যাও। আমার দুদুকাকাকে দেশগাঁয়ে অর্থাৎ আমরা যেখানে জন্মেছিলাম, বড়ো হয়েছিলাম তার লোকজন কমবেশি সবাই ডালুকর্তাকেও ভয় পেত। আমরাও পেতাম। অগত্যা বাবা আমার সোনা জ্যাঠামশাইকে করজোড়ে বলেছিলেন, সোনাভাই একখান কথা আছে।

কী কথা! কও।

সোনাভাই, ডালুরে কিন্তু কিছু কইবেক না।

কী কইতে বারণ করছ।

এই খ্যাপলা জালখানার কথা। ডালু জানতে পারলে, কারণ ডালুর মাথা ঠিক নাই, এতগুলি মানুষ তিনটা গয়না নৌকায় নারায়ণগঞ্জে যাইব কী কইরা, সঙ্গে বাক্স-পেঁটারাও মেলা, জালখানার কথা শুনলেই খেইপা যাইব।

তা যাইতেই পারে। তার মাথাও ঠিক থাকার কথা না—হিন্দুস্থানে গিয়া খামু কি, থাকমু কোনখানে তারইত কিছু ঠিক নাই।

আপনে সোনাভাই যাই কন আমি কিন্তু আমার খ্যাপলা জাল ফেইলা যামু না।

আর কী করেন আমার সোনা জ্যাঠামশাই জানেন, বাবা আমার সরল-সোজা মানুষ, আবার নেশার ঘোরে অর্থাৎ মাছের নেশা যারে কয়, ভূতের নেশার চেয়ে মাছ মারার নেশাও জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, তার এই ভাইটি বড়ো পরিবারে যখন যে মাছের দরকার জোগান দিয়ে থাকে, বর্ষাকালে দু-তিন মাস বড়ো বড়ো কইমাছ ধানখেত থেকে তুলে আনেন, বাড়িতে আছে কতরকমের জালই। কইয়া জাল, ধর্ম জাল, খ্যাপলা জাল, কোচ জাল, আরও কত কিছু, তার মধ্যে মাত্র একটা খ্যাপলা জাল নিতে চায় বাড়ির ধনকর্তা, খুবই সামান্য আবদার। কাজেই বললেন, ধনবউর যে বড়ো গাঁটির আছে, তার মধ্যে লুকাইয়া রাখ। ধনবউ-এর পোটলাপুঁটলি ডালুর খুঁজে দেখার সাহস নাই।

সে যাই হোক সোনা জ্যাঠামশাই আরও বলেছিলেন, আরে ও-দেশে বর্ষাকালে আমাদের দেশের মতো মাঠঘাট নদীনালা জলে ডুবে থাকে না। নদীনালা বিলও নাই শুকনা দেশ, মাছের আকাল, সেখানে ওর খ্যাপলা জাল কোনো কামে লাগব না।

এ-দেশে এসে বাবাও সেটা টের পেয়েছিলেন—এবং এমন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে গিয়ে আরও আতান্তরে পড়ে গেছিলেন। জঙ্গলের অনতিদূরে কারবালা, আসলে এটা একটা সুবৃহৎ গোরস্থান, শ্মশান কিংবা গোরস্থান যাই হোক ভূতের একটু বেশিমাত্রায় উপদ্রব থাকে।

সেই ভূতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত তিনি এক সকালে আমাদের তিন ভাইকে ঘুনসিতে তিনটে জাল-কাঠি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর তার একটাই কথা, যাক এই লোহার জালকাঠি যখন সঙ্গে আছে,

তোমাগো ডর নাই। ভূতের বাপেরও সাধ্য হইব না ছোঁয়। আগুন আর লোহাকে ভূতেরা যমের মতো ডরায়। ভূতের গন্ধ পাইলেই কোমরের জালকাঠি স্পর্শ করে রাম নাম জপ করবে। মনে থাকবে তো!

সে-সময় পুত্রদের মতিগতিও বিশেষ সুবিধের ছিল না। পড়াশোনা লাটে উঠেছে। যখন-তখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাবার স্বভাব। বিষধর সর্প থেকে শিয়াল খটাশের উপদ্রব কম ছিল না— রাত হলেই শিয়ালের আনাগোনা বাড়ির চারপাশে—আর যখন-তখন হুক্কাহুয়া চিৎকার—রাত হলে এক গভীর সংকট তখন আমাদের। দিনেরবেলায় শিয়ালগুলি থাকে কোথায়, তারা যে বাঁশঝাড়ের দিকটায় থাকে তাও বুঝি। বাড়িতে হাঁস পোষা যায় না। হাঁস কিনে আনার দু-দিনের মধ্যেই তারা শেয়ালের পেটে চলে গেল। আমাদের মন খারাপ, সে-জন্য আমরা এই জঙ্গল চেনার একটা রাস্তাও খুঁজে পেয়ে গেলাম—শুধু মনীন্দ্রকাটার জঙ্গলই নয়, সঙ্গে নানা লতাপাতার ঝোপ, একবার একটা বেলগাছও আবিষ্কার করা গেল, আমার ছোটোভাই পিলু একদিন এসে খবর দিল, সে একটি বাসকপাতার গাছ খুঁজে পেয়েছে। বাবা খুবই খুশি।

বাবা নিশ্চিন্ত হলেন, যাক অসুখ-বিসুখের একটা নিদান পাওয়া গেল। এবার দ্যাখ কোথাও একটা তুলসীগাছ পাওয়া যায় কিনা।

অবশ্য বাবার বিশ্বাস প্রকৃতির মধ্যেই আছে সর্বরোগহর প্রণালী, ভগবানই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন—

সেই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে তখন আমাদেরই একটা বাড়ি। আর কোনো বাড়িঘর নেই। জ্যাঠামশাই এবং কাকারা দু-ক্রোশ দূরের শহরে বাসা ভাড়া করে আছেন। তখনও তাঁরা জঙ্গলে ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁরা মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যান—আমরা কেমন আছি। অথবা আমরা ঠিকঠাক বেঁচে আছি কিনা।

সুতরাং এ-হেন দুঃসময়ে পিলুই নানা খবর নিয়ে আসত। কারণ জায়গাটার সঙ্গে এবং কিছু স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সে ভালোভাবেই মিশে যেতে পেরেছে। মানুষজন বলতে জঙ্গল শেষ হলে প্রায় আধক্রোশ দূরে কয়েক ঘর অন্ত্যজ লোকের বাস—সেখানে এক ভূতের ওঝার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে তার—সেই খবর দিয়েছে জায়গাটা ভালো না। আপনারা জঙ্গলে ঘরবাড়ি করে আছেন কী করে! এবং এই জঙ্গলটা গোরস্থানেরই একটা অংশ সে খবরও দিয়েছে।

বাবা খবরটা পেয়ে শুধু বললেন, ভুল, বাজে কথা। থাকলে তেনাদের সঙ্গে একবার অন্তত দেখা হত না! আমার মাকে ডেকে বললেন, তোমার পুত্র কি বলছে! মা শুধু বললেন, যেমন বাপ তেমন তার ছেলে—এক দণ্ড কেউ বাড়ি থাকে না! জঙ্গলটাই এবারে তোমাদের খাবে।

আমার মার মাথাও ঠিক নেই। কারণ অভাব-অনটনে তখন তিনি যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে আছেন। কথায় কথায় বাবাকে খোঁটা দেবার স্বভাবও ছিল তাঁর।

আরে অত উতলা হলে চলে! বাবার এক কথা।

উতলা না-হলেও যে উপায় নেই। পিলু মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে বন আলু তুলে আনলে মা কেমন জীবনে ভরসা খুঁজে পান। দু-বেলা আমাদের তখন অন্ন জোটে না। বাবা সাত্তিক ব্রাহ্মণ তায় প্রমাণ দেবার জন্য নিমতলার নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে বসে থাকেন। নিবারণ দাস আমাদের দেশের লোক, তিনিই এই ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতেন আমাদের ঠাকুরকর্তার কী ছিল না—আর এখন কী অবস্থা!

এবং পরিবারটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর বাড়িতে একবার শনিপূজাও করালেন, একবার তার এক পুত্রের বিবাহ দিলেন, এবং নানা পার্বণ উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে ঝুড়ি মাথায় করে চাল ডাল তেল নুন পাঠিয়ে দিতেন।

এভাবে বাবার আমার কিছু যজমানও স্থির হয়ে গেল।

তখনই এক সন্ধ্যায় একটি চিঠি নিয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে হাজির। গায়ে নামাবলি, পায়ে খড়ম, জঙ্গলে ঢোকার মুখেই হাঁকলেন, এখানে কি আমাদের উপাস্য দেবতা থাকেন।

মা একটা কুপি বারান্দায় সবে জ্বালিয়েছেন, ধূপধুনো দিচ্ছেন, তুলসি তলায় গড় হচ্ছেন, আমি বারান্দায় বসে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছি—পিলুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেউ যে জঙ্গলের বাইরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত আর্ত চিৎকার করছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কে এ-ভাবে ডাকতে পারে। বাবা আজ নিজেই বিকাল থেকে কোদাল মেরে কুপিয়ে জঙ্গলের শেকড়-বাকড় সাফ করার কাজে লেগেছিলেন। আমাকে তিনি আজ আর তার সঙ্গে নেননি—সামনে আমার পরীক্ষা, অগত্যা আমিই বাবাকে ডেকে বললাম দেখুন কে ডাকছে।

মা বললেন, সাঁজবেলায় আবার কোন অতিথি হাজির।

আসলে দেশে আমাদের মেলা যজমান, এবং শিষ্যবাড়ি ছিল। শিষ্যবাড়ি গেলে গুরুদক্ষিণাও যথেষ্ট পেতেন, আমার বাবা। দেশভাগের তাড়নায় শেষে আমাদের এমন পরিণতির কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

যাই হোক এতদিনে আমাদের বাড়িতে যে তাঁর বিগ্রহের জন্য একটি ঘরও তুলেছেন বলে রাখা ভালো। আমাদের তিন বিঘে জমির মধ্যে কিছু তালগাছও আছে। আর আছে দুটো বাঁশঝাড়। বাঁশ এবং তালপাতার ছাউনি দিয়ে ঘরটি তুচ্ছ করার কোনও কারণ থাকে না। মা ঘরটিতে দু-বেলা সকাল-বিকাল প্রণাম করেন। আমরাও সকালে প্রথমে এই ঘরটায় মাথা ঠুকি, বাবা স্নান করে বিগ্রহের পূজায় বসে গেলে আর সহজে উঠতে চান না। গরিবের তো ঠাকুর দেবতাই অবলম্বন, আমার মা-র তাড়া শুরু হয়—

আরে তোমার হল! কখন তোমার ঠাকুর সেবা শেষ হবে। সেই কখন ঢুকেছ! তোমার কি ক্ষুধা-তেষ্টা নাই। আমরা বসে আছি।

আরে এতো মহাঝোমেলা! কী আরম্ভ করলে। ঠাকুর সেবার কি শেষ আছে। আমাদের আর আছেটা কী!

তা ঠিক আমাদের এই বনজঙ্গল, পাখপাখালি এবং শিয়াল খটাস বিষধর সর্প ছাড়া আর কিছু অবলম্বন নেই। সবাই যেন পরিবারের সদস্য। কাউকে তাড়া করা যায় না। আছে যখন থাক, তারা তো তোমার কোনও অনিষ্ট করেনি। ইচ্ছে করলেই কাউকে তুমি বাস্তুচ্যুত করতে পারো না।

মা তখন কুপিত হন ঠিক তবে কোনো তর্ক জুড়ে দিতে সাহস পান না। বাস্তুচ্যুত হলে কী হয় তিনিও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

তখনই আবার সেই এক কণ্ঠস্বর।

আমাদের উপাস্যদেবতা কি এই জঙ্গলে থাকেন?

বাবা বাধ্য হয়ে আমাকে বললেন, যাওতো, দ্যাখো কে ডাকছে! তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো।

মা বললেন, তুমি কী! কে না কে ডাকে, তার খোঁজ নিতে ছেলেকে পাঠাচ্ছ! কিছু একটা হলে!

অগত্যা বাবা বললেন ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

বাবা অগত্যা বাধ্য হয়ে একটি হারিকেন হাতে এগিয়ে গেলেন...

জনমনিষ্যিহীন এমন নির্বান্ধব জায়গায় এই রাতে কি তিনিই হাজির। জায়গাটা যে ভালো না সে-তো পিলুই বলেছে। কে কখন ভূতের বেশে হাজির হবে ঠিক কী! এক নিবারণ দাস ছাড়া কেউ বড়ো আসে না। নতুন যজমানরা কেউ কেউ আসে ঠিক, তবে সকালেই আসে। কারণ এই জঙ্গলের সামনে অন্ধকারে এসে দাঁড়ালেই গাঁয়ের লোক খাড়া হয়ে যায়। বাবা অগত্যা বাধ্য হয়ে একটি হারিকেন হাতে এগিয়ে গেলেন। কী দেখতে কী দেখে ফেলবেন এই আতঙ্কে তিনিও অস্থির ছিলেন, কোনওরকমে বললেন, আপনি কে! আপনি কোথায়!

আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমাকে স্পর্শ করা যায় না, দেখাও যায় না। আমার দায় ছিল তাই দিয়ে গেলাম। নিবারণ দাস আপনার গতিবিধি সব জানে—তাঁরই পরামর্শ মতো দিয়ে গেলাম।

আতঙ্কে বাবা চোখ বুজেই ছিলেন, কেবল বলছেন আপনি কোথায়! কিন্তু কোনো আর সাড়া না-পেয়ে চোখ খুলতেই দেখলেন একটা পুঁটুলি তার পায়ের কাছে পড়ে আছে। খুলে দেখলেন একটি কাঠের ছোটো বাক্স। খুলে দেখলেন কিছু স্বর্ণমুদ্রা, একটি চিরকুট—তাতে লেখা, ঠাকুরের প্রণামী।

শিবেনবাবুর ইস্কুল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালে বেড়াতে বেরিয়ে মহেন্দ্রবাবু একটা ভাঙা পরিত্যক্ত ইস্কুলবাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্কুলবাড়ি দেখলেই চেনা যায়। লম্বামতো বাড়ি, সার সার ঘর, মাঝখানে একটা উঠানমতো। তিনি ত্রিশ বছর নানা ইস্কুলে পড়িয়েছেন। এই সবে রিটায়ার করে হরিপুরে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে এসেছেন।

একটা লোক সামনের মাঠে খোঁটা পুঁতছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাপু হে, এটা যেন স্কুলবাড়ি বলে মনে হচ্ছে; তা এর এরকম ভগ্নদশা কেন?

ভগ্নদশা ছাড়া উপায় কি বলুন! শিবেন রায় ইস্কুল খুলেছিলেন, কিন্তু মোটে ছাত্তরই হয় না, তাই উঠে গেছে।

বলো কি? তা ছাত্র হয় না কেন?

অ্যাজ্ঞে এ হল গরিবের গাঁ, ছেলেপুলেদেরও পেটভাতের জোগাড় করতে কাজে লেগে পড়তে হয়, পড়বার ফুরসত কোথায় বলুন?

তাহলে তো বড়োই মুশকিল, এক কাজ করলে হয় না? যদি বিকেল বা সন্ধের দিকে ক্লাস করা হয় তাহলে?

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, তার জো নেই কর্তা, কেরোসিনের যা দাম হয়েছে তা কহতব্য নয়, শুধু দামই নয়, মাথা খুঁড়লেও তেল পাওয়া যায় না এখানে। তাই সন্ধে হতে না-হতেই গোটা গাঁ ঘুমে একেবারে ঢলাঢল, সন্ধের পর এ গাঁয়ে আলোর ব্যবস্থাই নেই, অন্ধকারে কি লেখাপড়া হয়?

...এটা যেন স্কুলবাড়ি বলে মনে হচ্ছে...

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, শিক্ষা জিনিসটা মানুষের জীবনে কত প্রয়োজন তা তিনি ভালোই জানেন, তাই বললেন, কিন্তু বাপু হে, শিক্ষারও তো একটা দাম আছে!

লোকটা একগাল হেসে বলে, তা আর নেই! শিক্ষা বড্ড উপকারী জিনিস মশাই, দু-চারটে ইংরিজি বুকনি ঝাড়লেই আমি দেখেছি গা বেশ গরম হয়ে ওঠে। শীতকালেও ঘামের ভাব হয়। তারপর ধরুন ইতিহাস, দু-পাতা পড়লেই এমন চমৎকার ঘুম এসে যায় যে, এক ঘুমে রাত কাবার, অঙ্ক কষতে বসলে খিদে চাগাড় দেবেই কি দেবে, এক থালা পান্ত খেয়ে আঁক কষতে বসেই খিদের চোটে উঠে পড়তে হয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু একটু হতাশ হলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য হারালেন না, বললেন তা বাপু, ইস্কুলটা চালু করার একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলে, শিবেনবাবু পটল তুলেছেন। তার ছেলে-মেয়েরা ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে ভারি ব্যস্ত। ইস্কুলের পিছনে কে টাকা ঢালবে বলুন? ছাত্তরও নেই।

তাই তো— বড়ো সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।

মহেন্দ্রবাবুর খুড়শ্বশুর পাঁচকড়ি সমাদ্দার বললেন, শিবেনবাবুর ইস্কুলের কথা বলছো নাকি বাবাজি? ও তো এখন সাপখোপের আড্ডা, শিবেনবাবু ভালো ভেবে ইস্কুল তৈরি করলেন বটে, কিন্তু চালাতে পারলেন কই? আর এ গাঁয়ের লোকের লেখাপড়া শেখার গরজও নেই, শুনছি শিবেন্দুবাবুর ছেলেরা ইস্কুলবাড়িতে গুদামঘর বানাবে।

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, দমলেন না, পরদিনই গিয়ে শিবেনবাবুর বড়ো ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করে বললেন, স্কুলটা আবার চালু করলে ভালো হয়।

গোবিন্দ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ট্যাঁকের কড়ি আর কতকাল গচ্চা দিতে হবে বলুন তো? বাবা তো কম টাকা ঢালেননি, আজ অবধি ক-টা মাধ্যমিক টপকেছে তা জানেন? পঞ্চাশ জনও নয়, আর তা না-হবেই বা কেন? যা ভূতের উৎপাত।

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বলে, ভূতের উৎপাত? সে আবার কী?

তবে আর বলছি কী? দিনেদুপুরে খাতা পেনসিল টেনে নিয়ে যায়, চেয়ার-টেবিল উলটে দেয়, ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেয়, পরীক্ষার সময় ক্যানেস্তারার শব্দ করে, ইট-পাটকেল ছোড়ে, সবাই জেরবার হওয়ার জোগাড়।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ভূত একটা কুসংস্কার বৈ তো নয়, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু লোক আড়াল থেকে এসব করাচ্ছে।

গোবিন্দ বলল, তা পটল ঘোষ দুষ্টু নয়, এ কথা কেউ বলেছে কি? হাড়েবজ্জাত মানুষ ছিল মশাই, গাঁয়ে কোনও ভালো কাজ হতে গেলেই বাগড়া দিত, নতুন রাস্তা হয়েছে, পটল দলবল নিয়ে রাতে এসে রাস্তা খুঁড়ে রেখে যেত। জলাশয় হচ্ছে, পটল গিয়ে রাতারাতি তাতে ঢেলে রেখে আসত, গাছের চারা লাগালে উপড়ে ফেলতে লহমাও সময় লাগত না তার। পটলে আমলে এ গাঁয়ে একটাও স্কুল হয়নি, হলেই মামলা ঠুকে, মিথ্যে নালিশ করে কাজ আটকে দিত।

তা সেই পটলবাবু কোথায় থাকেন?

তা কে জানে মশাই, তবে কয়েক বছর হল সে মারা গেছে, ভেবেছিলাম এবার গাঁ জুড়োবে, তা কোথায় কি, ভূত হয়ে এখন আমাদের ইস্কুলটার পিছনে লেগেছে, আমাদেরই কপাল খারাপ, ওই জায়গাটাই পটলের ভিটে ছিল কিনা, বাবা জমিটা কিনে নিয়েছিলেন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মহেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন, সব শুনে পাঁচকড়ি বললেন বাবাজীবন, গোবিন্দ কিন্তু মিথ্যে কথা বলেননি, এ ওই পটলের ভূতই বটে, তুমি বিশ্বাস করবে না বলে বলিনি, কিন্তু ঘটনা খুব সত্যি।

মহেন্দ্রবাবু জেদি লোক, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু মটকা মেরে রইলেন, বাড়ির সবাই ঘুমোলে চুপি চুপি উঠে, খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়লেন, তারপর সোজা এসে পোড়ো ইস্কুলবাড়িটায় ঢুকে পড়লেন।

ভূতের মোকাবিলা কখনও করেননি বলে মহেন্দ্রবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এমতাবস্থায় কী করা উচিত। তবে তাঁর অসম্ভব সাহস, বুদ্ধিও বড়ো কম নয়।

সামনে যে ক্লাসঘরটা দেখলেন সেটাতেই ঢুকে পড়লেন মহেন্দ্রবাবু, ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, ইঁদুরের কিচমিচ শোনা যাচ্ছে, ঝিঁঝি ডাকছে, চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু মাথায়, মুখে, হাতে মাকড়সার জাল টের পাচ্ছেন, চারদিকে বিচ্ছিরি গন্ধ।

মহেন্দ্রবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীরভাবে ডাকলেন, পটলবাবু...

কেউ জবাব দিল না।

পটলবাবু, শুনতে পাচ্ছেন?

কোনও শব্দ নেই।

পটলবাবু, আমি হলাম মহেন্দ্র মাস্টার, বহু গাধা ঠেঙিয়ে মানুষ করে দিয়েছি, বুঝলেন?

অন্ধকারে হঠাৎ সামনে একটা সাদামতো কী যেন দেখা গেল, না কোনও মূর্তিটুর্তি নয়, খানিকটা কুয়াশার মতো ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ একটা খ্যাঁকানো গলায় কে যেন বলে উঠল, কে র‍্যা? কার এত বুকের পাটা যে রাতবিরেতে ডাকাডাকি করছিস?

বললুম তো, মহেন্দ্র মাস্টার, গাধা পিটিয়ে মানুষ বানাই,

তা মরতে এখানে কেন? আর জায়গা নেই?

এই জায়গাই আমার পছন্দ। আজ থেকে রোজ নিশুত রাতে এসে আমি আপনাকে লেখাপড়া শেখাব।

অ্যাঁ—লেখাপড়া—আমাকে—

যে আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে মনে হল, আপনার ভিতরে এক অবিদ্যার বাস, তাকে তাড়াতে হলে বিদ্যের দরকার। আপনি তৈরি থাকুন, কাল থেকেই আমি আপনাকে পড়ানো শুরু করব। প্রথম মুগ্ধাবাধ, তারপর বর্ণপরিচয়, তারপর ব্যাকরণ, কথামালা, হিতোপদেশ।

শেখালেই হল—যদি না শিখি—

সহজে শিখবেন না যে আমি জানি, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই।

দেখো মাস্টার, মানে মানে সরে পড়ো, নইলে এমন সব কাণ্ড করব যে পালানোর পথ পাবে না।

দেখুন না চেষ্টা করে, কত ডাকাত ছেলেকে জল করে এসেছি, আপনি তো কিছুই নন।

আচ্ছা টেঁটিয়া তো—

যে আজ্ঞে।

ও তোমার কম্ম নয় হে। যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন কত মাস্টার কত চেষ্টা করেছে। আমাকে শেখাতে পারেনি। তুমি কোথা থেকে উদয় হলে হে বাপু?

উদয় যখন হয়েই পড়েছি তখন আর সহজে অস্ত যাচ্ছি না, বুঝলেন পটলবাবু?

পটলবাবুর ভূত একটু চুপ করে থেকে বলল, তার মানে তুমি সহজে টিট হওয়ার লোক নও।

আজ্ঞে না।

দূর বাপু, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে হবেটা কী? তার চেয়ে যাদের পড়ালে কাজ হয় তাদেরই পড়াও না।

কিন্তু আপনার জন্য যে ইস্কুলটাও উঠে গেছে?

ঠিক আছে বাপু, স্কুল হোক, আমি বরং তখন পাশের গাঁয়ে হাওয়া খেতে যাব।

ঠিক তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মতো বদখত লোকের পাল্লায় পড়লে কি আর কিছু করার থাকে?

মহেন্দ্রবাবু হাসলেন।

পাঁচ দিনের মধ্যে শিবেনবাবুর স্কুল চালু হয়ে গেল। স্কুলের হেডমাস্টার হলেন মহেন্দ্রবাবু।

সাইকেল সাথি

শরদিন্দু কর

আশ্বিন মাস। সামনে পুজো। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পুজোর তত্ত্ব পৌঁছে দিয়ে সাইকেলে গ্রামে ফিরছিল বাসুদেব ফৌজদার। মেয়ের বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার সময় ঝমঝমিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। অবশ্য সে-বৃষ্টি থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়েছিল আকাশের নীল রং। শরৎকাল এরকমই হয়—এই রোদ এই বৃষ্টি।

এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ওদের আনন্দপুরে পৌঁছানোর রাস্তা এক জায়গায় এসে দু-ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে রাঙা মাটির পথ অন্যদিকে পাকা পিচ রাস্তা। তবে পাকা রাস্তা ধরে অনেকখানি ঘুর পথে গ্রামে পৌঁছাতে হয়। তাই পায়ে হাঁটা বা সাইকেল চালানো মানুষজন অনেক সময় কাঁচা রাস্তাটি পছন্দ করে। প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার দু-পাশে পুরোনো কালের বিশাল সব বট-অশ্বত্থ-পাকুড়-অর্জুন গাছের পাশাপাশি শালগাছের ঘন জঙ্গল।

রাস্তা যেখানে দু-ভাগ হয়েছে সেখানে তেমাথার মোড় থেকে রাঙা মাটির পথ ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর মেঘ গুড় গুড় করে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। তার সাথে কান ফাটানো চড়াৎ চড়াৎ শব্দে বজ্রপাত। একটা বড়োগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচাল বাসুদেব। তবে আশেপাশে বাজ পড়ার বিকট আওয়াজে ভয়ে বুক হিম হয়ে যাচ্ছিল। এভাবে অনেকটা সময় বয়ে গিয়ে দেখতে দেখতে বিকেল ফুরিয়ে এল।

এখন সাবধানে সাইকেল চালাতে হচ্ছে। কাঁচা মাটির রাস্তা গত বর্ষার সময় এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গিয়েছিল যা এখনো সারানো হয়নি। তার উপরে আজকের বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ। অনেক জায়গায় জল জমে আছে। মাঝে মাঝে বড়ো গর্ত রয়েছে যা অন্ধকারে চোখে পড়ে না। জলে ডোবা গর্তের মধ্যে যদি একবার সাইকেলসুদ্ধ পড়ে তখন কী হবে? হাত-পা ভেঙে রাস্তার মধ্যে দুর্দশার অন্ত থাকবে না। অজানা বিপদের কথা ভেবে বুক কেঁপে ওঠে বাসুদেব ফৌজদারের। পূর্বপুরুষরা একসময় রাজার ফৌজে সেনাপতি ছিল তাই উপাধি পেয়েছিল ফৌজদার। সে-সব দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন সংসার চালাতে একটা দোকান দিয়েছে। কাগজ-খাতা-পেন পেনসিল এসবের সাথে মিলিয়ে নানা রকমের কেক-বিস্কুট-চকলেটও রাখে। দোকানটা ভালোই চলে।

সাঁজের আঁধারে একা একা সাইকেল চালাতে চালাতে মনে হয় এ সময় কেউ সঙ্গী-সাথি থাকলে ভালো হত। কিন্তু শুনশান কাঁচা মাটির পথে ঝড়-বৃষ্টির সময় লোকজন কোথায় পাবে? বাসুদেব যখন এরকম ভাবনা নিয়ে অনেকখানি হতাশ হয়ে পড়েছিল তখনই মনে হল ওর পিছনে পিছনে কে যেন আসছে। জলকাদার রাস্তায় সাইকেলের চাকার ছপ ছপ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। যা শুনে বুকে তবু কিছুটা বল এল।

দু-পাশের বড়ো বড়ো গাছগুলির নীচে চাপ চাপ অন্ধকার। চোখে সব কিছু ঠাহর হয় না। এসব রাস্তায় অনেকখানি আন্দাজে সাইকেল চালাতে হয়। সেই ভাবেই বাসুদেব চলছিল হঠাৎ শুনতে পেল, ওদিকে নয়, ওদিকে নয় সামনে জলে ভরা গর্ত আছে, বাঁ-দিকে আসুন।

অজানা লোকটির কথা শুনে তাড়াতাড়ি হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সাইকেল সামলে নিল বাসুদেব। যাক, বড়ো একটা ফাঁড়া কাটল। ততক্ষণে লোকটি ওর পাশে চলে এসেছে। বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে মানুষটিকে বলতে হয়, তুমি খুব বাঁচিয়ে দিলে ভাই না-হলে গর্তে পড়তাম। তারপর নির্জন পথে ওর সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টায় বলল, তুমি কোথায় থাকো?

উত্তর এল, জোড়া বকুলতলা।

বাহ ভালোই হল। তোমার সাথে অনেকটা পথ একসাথে যাওয়া যাবে। আমি জোড়া বকুলতলার কিছুদূর আগে আনন্দপুরে থাকি।

আমি জানি। আপনার ফৌজদার স্টোর্সে বেশ কয়েকবার গেছি।

গলার আওয়াজ শুনে আগেই মনে হয়েছিল বয়স কম এখন আকাশের তারার আভায় যতটুকু অন্ধকার দূর হয় তার মধ্যে নজর রেখে বাসুদেব বুঝতে পারল ওর পাশে চলা সাইকেল সঙ্গীটির বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়। ওর মুখে নিজের দোকানের নাম শুনে সে উৎসাহে বলল, তাই নাকি? তাহলে তুমি আমার চেনাজানা।

আলো আঁধারের মধ্যে চেহারা দেখে ছেলেটিকে চিনতে চেষ্টা করল বাসুদেব। কিন্তু মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পেল না।

আপনার দোকানে যখন খাতা-পেন কিনতে যেতাম দেখতাম কত কেক বিস্কুট থরে থরে সাজানো আছে। তখন খুব নিতে ইচ্ছে হত কিন্তু পকেটে পয়সা থাকত না বলে কোনোদিন নিতে পারিনি।

ছেলেটি সহজ ভাবে মনের কথা শুনিয়ে দিল।

বাসুদেবের মায়া হল। তা ছাড়া সদ্য ওকে জলে ডোবা গর্তে পড়া থেকে বাঁচিয়ে যে উপকার করেছে তার বিনিময়ে ছেলেটিকে কিছু প্রতিদান দেওয়া দরকার এই চিন্তা নিয়ে বলল, এরপর তুমি যেদিন আমার দোকানে আসবে তোমাকে এক প্যাকেট ক্রিমবিস্কুট দেব। ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, না না তার কোনো দরকার নেই। আমার এখন ক্রিমবিস্কুট লাগে না।

বাসুদেব ভাবল ছেলেটি নিশ্চয় টাকাপয়সার কথা ভেবে সংকোচ বোধ করছে তাই দরাজ গলায় বলল, তোমাকে দাম দিতে হবে না। পুরোপুরি ফ্রিতে দেব।

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না।

আরও কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলার পর বাসুদেব দেখতে পেল রাস্তার একপাশে অনেকখানি জল জমে আছে এবার সতর্ক হয়ে অন্যপাশ ধরে সে সাইকেল চালাতে শুরু করেছিল। কিন্তু সাথে সাথে হুঁশিয়ারি এল, ও দিকে নয় ও দিকে যাবেন না। জল এড়িয়ে ও দিকে গেলে কাঁটা গাছের মধ্যে পড়বেন। সামনে ফণীমনসার ঝোপ আপনি অনেকখানি ডানদিকে সরে আসুন।

আশ্চর্য! কথাটি তো ষোলো আনা সত্যি। ততক্ষণে ঝাউগাছের মতো চাপ বাঁধা ফণী-মনসার কাঁটাগাছগুলি ওর নজরে পড়ল। এবারেও ছেলেটির কথা শুনে বাসুদেব ডানদিকে ভালো রাস্তায় সরে এল।

এভাবে দুর্ভোগ এড়িয়ে বেশ খুশি মনে সে আবার আগের মতন উদার গলায় বলল, এবার তুমি যখন আমার দোকানে আসবে তখন তোমাকে একটা চকলেট বার দেব। ছেলেটির স্বভাব ভালো। যদি কিছু নিতে রাজি না-হয় এই চিন্তা করে বাসুদেব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল, না না তোমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না তবে চকলেট তোমাকে নিতেই হবে।

ছেলেটি নীচু স্বরে বলল, আমি চকলেট নিয়ে কী করব। থাক না।

বাসুদেবের ধারণা হল গরিব ঘরের ছেলে তাই হয়তো চকলেটের দিকে অত টান নেই। কিন্তু উপকারের বদলে টাকাপয়সা দেওয়া ঠিক নয়। তবে এরপর দিন যখন ওর দোকানে আসবে বাসুদেব সিদ্ধান্ত নিল তখন ওর হাতে জোর করে একটা বড়ো চকলেট বার গুঁজে দেবে।

জলকাদা ভেঙে সাইকেল চালাতে বেশ কষ্ট হয়। সাইকেলের চাকা নরম মাটিতে এঁটে যায়। কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পার হতেই বাসুদেবের কপালে ঘাম জমে। বিকেলে বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচালেও জামাকাপড় কিছুটা ভিজে গিয়েছিল। শরীরে আধভেজা জামা আর কপালে ঘাম নিয়ে এই সামান্য পথও যেন অনেক দীর্ঘ মনে হয়। সাইকেলের পেডেল ঠেলতে ঠেলতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হয়। এই ভেবে রাস্তার পাশে বাসুদেব দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গী ছেলেটির উদ্দেশ্যে সে বলল, এসো একটু জিরিয়ে নিই তারপর আবার চলব।
কথাশুনে ছেলেটিও থেমে গেল।

এই ভেবে রাস্তার পাশে বাসুদেব দাঁড়িয়ে পড়ল...

গায়ে ঠান্ডা বাতাস লাগানো দরকার এই ভেবে জামাটা খুলে ফেলল বাসুদেব। একটা গাছের ডালে ওটা ঝুলিয়ে দিয়ে সাইকেলটি গুঁড়িতে ঠেসিয়ে আরাম করে দাঁড়াল। ছেলেটি রইল সামান্য দূরে। বাসুদেব চিন্তা করল ছেলেটার স্বভাব কেমন যেন লাজুক চাপা ধরনের। নিজে থেকে কোনো কথা বলে না। যা জিজ্ঞাসা করা হয় শুধু সেইটুকু উত্তর দেয়।

এসময় গাছের একটি ডাল থেকে ঝটপট শব্দে কোনো পাখি উড়ে গেল।

পাখিটির ডাক বড়ো বিচিত্র—চ্যাঁও চ্যাঁও। যে কর্কশ আওয়াজ শুনে বাসুদেবের বুক শিরশির করে উঠল। ছেলেটি বোধহয় ওর মনের কথা আন্দাজ করে নিয়েই অভয় দেয়, আতঙ্কের কিছু নেই। প্যাঁচা ডাকছে। হয়তো সাপখোপ দেখেছে। শিকারের আগে প্যাঁচা ওরকম ডাক দেয়।

তুমি এসব জানলে কী করে?

আমিতো এদিকেই থাকি, দেখেশুনে সব শিখে গেছি। তবে ভয় পাবেন না সাপখোপ যদি আশেপাশে থাকেও তবে ওই ডাকশুনে নিজেরাই আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। অন্ধকারে প্যাঁচারা সব পরিষ্কার দেখতে পায়। ওদের নাগাল থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। তবে আপনার কোনো চিন্তা নেই। প্যাঁচা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।

বাসুদেব অনেকখানি আশ্বস্ত হল কিন্তু এ জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেও মন চাইছিল না। ঘরে ফেরার টান। বলল, চল আমরা এখান থেকে যাই। কথার শেষে গাছের ডাল থেকে জামাটি টেনে গায়ে চড়িয়ে নিল।

সাইকেল চালাতে চালাতে অনেকটা পথ পার হল নির্বিঘ্নে। কোনো গর্ত বা কাঁটাঝোপের সামনে পড়ল না। এভাবে বেশ কিছু দূর চলার পর একসময় ছেলেটিই ওকে ডেকে উৎসাহ নিয়ে দেখাল, ওই তো আপনাদের আনন্দপুরের আলো দেখা যাচ্ছে। আর কোনো চিন্তা নাই। এবার আপনি সো-জা চলে যান। একটি বিশাল ঝুপসি তেঁতুলগাছের নীচে এসে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনার সাথে আমার রাস্তা এখানেই শেষ। আপনি এগিয়ে যান।

তুমি কোথায় যাবে? প্রশ্ন করল বাসুদেব।

বাঁ-দিকে আমাদের জোড়া বকুলতলা। এই রাস্তা ধরে চলে যাব। আঙুল তুলে জঙ্গলের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথটি দেখাল।

গরিব ছেলেটি ওকে সারাপথ যে ভাবে বিপদআপদ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে তা দেখে বাসুদেব মনে মনে দারুণ খুশি। সে চিন্তা করল আবার কবে দেখা হবে কে জানে? সবচেয়ে ভালো হয় এখনই ওর হাতে কিছু নগদ টাকাপয়সা ধরিয়ে দেওয়া। উপকারীর ঋণ বেশিদিন ফেলে রাখতে নেই।

এইসব চিন্তাভাবনা করে বুক পকেটে হাত দিল। বাসুদেব খুব একটা মানিব্যাগ ব্যবহার করে না। পকেটে পাতলা প্লাস্টিকের খামে সাধারণত টাকাপয়সা রাখে। কিন্তু এখন বুক-পকেটে হাত দিয়ে দারুণ চমকে উঠল। সর্বনাশ! টাকা ভরা খামটা পকেটে নেই। খুব কম করেও ওতে দশ-পঞ্চাশ একশো মিলিয়ে সাড়ে পাঁচশো টাকা ছিল। খামটা কোথায় গেল?

বাসুদেবের মাথায় এতক্ষণ রাস্তার খানাখন্দের দুর্ভাবনা ছিল। এখন টাকার চিন্তায় বুক হু হু করে উঠল। ওর মতো ছোটো দোকানদারের কাছে ওই টাকা অনেক কষ্টের ধন। মেয়ের বাড়ি যাচ্ছে যদি কোনো দরকার পড়ে এই ভেবে বেশি টাকা হাতে নিয়েছিল।

এখন দুখি দুখি মুখে নিজের মনে মাথা দোলাতে লাগল, হায়রে, অতগুলো টাকা চলে গেল? ছেলেটি ওর হাবভাব দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে জিজ্ঞাসা করল, কী হল?

নিরাশ স্বরে বাসুদেব জানাল আমার টাকাসুদ্ধ খামটা পকেট থেকে রাস্তায় পড়ে গেছে। ওতে অনেকগুলি টাকা ছিল।

একথা শুনে ছেলেটি ঠান্ডা গলায় বলল পথে যখন আসছিলেন নিশ্চয় টাকাগুলি সম্পর্কে আপনার হুঁশ ছিল। ভালো করে ভেবে দেখুন কতদূর পর্যন্ত আপনি টাকার কথা খেয়ালে রেখেছিলেন?

বাসুদেব বলল তুমি ঠিক বলেছ। একটু আগে যেখানে বসেছিলাম সেখান পর্যন্ত খামটা পকেটে ছিল বেশ মনে পড়ছে।

কিন্তু জামাটি গাছের ডাল থেকে নামাবার পর আপনি দেখেছিলেন সব কিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা?

বাসুদেব অবাক, ঠিক কথাই তো। ওখান থেকে জামাটি নিয়ে গায়ে দেবার পর তার পরিষ্কার মনে পড়ছে না পকেটে টাকাটি ছিল, না ছিল না।

আপনি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি একবার দেখে আসি। কথাগুলি বলেই ঝপ করে সাইকেলে লাফিয়ে উঠে সে আবার চলে আসা পুরোনো পথে সাত তাড়াতাড়ি রওনা হল।

সাইকেল সাথি ছেলেটি চলে যাওয়ার পর বাসুদেবের কেমন যেন গা ছমছম করছিল। বনবাদাড়ে শুধু মাত্র জন্তুজানোয়ার নয় এরকম অন্ধকারে তেনারাও ঘোরাফেরা করেন এ কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে একবার রাম নামও জপে নিল।

এরকম পরিস্থিতিতে ওর মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলি ঠিকমতো সে সাজাতে পারছে না। ছেলেটি পদে পদে ওর সাথে রয়েছে। দারুণ বাহাদুর ছেলে মানতেই হবে। কিন্তু ও যেভাবে চলে গেল তা থেকে চিন্তা হয় অন্ধকারের মাঝে যদি টাকার প্যাকেটটি কোথাও পড়ে থাকে ছেলেটি খুঁজে পাবে কী ভাবে? ওর তো প্যাঁচার মতো চোখ নয় যে অন্ধকারে সবকিছু দেখতে পাবে?

টাকাপয়সা অনেক সময় মানুষের চিন্তা ঘোলাটে করে দেয়। ওরকম ঘোলা জলে নেমে বাসুদেব চিন্তা করল, ছেলেটি ওর উপকার করেছে সত্যি। কিন্তু অতগুলি টাকা হাতে পেয়ে গরিবের ছেলে টাকার খামটি নিয়ে পালিয়ে যাবে না তো? যতই হোক মানুষের মতিগতি বোঝা দায়।

সাত-পাঁচ চিন্তা নিয়ে যখন বাসুদেব মগ্ন ছিল ঠিক তখনই শুনতে পেল ছেলেটির গলার স্বর, এই নিন আপনার টাকার প্যাকেট, ওই গাছের নীচে পড়েছিল।

বাসুদেব আনন্দে চমকে উঠল একই সাথে দারুণ লজ্জা পেল। ছিঃ ছিঃ। সে ছেলেটি সম্বন্ধে কত মন্দ কথা চিন্তা করছিল এতক্ষণ ধরে।

এবার বাড়ি যান। আমি চলি, যেন ওর কাজ শেষ এই ভাবে কথাটি বলে ছেলেটি চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন বাসুদেবের মনে হল এখনও ওর হাতে কিছু টাকা দেওয়া হয়নি কিন্তু ওতো চলে যাচ্ছে। ছেলেটির সম্পর্কে অন্তত কিছু খোঁজ নেওয়া দরকার। এবার তাই প্রশ্ন করল, তোমার নাম কী? প্রশ্ন শুনে সে থামল না। বাঁ-দিকের পায়ে চলা সরু ঝোপঝাড়ের রাস্তায় এগিয়ে যেতে যেতে দূর থেকে বলল, আমার নাম ঝড়ু।

ব্যাস, এই কথা বলেই অন্ধকারেই সে যেন তাড়াতাড়ি চলে গেল নজরের বাইরে। তখনই একটা ঝড়ো বাতাসে আশেপাশের গাছগুলির ডালপালা কেঁপে উঠল। দূরে আনন্দপুরের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে তবু বুকের ভিতর অজানা শিরশিরানি। এতক্ষণ ছেলেটি ছিল তার মনে কোনো ভয়ডর ছিল না। ভূতপ্রেতের কথা চিন্তার মধ্যেও আসেনি। কিন্তু এখন কেন এমন অস্বস্তি লাগছে? চারপাশের আবহাওয়া বড়ো ভূতুড়ে মনে হয়। তেনাদের কথা মনে এলে এরকম সুনসান পথে ভয় যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে বুকে চেপে বসে। এখন মনে হয় ছেলেটি বাকি পথটুকু সঙ্গে থাকলে ভালো হত।

শেষপর্যন্ত এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে বাকি পথটুকু পার হয়ে নির্বিঘ্নে গ্রামে পৌঁছে গেল বাসুদেব। বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে বাসুদেব দেখতে পেল ওর স্ত্রী মায়ারানির ভাই রামকৃষ্ণ এসেছে। রামকৃষ্ণ এখানকার একটি স্কুলের শিক্ষক। চারপাশের অনেক কিছু খোঁজখবর রাখে। বেশ ভালোমানুষ। মায়ারানিও সরলা প্রকৃতির। ওরা ভাই-বোনে একজোট হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসুদেবের অপেক্ষায়।

ওকে দেখে রামকৃষ্ণ এগিয়ে এসে খুশি খুশি গলায় বলল, যাক তোমাকে অক্ষত দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি ভেজা এতটা পথ জল কাদা পার হয়ে কী করে এলে? আমরা দারুণ চিন্তায় ছিলাম।

খুব সহজ গলায় বাসুদেব বলল, একজন ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে সাইকেলে একই পথে আসছিল। সে আমাকে ঠিকঠাক পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

কথাটি শুনে রামকৃষ্ণ অবাক। কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, তুমি ওর পরিচয় নিয়েছ ও কোথায় থাকে, কী নাম? বাসুদেব সামান্য চিন্তা করে বলল, ওর নামটি বেশ অদ্ভুত—ঝড়ু। ওরা থাকে জোড়া বকুলতলার ওদিকে। এবার রামকৃষ্ণের কপালে ভাঁজ দেখা দিল। তবে কোনো একটি বিষয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বলল,

ছেলেটি ঠিক কথাই বলেছে। ওর মায়ের নাম রজনি। ওরা খুব গরিব। ছেলেটি বাসুদেবপুর হাইস্কুলে পড়ত। ওর ভালো নাম স্বপন। ঝড়-জলের রাতে জন্ম হয়েছিল বলে ডাকনাম ঝড়ু।

দূরে আনন্দপুরের ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে তবু বুকের ভিতর অজানা শিরশিরানি...

বাসুদেব চোখবুজে কী যেন চিন্তা করে বলল, তাইতো তাইতো, মনে হচ্ছে আমি যেন ওকে চিনি।

রামকৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে আছে বাসুদেবদা সেবার দ্বারকেশ্বরের বন্যার সময় যখন চারপাশে থইথই জল তখন কলাগাছের ভেলায় চেপে একটি ছেলে জল ও কাদা ভেঙে কতজন মানুষকে জল থেকে ডাঙায় তুলেছিল। সে হল ওই ঝড়ু। এ ছাড়া তুমি নিশ্চয় শুনেছিলে বদ্যিপাড়ার আনন্দীবুড়ি যার নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তার যখন কলেরা হয়েছিল কেউ ওর চিকিৎসার জন্যে এগিয়ে আসেনি। তখন ডাকাবুকো স্বপন ওই আনন্দীবুড়িকে পাঁজা কোলা করে তুলে হেলথসেন্টারে পৌঁছে দিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ এখন স্বপন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। বলল, ছেলেটার আরও গুণ আছে। পোস্ট অফিসে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে স্কুলের রিটায়ার পণ্ডিতমশাই বাণীকণ্ঠবাবুর অনেকগুলি টাকা কোনো ভাবে রাস্তায় পড়ে

গিয়েছিল। তিনি খেয়াল করেননি। ভাগ্য ক্রমে টাকাগুলি অন্য কারও নজরে পড়েনি। ওই ছেলেটি টাকাগুলি কুড়িয়ে পেয়ে থানায় জমা দিয়েছিল। পণ্ডিতমশাই পুরোটাকা ফেরত পেয়েছিলেন।

বাসুদেব এসব শুনে উল্লসিত হয়ে বলল, বাঃ বেশ সমাজসেবী ছেলেতো, এরপর যখন আমার দোকানে আসবে তখন ও রকম পরোপকারী ছেলেকে নিশ্চয় কিছু উপহার দেব তার সাথে বড়ো একটা কেক খাওয়াব।

গলার স্বর ভারি হয়ে এল রামকৃষ্ণের, বলল, সে সুযোগ হবে না বাসুদেবদা, জঙ্গলের রাস্তায় দেখা তোমার সাইকেল সাথি স্বপন কোনোদিনই তোমার কাছে আসবে না।

কেন, আসবে না কেন? অবাক হয়ে জানতে চাইল বাসুদেব।

ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে মানদা ওদের কাছে এসেছিল। শুধু শেষের দিকের কয়েকটি কথা শুনে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল, কী কাণ্ড দ্যাখো, বাবু আমাদের সাইকেল ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। ওই ভূতের কথা আমরা শুনেছি। বনের রাস্তায় থাকে।

ভূত? সে কী কথা। সাইকেল ভূত সত্যি নাকি গো? ওখানে ভূত আছে? সাধাসিধে মায়ারানির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠে আতঙ্কে। চোখ-মুখের ভাব বদলে যায়।

আঃ তুমি চিৎকার করো না ওভাবে। কী সব উলটা-পালটা বক বক করছ সেই থেকে। সাইকেল ভূত আবার কী? মানদার দিকে তাকিয়ে কড়া সুরে ধমকে উঠল বাসুদেব।

রামকৃষ্ণ কিন্তু ধীর গলায় বলল, মানদা বোধ হয় সবটাই ভুল বলছে না। এর আগে শুনেছি ওই রাস্তায় দু-একজন সময় বিশেষে ওর দেখা পেয়েছে।

মোটেই না, আমি তোমাদের কথা একফোঁটা বিশ্বাস করি না। নিজের চোখে অমন একজন জলজ্যান্ত ছেলেকে দেখলাম সেটা কি মিথ্যা? বাসুদেব মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবলভাবে প্রতিবাদ জানাল।

তুমি ছেলেটিকে ঠিকই দেখেছ। স্বপন নামের ওই ছেলেটি আজ থেকে দশমাস আগে এক ঝড়জলের রাত্রে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু জলে ডোবা চোরা গর্তে পড়ে গিয়ে মাথায় দারুণ চোট পেয়েছিল। সেই অবস্থায় কোনোভাবে সে ঘরে ফিরে এসেছিল। তবে তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল বেদম জ্বর। ওর চোট লেগেছিল মাথার ভিতরে যা বাইরে থেকে বোঝা যায়নি। এখানকার হেলথসেন্টারে ছেলেটির যথাসাধ্য চিকিৎসা হয়েছিল কিন্তু জ্বরে জ্বরে সাতদিন বেহুঁস থেকে স্বপন মারা গিয়েছিল। গরিব ঘরের ছেলে তাই এনিয়ে কোনো হইচই হয়নি। তোমরাও ওর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারোনি। জঙ্গলের রাস্তায় যেখানে তোমার সাথে শেষ দেখা ওই ঝুপসি তেঁতুলগাছের নীচেই ও সাইকেল থেকে গর্তে পড়ে গিয়েছিল।

ওমা সত্যি সত্যি ভূত! তুমি এতক্ষণ ভূতের সঙ্গে কাটিয়ে এলে? মায়ারানির সারাশরীর ভয়ে ও বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

কিন্তু অবিচল থাকে বাসুদেব। সে শান্ত স্বরে বলল ভূত! তোমাদের কথায় মেনে নিলাম সে ভূত। কিন্তু তোমাদেরও মানতে হবে সে মানুষের ভালো করে, একজন পরোপকারী ভূত। এতক্ষণ ধরে রামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত মন দিয়ে শুনে সে জোর গলায় ভূতের পক্ষে সওয়াল করল।

স্বামীর মুখের ভাষায় পুরোপুরি বল ভরসা পেল মায়ারানি। মনও বদলে গেল তাড়াতাড়ি। তারপর বাসুদেবের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, ঠিক বলেছ তুমি ওতো উপকারী ভূত। এবার চোখেমুখে স্বস্তি ফুটিয়ে নিজের মতো করে বলল, এতদিন ধরে একটা কথা অনেক বার শুনেছি খারাপ লোককে দোষী ঠাউরে ঠাট্টা করে বলা হয় স্বভাব যায় না মলে। এখন দেখেশুনে বুঝতে পারছি কথাটি মন্দ ভালো সব দিক থেকেই কত খাঁটি। যে ভালো মানুষ সে মরণের পরও ভালোই থাকে তার স্বভাব কোনো দিনই বদলায় না।

কথাগুলি বলতে বলতে স্বপন নামের অজানা ছেলেটি যে অন্ধকারে জলে ডোবা খানাখন্দের রাস্তায় ওর স্বামীকে বিপদ থেকে আগলে আগলে রক্ষা করে সুস্থভাবে ঘরে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে সেই চোখে না-

দেখা ছেলেটির জন্যে ওর বুক গভীর আবেগে উথলে উঠল। সরল মনের মায়ারানি ভাবল, আহা! কী সোনার টুকরো ছেলে!

ভাবনার উচ্ছ্বাসে বরাবরের অভ্যাস মতো বুক থেকে বেরিয়ে আসছিল একজন মায়ের মুখের ভাষা, ভালো থেকো, বেঁচেবর্তে থেকো বাবা।

কিন্তু চকিতে সে হুঁশ ফিরে পেল। বুকের কথাগুলি মুখে এলেও ঠোঁটের মধ্যে আটকে রইল।

তবে চোখের জল আটকাল না। মায়ারানির গালের উপর গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা।

যা দেখে কাজের মেয়ে মানদা দারুণ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে নিজের মনেই বিড় বিড় শুরু করল, ওমা এমন কাণ্ড জেবনে দ্যাখিনি। ভূতের জন্যে চোখের জল?

ভুল হয় না ভূতের

বলরাম বসাক

এক যে ছিল মাস্টারমশাই। তার ছিল এক ছাত্র। অবশ্যই তাঁর অনেক ছাত্র ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা এমন গুরুতর ছাত্র যে কিনা বড্ড বে...।

এমনিতেই ছেলেটার নাম বেণুবদন। তার ওপর তার সঙ্গে জুড়ে যায় অনেকগুলো বে... বেয়াদব, বেয়াড়া, বেচারা, বেহায়া, বেপরোয়া, বেভুলু, বেঢপ, বেশরম, বেখাপ্পা...।

আর তার মাস্টারমশাই-এর নাম ভীষণ ভৈরব ভট্টাচার্য। তার সবই 'ভ' দিয়ে—ভয়ানক স্যার। কখনো বা ভস্মলোচন স্যার। কখন? যখন তাঁর দেখা পরীক্ষার খাতায় কেউ যদি গোল্লা পায়, তখন সেই গোল্লা পাওয়া ছাত্রটি তাঁর চোখের সামনে দাঁড়াতে পারে না। বিলকুল ভস্ম হয়ে যাবে। শোনা গেছে, অনেক মা-বাবাই তাঁদের ছেলে গোল্লা পাবার মতো পরীক্ষা দিয়েছে টের পেলে পড়ি-মরি করে ছুটে এসে ভস্মলোচন স্যারের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বলেন 'ক্ষমা করে দিন স্যার, আর ভুল হবে না স্যার, আমাদের ছেলে নেক্সট পরীক্ষায় কমসে কম 'এক' তো পাবেই—কথা দিচ্ছি আর গোল্লায় যাবে না...।' এ ছাড়া তাঁর আরেকটা নাম 'ভল্লধর' (কারণ তিনি যে বেত হাতে নিয়ে সারা ইস্কুল ওপর-নীচ করে বেড়ান, সেই বেতটা কোথাও মোটা কোথাও লিকলিকে সরু, ওপরটা ছুঁচোলো, দেখতে নাকি ভল্ল মতন ছেলেদের চোখে, যারা তাঁকে 'ভল্লধর' খেতাব দিয়েছে।)

যাই হোক, বর্তমানে ইস্কুল প্রতিদিনের মতোই কলকল খলখল করে চলছে। কেবলমাত্র বেণুবদনদের ক্লাসঘরে কোনো আওয়াজ নেই।

সেখানে ভীষ্মভৈরববাবু চোখ পাকিয়ে প্রত্যেকটি ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন। এই মুহূর্তে তাঁর ভস্মলোচন নামটাই মজবুত কারণ ওনার দেখা পরীক্ষার খাতাগুলো উনি জুল-জুল চোখো ছাত্রদের সামনে হাজির করেছেন। বেণুবদন ছাড়া প্রত্যেকেই '4', '3' '10', '7', '5' ইত্যাদি নম্বর পেয়েছে। বেণুবদন শুধু পেয়েছে '1'। ভাগ্যিস জিরো কেউ পায়নি, পেলে কে জানে বাবা তাকে হয়তো সত্যি সত্যি ভস্ম হয়ে যেতে হত। বেণু অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বেণু '1' পেয়েছে কারণ পরীক্ষার খাতায় উত্তরগুলো লিখতে সে মোট চারশো বারোটা শব্দ লিখেছে, তার মধ্যে চারশো এগারোটা শব্দের বানান ভুল। একটা শব্দের বানান সঠিক হওয়াতে দয়ালু ভস্মলোচন স্যার তাকে '1' নম্বর দিয়েছেন। দিলেও খুশি হননি। বিপুল সংখ্যক বানান ভুলের জন্যে বেণুবদনকে শাস্তিস্বরূপ পেতে হবে চারশো এগারোটা বেত্রাঘাত (ভল্লাঘাত)। উরে বাপরে। ওটা পেতে হবে বুঝতে পেরে বেণুবদন ক্লাস থেকে দে চম্পট।

পালাবে কোথায়? চম্পট দিলেই হল? ভস্মলোচন স্যার, থুড়ি, এবারে আর ভস্মলোচন নামটা ব্যবহার না-করে বলা যাক ভল্লধর স্যার 'ভল্ল' হাতে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বেণুবদনের পেছন পেছন ছুট লাগালেন।

বেণুবদন পাঁই পাঁই করে ছুটে ইস্কুলের নীচতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা, থেকে চারতলায়, ছাদে উঠল।

চারতলার ছাদে একটি মাত্র ঘর। সবসময় খালি পড়ে থাকে। জানালাগুলো বন্ধ থাকে একটা মাত্র দরজা ভেজানো থাকে। ও ঘরে কেউ আসে না। উঁচুতলার এই খালি ঘরটাকে চামচিকে-ভূত, পেচকিনী-পেতনি, গিটার বাদক গুঁফো ভূত, সূচনখা শাঁকচুন্নি, বংশীবাদক নেকো ভূত, বেঁটেমোটা ঢাকি ভূত, কলসি ভূত, গামবুট-ভূত, ঝুল ঝাড়ু-পেতনি, সব্বাই মিলে তখন এক থঁড়ি 'ইসপিশাঁল সাঁইজ' ভূতুড়ে পানতুয়া নিয়ে বসে ছিল। আর সব্বাই মিলে ভূজ্জাতীয় (ভূত + জাতীয়) সংগীত সমবেত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে গাওয়ার মহড়া

চালাছিল। কণ্ঠস্বর অতিমিষ্টি রাখার জন্যে একটি করে পানতুয়া কোঁৎ করে গিলছিল। মিষ্টি-মিহি-চিঁচিঁ-স্বরে ফিসফিসিয়ে এই গানের মহড়া চালাতে হচ্ছিল কারণ এ যে দিঁবাকাঁল—চোঁপ ইঁসকুল চোঁলছে'। 'নিশাঁকাল' হলে গলা ছেড়ে দাপিয়ে মহড়া হত।

চারতলার ছাদের এই একমাত্র ঘরটাতে বেঞ্চি-টেঞ্চি আছে কয়েকটা, ব্ল্যাকবোর্ডও একটা ঝুলছে দেয়ালে। কিন্তু ভূতের ঘর বলে কেউ এ ঘরে ক্লাস করতে চায় না। তবে মাঝে মাঝে অভিযান হয় মাস্টারমশাইদের। 'দেখিতো কেমন ভূত' বলে তাঁরা একটা ছেঁড়া রামায়ণ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। তাঁদের পেছনে পেছন বুক দুরু দুরু ছাত্রদলও ঢোকে। হাতে থাকে বেত, ডাস্টার, টিনের স্কেল, ইস্পাতের স্কেল, ইস্পাতের এল স্কেল। ছেঁড়া রামায়ণটাকে ঢাল করে সামনে ধরে অস্ত্রধর স্যাররা বেতগুলোকে শূন্যে সপাং সপাং করে চালাতে থাকেন, প্রচণ্ড জোরে ডাস্টার ঠুকতে থাকেন বেঞ্চিতে, উঁচু ক্লাসের 'বীর' ছাত্রেরা টিনের স্কেল, ইস্পাতের স্কেল তলোয়ারের মতো শূন্যে এদিক-ওদিক ঘোরাতে থাকে। ভূত-পেতনিরা অবশ্য তখন কেউই ভেতরে থাকে না। ওরা ঘরটাতে ঢুকবার আগেই কেটে পড়ে।

'ইবার, ইবার যাবি কুথায়...' বলেই সঙ্গে সঙ্গে 'ভল্ল'-টাইপ বেত চালিয়ে গেলেন বেধড়ক...

যাইহোক, আজ এই মুহূর্তে বেণুবদন ছুটতে ছুটতে ওই ঘরেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে। তাকে ঢুকতে দেখে 'ভূজ্জাতীয়' সংগীত গানের মহড়ায় রত ভূত-পেতনি-শাঁকচুন্নিরা আঁৎকে উঠেছিল। মনে করেছিল 'জ্যান্ত'রা ভূত তাড়ানোর অভিযান করতে ভেতরে ঢুকছে। তখন সবকটা ভূত-পেতনি-শাঁকচুন্নি দরজা দিয়ে পালাতে চাইছিল। কিন্তু দরজায় 'ভল্ল' হাতে ভল্লধর স্যার—ওঁরে বাঁপুরে বলে তারা তাড়াতাড়ি যার যার শরীর খুদে টিকটিকির ছানার মতো করে ফেলল, কেউ কেউ মাকড়সারূপ ধারণ করল। তারপর দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে ভেন্টিলেটার গলে পালাতে লাগল। তখন ভেন্টিলেটারে ট্রাফিক জ্যামের মতো ভৌতিক জ্যাম হয়ে গেছিল। তাই কলসি-ভূত পালাতে পারেনি। তখন সে কী করে ? একটা বেঞ্চির ওপর দাঁড়ায়, এবং দ্রুতগতিতে বেণুবদনের রূপ ধারণ করে ফেলে। কারণ ও ভেবেছে বেণুবদনরা ভল্লস্যারকে নিয়ে ভূত

তাড়াতে এসেছে। ওরা তো জ্যান্ত মানুষকে পেটাবে না, ভূত পেটাবে। তাই সে খুউব বুদ্ধি করে তক্ষুনি বেণুবদনের রূপ ধারণ করেছিল। করে যে কী ভুল করেছিল—ওহ্।

যা ঘটল...! ঘরের দরজা বন্ধ করে ভীষণভৈরব ওরফে ভস্মলোচন ওরফে ভল্লধরবাবু বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো বেণুবদন-রূপ ধরা কলসি ভূতকে হুমম হুমম চোখ গুড়ুম করে বললেন 'ইবার, ইবার যাবি কুথায়...' বলেই সঙ্গে সঙ্গে 'ভল্ল'-টাইপ বেত চালিয়ে গেলেন বেধড়ক। কলসি ভূতকে বেদম পিটিয়ে দিতে দিতে বললেন 'তুই আমার পরীক্ষার খাতায় বানান ভুল লিখিস অ্যাঁ... একটি দুটি নয় অ্যাত্তো অ্যাত্তো বানান ভুল, অ্যাঁ বানান ভুলের সুনামি .... যত বানান ভুল করেছিস তত ঘা বেত তোকে খেতেই হবে।...'

কলসি ভূত পিটুনি খেতে খেতে মিনমিন করে বলেছিল, 'আঁমি বেঁণুবঁদন নঁই স্যাঁর....। আঁমাকে ছেঁড়ে দিঁন স্যাঁর...।' এমন খিনখিন গলার স্বর তার ওপর চন্দ্রবিন্দু বসানো—যে ভীষ্মস্যারের কানে কথাগুলো ঠিক ঠাক প্রবেশ করেনি। ওইরকম মিহি কণ্ঠস্বরে সে বলে চলছিল ভূতের কক্ষনো বানান ভুল হয় না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আসলে বেণুবদন তো মানুষের ছানা। সে করেছে বানান ভুল। আর মার খেতে হচ্ছে তার মতো কলসি ভূতকে। 'ভেঁউ ভেঁউ—ওই গঁদা নাঁকি ভঁল্ল দিয়ে-উঁরে বাঁপুরে-ভেঁউ ভেঁউ ভেঁউ ...অঁত বেঁতপিঁটুনি খেঁলে স্যাঁর কঁলসি ভেঁঙে যাঁবে। ত্যাঁখন যেঁ মোঁর নাঁম ভাঁঙা কঁলসি ভূঁত হঁয়ে যাঁবেন স্যাঁর... সেঁ বঁড়ো বিঁচ্ছিরি নাঁম-ভেঁউ ভেঁউ ভেঁউ।' কাঁদতে কাঁদতে কলসি-ভূত কথা দিল যে সে এবার থেকে বেণুবদনের মাথায় ভর করে বসবে। এবং দেখবে পরীক্ষার সময়—ওর বাংলা বানান কিছুতেই যেন ভুল না-হয়—ভুল করে ফেললে কলসি ভূত নিজে সংশোধন করে দেবে... 'ভেঁউ... ভেঁউ... ভেঁউ। করতে করতে কলসি ভূত ওপরে তাকাল। দেখল ভেন্টিলেটারে ভৌতিক জ্যাম শেষ হয়ে গেছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ভিমরুল রূপ ধারণ করে ভেন্টিলেটার দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে চোখ বুজে ভীষ্মবাবু বেত পেটানোর ঘোরে দেয়াল পেটাচ্ছেন। টেবিল পেটাচ্ছেন। হাইবেঞ্চি পেটাচ্ছেন। বন্ধ দরজা পেটাচ্ছেন। পরে খেয়াল হল—আরে কাকে পেটাচ্ছি।—কই—? বেণুবদনতো নেই। পালাল কোনদিক দিয়ে? দরজা জানালাতো বন্ধ।

বেণুবদন, স্যারের ঢুকবার কয়েক সেকেন্ড আগেই ভূতদের পানতুয়ার হাঁড়িটা বগলদাবা করে বেঞ্চির তলা গলিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চম্পট দিয়েছিল। 'ভল্ল' হাতে স্যার ততক্ষণে দরজার সামনে এসে পড়েছিলেন, দেখে বেণুবদন স্যারের পেছনে চলে গিয়ে ছুট লাগিয়ে দিল। আর স্যারও বেত লাগানোর ঘোরে কিচ্ছুটি খেয়াল না-করে ঘরে ঢুকেই বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো বেণুবদনকে (যে কিনা আসলে কলসি ভূত) দেখতে পেয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর বেণুবদনরূপ ধরা কলসি ভূত যা পিটুনি খেল। ভেন্টিলেটার দিয়ে বেরিয়ে কলসি ভূত পিঠ বেঁকিয়ে কোমর বেঁকিয়ে আঁহ ওঁহ আওয়াজ করতে করতে তেঁতুলতলার বাসায় ফিরল। তারপর পিঠে কোমরে পায়ে হাতে বিচুটি পাতার তেলমালিশ করতে বসল। মালিশ করতে সাহায্য করল বেঁটেমোটা ঢাকি ভূত। হাতপাখা-পেতনি হাওয়া করতে বসে গেল। উঁহ ইহঁ করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সে যে বেণুবদনের স্যারকে কথা দিয়ে এসেছে।

ভূতেরা কথা দিলে কথা রাখে। নইলে ভূতের বাবা চরখিডিগবাজি শাস্তি দেন। চরখির মতো বনবন ঘুরপাক খাওয়া ডিগবাজি কমসে কম দশহাজার বার। কাজ নেই কলসি ভূত ভাবল। তার চেয়ে কথা রাখা ভালো। বেণুবদনের মাথায় ঢুকে, ওর মাথায় ভর করে পরীক্ষার সময় ওর বানান ভুল শুদ্ধ করে দিতে হবে—এ যে কথা দিয়ে ফেলেছে কলসি ভূত ভীষ্মভৈরব বাবুকে। এবারে কথা রাখার প্রথম ধাপ হচ্ছে কলসি ভূত বেণুবদনের মাথায় ঢুকবে। কী করে ঢুকবে?

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় বেণুবদনের...। চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে দেখে একটা ইয়া লম্বা ছায়া, যার বুক নেই, গলা থেকেই শুরু হয়ে গেছে ইয়া গোল পেট—যেন একটা কলসি—তার ওপর এইটুকুন মাথা, বড়ো বড়ো কান, লালবাতি চোখ—দাঁতকিড়িমিড়ি হেসে বলল, ''বঁৎসো বেঁণুবদন, ভঁয় পেওনা ভঁয় পেওনা। আমি তোমায় মারব না। শুধু আমার হাতে এই ছেনি, আর ওই হাতে হাতুড়ি মেরে ছেনির ঘায়ে আমি তোমার

মস্তক ফুটো করিব। সেই ফুটো দিয়া আমি তোমার মস্তকে প্রবেশ করিব। করিয়া তোমার বানান ভুল...।''
সঙ্গে সঙ্গে বেণুবদনের কী জোরে গলাফাটানো চিৎকার—কলসি ভূতকে পুরো বলতে দিল না। তার আগেই প্রচণ্ড জোরে হাঁউমাঁউ চেঁচামেচি করে ধড়মড় করে উঠে বসল বেণুবদন। আর বাড়িশুদ্ধু লোক দাদু-বাবা-মা-দিদি-দাদা সব ছুটে এল।

'কী হয়েছে...কী হয়েছে...!'

'একটা ভূত। বলে কি মাথায় ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি ঠুকে মাথা ফুটো করবে...অ্যাঁ-অ্যাঁ।' কেঁদে ফেলল বেণুবদন।

'কোথায় ভূত?' সবাই সারা ঘর-দালান-বারান্দায় খুঁজে দেখল। বেণুবদনের দিদি বলল 'যাহ্-একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছিস...।'

বেণুবদনের মাথায় ঢোকা হল না। কিন্তু ঢুকতেই হবে যে। কথাতো রাখতে হবে কলসি ভূতকে। হাতুড়ি ছেনি ফেলে দিয়ে সফেদাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে, সফেদা পেড়ে, তারপর সফেদার শাঁস খামচে খামচে ফেলে দিয়ে, তার বিচিগুলো কড়মড় করে চিবিয়ে ভাবতে লাগল। তার পাশে বসে বেঁটেমোটা ঢাকি ভূতও ওইরকম করে সফেদার বিচি চিবুচ্ছিল। সে বলল,' 'অ্যাক কাজ করো। বেণুটা নিশ্চয় ভূতের অত বড়ো বড়ো পানতুয়া খেয়েছে।'

'তা খেয়েছে।'

পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে লিখতে ঘুম পাচ্ছিল...

'তবে ওর মুখের হাঁ বড়ো হয়ে গেছে। যখন দেখবি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তখন তুই তোর বডির সাইজটা পানতুয়ার মতন করে ফেলে ওর হাঁ-এর ভেতরে ঢুকবি।'

'বেশ তো না-হয় ঢুকলাম। সোজা পেটের ভেতর চলে গেলাম...।'

'খবরদার না। পেটে গেলে তোকে হজম করে ফেলবে। অত্তোগুলো পানতুয়া হজম করে ফেলল ছোঁড়াটা —তাও কিনা ভূতের পানতুয়া। তুই ওর গলা পর্যন্ত ঢুকবি, তারপর তোর বডিটাকে সেদ্ধ চাউমিনের মতো সরু লম্বা করে ফেলবি। ফেলে ওর শরীরের ভেতরে শিরা ধমনির লাইন ধরে মাথার ভেতরে ঢুকে পড়বি...।'

যাইহোক পরীক্ষা এলে বেণুবদন টের পেল মাথাটা কী ঝাঁ-ঝাঁ করছে। করুক পরীক্ষায় তো বসতেই হবে। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে লিখতে ঘুম পাচ্ছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে লিখতে হচ্ছিল। পরীক্ষা-শেষে

বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল। একেবারে ঘুমে বেহুঁশ। হাঁ করে নাক ডাকা শুরু করে দিল। হাঁ-থেকে একটু পরে বেরিয়ে এল গোল পানতুয়ার মতন কলসি ভূত। হাঁ কথা রাখা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ সত্যি সত্যি কথা রেখেছে কলসি ভূত। পরীক্ষার খাতায় বেণুবদনের একটা বানানও ভুল হতে দেয়নি। প্রত্যেকটা বানান শুদ্ধ। যেখানে 'স' বসাবার কথা সেখানে 'শ' বা 'ষ' বসানো হয়নি। 'স' ই বসানো হয়েছে। 'ণ' লিখবার কথা যে শব্দে সেখানে 'ণ' লেখা হয়েছে 'ন' নয়। কিন্তু তবু ভস্মলোচন স্যার খাতা দেখবার সময় কিন্তু-কিন্তু করে উঠলেন। সবগুলো বানানেই শব্দের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসানো। এ যে ভূতের ভাষায় বিশুদ্ধ বানান—চন্দ্রবিন্দু লাগানো। এ্যহ্ এ যে প্রত্যেকটা শব্দে চন্দ্রবিন্দু। বসিয়ে দেবেন নাকি জিরো'?

নাহ। 'জিরো' বসাতে পারলেন না ভস্মলোচন ওরফে ভীষ্মভৈরববাবু—কারণ পুরো লেখা খাতায় যতটা শব্দ আছে তার মধ্যে কিছু শব্দের বানানতো উচ্চারণে ভূতের আর মানুষের একই—যেমন হঁদুর, চাঁদ, কাঁধ, ঝাঁপ, পঁচিশ, দাঁত... এমন করে গোটা ছাব্বিশ শব্দ পাওয়া গেল বেণুবদনের খাতায়—যেগুলো ভূতে যা লেখে মানুষেও তাই লেখে। অগত্যা বেণুবদনকে নম্বর দিতেই হবে—দিয়ে দিলেন ভীষ্মভৈরববাবু ছাব্বিশ নম্বর দরাজ হাতে।

আহা কী আনন্দ বেণুবদনের...।

আর কী আনন্দ ভূত-পেতনি শাঁকচুন্নির—কলসি ভূত কথা রেখে দারুন 'ছাঁকছেঁচফুল। সব ভূত-পেতনিরা আনন্দে ডগমগ হয়ে ইস্কুলের ছাদে নাচতে শুরু করে দিয়েছে.... হেঁ হেঁ হঁল্লা হঁল্লা রেঁ রেঁ রেঁরাঁ-রা রাঁ-রা' নাচের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে নীচে দড়াম করে পড়ে গেল কলসি ভূত—চুঁক চুঁক চুঁক। পড়ে গিয়ে না মাথা ফাটেনি কোমরও ভাঙেনি (ভূতদের ওসব ভাঙেটাঙে না), শুধু কলসি ভূতের কলসি ভেঙে গেল—এঁ হেঁ হেঁ। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভাঙা কলসি ভূত। নামটাও যে হয়ে গেল 'ভাঙা কলসি ভূত'—হঁস্সস...।

জটা তান্ত্রিকের খপ্পরে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

কথায় আছে, কানার পা-ই খানায় পড়ে। তাই পড়ল শেষপর্যন্ত। পই পই করে বারণ করেছিল সকলে, শেওড়াতলি থেকে বেলতলা, নেহাত কম রাস্তা তো আর নয়, এমন সময়ে যাত্রা না-করাই ভালো। বিশেষ করে রাস্তায় পড়বে জটা তান্ত্রিকের আখড়া, একবার যদি তার হাতে পড়েছ তাহলেই গেলে—ভূত ভবিষ্যৎ সব একেবারে ঝরঝরে। তা শুনলে তো সে-কথা কাঙালিচরণ। উঠতি মস্তান, এধার-ওধার তিড়িং-বিড়িং করে বেড়াচ্ছে, ভাবলে এ আর কী এমন কাজ, আঁধার নামার আগেই পৌঁছে যাব বেলতলায় গুল্লুমামার কোলে। নাও, ঠেলা সামলাও এখন!

না, সাবধান কাঙালিচরণ হয়নি বলাটা ঠিক হবে না। চোখে না-দেখলেও জটা তান্ত্রিকের নামে হাড় হিম হবে না এমন চ্যাংড়া ভূভারতে নেই। বড়োরাই আঁতকে ওঠে তার কথা শুনে, ছোটোদের তো কথাই নেই। তবে সাবধানের যেমন মার নেই বলে, মারেরও তো সাবধান নেই! সেই রকম ব্যাপারই একটা ঘটে গেল বলা যেতে পারে। মাঝ রাস্তাতেই দিনের আলো কেমন নিবে এল, সাঁই সাঁই করে ছুটে এল ঝড়ো হাওয়া, দিগবিদিক ঠিক করতে না-পেরে বিরাট এক বট না-অশ্বত্থের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে যেই পড়েছে মাটিতে মাথা ঠুকরে, শুনতে পেয়েছে পিলে-চমকানো হাসি—'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! ব্যোম শংকর—জয় তারা।'

বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চোখ ভয়ে, কিন্তু যা দেখবার তার মধ্যেই দেখে নিয়েছিল। যেন আর এক মহাদুর্যোগ! ছুটে আসা কালোমেঘের মতো দাড়ি-গোঁফ-জটার জঞ্জাল। ঝলকে ওঠা বিদ্যুতের মতো ঝকঝকে দাঁতেরপাটি, আর মেঘ গর্জনের মতো কণ্ঠস্বর—হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছিল, 'আমার হাত থেকে পালাবি, ব্যাটা পিলে-পটকা ঘমের পাঁচন কোথাকার!' ফলে, চোখ খুলতে আর ভরসা হচ্ছিল না, ওই ভাবেই মটকা মেরে পড়েছিল।

না, চোখে দেখেনি কাঙালিচরণ জটাকে এর আগে। সে ক-টা লোকই বা তাকে চোখে দেখেছে! কিন্তু শুনেছে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু। জ্যান্তো-মানুষের সঙ্গে নাকি তেমন পটে না জটা-তান্ত্রিকের, তার কারবার সব মরা মানুষ নিয়ে। মানুষের মুণ্ডু নিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসন বানিয়েছে, মানুষের রক্ত দিয়ে তার পুজোবেদির আলপনা আঁকা হয়, মরা মানুষের বুকের ওপর চেপে নাকি তার সাধনা। সারাদিন মদ-ভাঙ খেয়ে ঝিমোয় জটা, সূর্যের আলো নিবু নিবু হলেই নাকি তার পরাক্রম বাড়ে। যেমন আজ এখন বেড়েছে।

সবাই বলে জটা তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ। মানেটা কাঙালিচরণ ভালো বোঝে না। তবে এটুক বোঝে, মানুষ তো কোন ছার—ভূতপ্রেতরাও জটার কাছে ছেলেমানুষ। তা যে-লোক মরা মানুষের দেহ সাধনা করে, ভূতপ্রেতরাই বা তার কী করবে! ভূত-পেত্নিরা নাকি তার হুকুমে ওঠে বসে, এমন কথাও শুনেছে কাঙালিচরণ! চোখে দেখার পর মনে হয়েছে কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে। এরকম ভয়ংকর জায়গায় যে থাকে তার মনে কি আর ভয়ডর বলে কিছু থাকতে পারে! ভূতদের নিয়ে তো সে ছেলেখেলা করতে পারে।

সে না-হয় হল, কিন্তু কাঙালিচরণকে মিছিমিছি এভাবে আটকাল কেন জটা, সেটাই তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য জটাই যে ওকে আটকেছে সেটা বলা ঠিক নয়, কাঙালি নিজেই ঝড়ের দাপটে গোঁত্তা খেয়ে পড়েছে, কিন্তু ওকে দেখে জটা তান্ত্রিকের যে উল্লাস, সে তো আর মিথ্যে নয়। ওকে দেখে জটার এত আনন্দ কেন! তাহলে কি সাধনা করার জন্যে নতুন একটা শবই খুঁজে পেয়ে গেল জটা? সেই জন্যেই ওই হাসি?

কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল কাঙালির। চোখ বন্ধই ছিল, এখন জোর করে চোখের পাতা আরো চেপে ধরল ও। টের পেল বোধ হয় সেটা জটা। চোখ বুজেই শুনতে পাচ্ছিল জটা বলছে, 'কীরে ব্যাটা উচ্চিংড়ে, খুব ঘেবড়ে গেছিস মনে হচ্ছে।'

না, ঘাবড়ে যাবে না! চোখের সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছ তুমি—দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে বত্রিশ পাটি চমকাচ্ছ, হাসির তালে তালে তোমার দশমনি ভুঁড়ি নাচছে, এতেও যদি ঘাবড়াব না তো ঘাবড়াব কীসে! কথাগুলো মুখে বলবার ক্ষমতা অবশ্য কাঙালির ছিল না, কোনো রকমে একটুখানি চোখ খুলে পিটপিট করে চাইল, বলল, 'আজ্ঞে তা একটু গেছি।'

'একটু কেন, বিলক্ষণ!' আবার ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসল জটা তান্ত্রিক, বলল, 'তা মরতে এলি কেন এখেনে? মতলবটা কী তোর?'

'কিছু মতলব নেই এজ্ঞে'—একটু যেন আশার আলো দেখতে পেয়েছে এইভাবে হাঁকুপাকু করে বলে উঠল, 'ঝড়জলে রাস্তা ঠাহর করতে পারিনি, তাই এসে পড়েছি। নইলে সাধ করে এজ্ঞে আপনার এখেনে কি কেউ'—

'কেন কেন কেন?' হুংকার দিয়ে উঠল জটা, সমস্ত গাছপালা কেঁপে উঠল যেন সে-হুংকারে, দাঁত খিঁচিয়ে, বলল, 'আমি বাঘ না-ভাল্লুক? ধরব আর তোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব?'

...'কীরে ব্যাটা উচ্চিংড়ে, খুব ঘেবড়ে গেছিস মনে হচ্ছে।'

তা তুমি পারো বাপু, আমার মতো একশোটাকে ধরে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারো, সে আমি জানি।

না, এবারও কথাটা মুখে বলল না কাঙালি, ভয়ে ভয়ে শুধু মুখ দিয়ে তার বেরুল, 'না না, সেকি কথা এজ্ঞে, আপনি এত বড়ো তান্ত্রিক, আর আমি একটা বাচ্চা ছেলে'—

'ও বাচ্চাই হও আর চৌবাচ্চাই হও, আমার কাছে কারো রেহাই নেই'—আবার এক হাড়কাঁপানো হাসি! হাসতে হাসতেই বলল জটা, 'মানুষ তো কোন ছার, দত্যিদানোও ভয় করে আমাকে দেখে।'

'জানি তো এজ্ঞে।' ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে কাঙালির।

'বটে! কী করে জানলি?'

'শুনেছি এজ্ঞে লোকের মুখে।'

'চোখে দেখে যা এবার'—সামনের বিরাট ডালপালাওয়ালা গাছে কয়েকটা চামচিকে ঝুলছিল, সেদিকে আঙুল তুলে জটা বলল, 'কী বল দিকি ওগুলো?'

'বাদুড় চামচিকে এইসব বোধহয় কিছু'—

'তোমার মুণ্ডু!' ধমকে উঠল জটা, 'ওগুলো সব গেছো ভূত। চামচিকে বানিয়ে রেখেছি আমি ওদের। খেলা দেখতে চাস তো বল, নামিয়ে আনি ওদের গাছ থেকে।'

'না না এজ্ঞে'—আর্তনাদ করে উঠল কাঙালি, 'ওসব দেখে কাজ নাই আমার।'

'কাজ নাই! কী বললি, কাজ নাই? তাহলে কী করে বুঝবি আমার মাহিমা?'

'আপনার মহিমা হুজুর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এ তল্লাটে কে জানে না আপনার কথা?'

'সব তল্লাটে জানবে। তিন কুড়ি শবসাধনা করে আমি পিশাচসিদ্ধ হয়েছি, দত্যিদানো রাক্ষস পিশাচ সব আমার মুঠোর ভেতর—কারো ক্ষমতা নেই ট্যাঁ-ফোঁ করে।'

'জানি এজ্ঞে।'

'কী করে জানলি?'

'ওই যে এজ্ঞে দেখালেন গেছো ভূতদের!'

'আরো অনেক দেখাতে পারি, গাছতলায় ওই যে যন্তরটা পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস?'

'কোনটা এজ্ঞে, ওই যে আখমাড়াই বলের মতো যন্তরটা?'

'ওটা আখমাড়াই কল নয়।'

'তবে?'

'ভূত-মাড়াই কল।'

'এজ্ঞে!!!' বিস্ময়ে গলাটা চিঁ চিঁ করে উঠল কাঙালিচরণের।

'ভূত ধরে ওতে মাড়াই করি আমি। তাইতে কালো কুটকুটে তেল বেরোয়, আলকাতরার মতো কালো। সেই তেল অনেক কাজে লাগে আমার।'

কী কাজে লাগে জিজ্ঞাসা করবার সাহস ছিল না কাঙালির। গোটা ব্যাপারটা হজম করাই খুব কঠিন হচ্ছিল ওর পক্ষে। মনে হচ্ছিল গায়ে আর ছিটেফোঁটা শক্তিও নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকাচ্ছিল চকাভুলকোর মতো। দেখে আর এক দফা হাসি জটা তান্ত্রিকের, তবে এবার আর ঘাবড়ে গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করল না, বলল, 'বাদ দে ওসব কথা। তোকে কী-কাজে লাগাব মনে করেছি সেটাই এবার বলি।'

বুকটা ধক করে উঠল কাঙালিচরণের। কোনো রকমে সাহস সঞ্চয় করে শোনার চেষ্টা করল কী বলছে লোকটা! আর একবার ব্যোম শংকর আর মা তারা হাঁক ছেড়ে বলল, 'তিন কুড়ি শব সাধনা করে পিশাচসিদ্ধ হয়েছি আমি, আরো দু-কুড়ি করতে পারলে ঠাকুর-দেবতাও আমার কিছু করতে পারবে না, এমনি হবে আমার শক্তি। কিন্তু সেই দু-কুড়ি পূর্ণ করতে এখনও পারিনি আমি, এক কুড়ির মতো এখনও বাকি আছে। তাই তোকে দেখে আমার এত আনন্দ হয়েছিল।

কী সর্বনাশ! এ তো যা ভেবেছিল তাই!

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল, আওয়াজ বেরুছিল না মুখ দিয়ে, কোনো রকমে কাঁচুমাচু মুখ করে বললে কাঙালিচরণ, 'এজ্ঞে, আমাকে ওসব বলবেন না, ভয় করে।'

'ভয় করে! কেন?'

'হাজার হোক, বয়সটা অল্প তো এজ্ঞে, মারব ধরব শুনলে'—

'দূর ব্যাটা হতচ্ছাড়া বিটলে কেলো ভীতুর ডিম!' গর্জন করে উঠল জটা তান্ত্রিক, 'মায়ের কাছে উচ্ছুগগু করা হবে তোকে, এতো পুণ্যের কথারে! এ জন্যে তুই ভয় পাচ্ছিস!'

শুকনো গলায় চিঁচিঁ আওয়াজ বার করে কাঙালি বললে, 'আমাকে ছেড়ে দ্যান তান্ত্রিক-মশাই, আর কোনোদিন এ তল্লাট মাড়াব না আমি, এই নাকে খত দিচ্ছি।'

'দূর কালীকুষ্টি খ্যাঁদাচরণ। নাক তোর নেই মোটে তা খত দিবি কী! যা বলছি তাই শোন'—

'এজ্ঞে'—

'কথা না-শুনেই এজ্ঞে! মনে হয় একহাতে মুচড়ে দিই তোর ঘাড়টা'—জটা তান্ত্রিক চোখ গোল গোল করে বললে, 'তোকে আমি বলেছি, আমার শবের আসন করব?'

'না এজ্ঞে ওই যে কেমনধারা কথা বলছিলেন'—

'চোপ! মায়ের কাছে আগে মানত না-করলে তার শবে কাজ হয় না। সে মানত আমি একজনকে করে রেখেছি।'

'আঃ বাঁচালেন'—কবুতরের খাঁচার মতো বুকথেকে ফোঁস করে খানিকটা নিশ্বাস বেরিয়ে গেল কাঙালিচরণের, বললে, 'তাইলে আমাকে এমন ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন হুজুর?'

'আরে বেল্লিক ছুঁচো, তোকে একটা কাজ করে দিতে বলছিলাম আমার। পারবি? তা হলে বেঁচে গেলি এ যাত্রা, নইলে—'

'একশোবার পারব হুজুর, হাজারবার পারব, পেত্যয় না-হয় বলেই দেখুন একবার।'

'বলবার আগেই তো দাঁতমুখ ছটকে বসে আছিস। কথাটা বলি তাহলে, মন দিয়ে শোন।'

'বলুন এজ্ঞে!'

'এই গাছ পেরিয়ে দু-কদম গেলেই একটা ছোটো নদী, নদীর ওপারে আম-জাম-কাঁঠালের বন। সেই বনে আজ দু-দিন থেকে দেখছি তোর মতো একটা উচ্চিংড়ে নিয়ম করে আসছে।'

'জানে না বোধহয় এজ্ঞে এখেনে আপনার অধিষ্ঠান, জানলে পরে'—

'চোপ! বাজে কথা একদম বলবি না। গরিব ছোঁড়া, ফল-পাকুড়ের সন্ধান পেয়েই আসে নিশ্চয়ই। আর সন্ধে হলেই নদীর ওপারে দু-হাত জড়ো করে এক পেট জল খায়, তারপর পেছন ফেরে। ওই সেই ছোঁড়াকেই মনে মনে আমি উচ্ছুগ্গু করেছি মায়ের কাছে।'

'বেশ করেছেন এজ্ঞে'— ছেলেটাকে চোখে দেখেনি কাঙালিচরণ, কিন্তু তবু কেমন যেন মায়া হচ্ছিল তার জন্যে। মুখে সে ভাবটা একেবারেই না-ফুটিয়ে বলল, 'আমাকে তাহলে ছেড়ে দ্যান এবার।'

'ফের মুখের ওপর কথা বলে।' ধমকে উঠল জটা তান্ত্রিক, 'তোকে যে একটা কাজ করতে হবে বললাম, সেটা ভুলে বসে আছিস !'

'কী কাজ এজ্ঞে!'

'নদীর এপারে আমাকে দেখেই ছোঁড়া পালায়। ভয় পায় নিশ্চয়ই, চেহারাটা তো আমার খুব ভদ্রসভ্য নয়, কী বলিস!' গাঁক গাঁক করে হেসে উঠল জটা তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'ওই ছোঁড়াটাকেই এখেনে ডেকে আনতে হবে তোকে।'

'আমি!'

'কেন, তুমি কোন হদ্দমুদ্দ খাজান খাঁ। এটুকু করতে পারবি না আমার জন্যে!' মন থেকে সায় পাচ্ছিল না, তাং কাঙালি বলল, 'ওকে এনে দিলেই ছেড়ে দেবেন আমাকে? সত্যি বলছেন!'

'তবে কি তোর সঙ্গে মশকরা করছিরে হ্যাংলা মুখো। চিৎকার করে উঠল জটা তান্ত্রিক, 'আমার যে কথা সেই কাজ। ছোঁড়াটাকে তুই আনতে পারবি কিনা তাই বল।'

'একশোবার পারব—বললাম তো এজ্ঞে!' কাঙালিচরণ বললে, 'কিন্তু আপনি তো বললেন সন্ধেবেলায় আসে ছোঁড়াটা; এখন তো রাত্তির!'

'ধ্যাৎ হাঁদা গঙ্গারাম! ঝড়জল বলে ওরকম মনে হয়েছে। আসলে এবারই সন্ধে লাগছে।'

'নদীর ধারে গেলে দেখতে পাব ওকে?'

'পাবি।'

'তবে যাচ্ছি।' কাঙালিচরণ এগুতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে হাঁক শুনে থামল। জটা তান্ত্রিক বলছিল, 'যদি পালাবার চেষ্টা করিস তো মরবি।'

'এজ্ঞে ছি, পালাব কেন?'

'কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। একটা যন্ত্রর তো তুই দেখেছিস, আরো অনেক যন্তর আমার এখেনে মজুত আছে—এখেন থেকে কল টিপব, নদীর ওপারে মুখে রক্ত তুলে মরবি। আমার নাম জটা তান্ত্রিক, মনে রাখিস কথাটা।'

'মনে থাকবে এজ্ঞে, একটুও ভুল হবেনি।'

এই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের আড়ালে...

'অবশ্য আমি তোর পেছনেই থাকব, ভুল হলে, মনে করিয়ে দিতে হবে তো'—বিকট হাসি ছাড়ল একটা জটা, বললে, 'চল।'

ভুল বলেনি জটা তান্ত্রিক। সন্ধে হয়ে এসেছে। আবছা আলো। ওপারে বড়ো বড়ো গাছ কেমন আঁধার করে রেখেছে জায়গাটা। তা সত্ত্বেও কাঙালি দেখতে পাচ্ছে লাঠির ডগায় বড়ো একটা পুটলি বেঁধে তারই বয়সি একটা ছেলে নদীর ধারে আসছে জল খেতে।

'সোজা, চলে যা সাঁতার দিয়ে, এই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের আড়ালে'—জটা বললে 'এপারে অনেক সোনাদানা আছে বলবি, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিস বলবি—বলবি তুই একা বয়ে নিয়ে যেতে পারছিস না, সেইজন্যে ওকে ডাকতে এসেছিস। মনে থাকবে!'

'খুব থাকবে এজ্ঞে। খুব করে লোভ দেখাতে হবে ওকে।'

'অ্যাই ! বোকা হলে কী হয়, বুদ্ধি আছে তোর? যা, চলে যা।'

বলার যেটুকু অপেক্ষা, নদীর ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ভেসে বেরিয়ে গেল কাঙালিচরণ। ওপারে নেমে চেয়ে দেখল, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে জটা তান্ত্রিক, বিড় বিড় করে কী সব বলছে যেন। এবার হাসার পালা কাঙালিচরণের সে খিক খিক খ্যাঁক খ্যাঁক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে বললে, 'ভুল করেছো গো জটা তান্ত্রিক, আমি তো কী বলে ওই ছোঁড়ার মতো মানুষ নই গো, এসব বিদ্যে আমার জানা আছে। তোমার ওই যন্তর এখন আমার কিছু করতে পারবে না গো। শেওড়াতলির আড্ডা থেকে গুল্লুমামার কাছে যাচ্ছিলাম বেলতলার শ্মশানে। মাঝপথে বেবভুল করে ধরা পড়েছিলাম তোমার হাতে। তবে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে খুব গো জটে ঠাকুর, অস্বীকার করব না। এই আমি পগার পার হলাম, আর কোনোদিন আসবনি এখেনে।'

ফুস করে হাওয়ায় উড়ে সত্যিই কাঙালিচরণ পগার পার। তবে আকাশ পথে নিজেকে মেলে দিয়ে সত্যিই ভেতর থেকে একটা হাসির দমক ঠেলে আসছিল ওর। মানুষ মরে ভূতের ভয়ে, আর ভূতই পালাচ্ছে মানুষকে দেখে। কথাটা শুনলে গুল্লুমামা যা হাসবে, এখনই দেখতে পাচ্ছে যেন চোখে!

শেষ বংশধর

শ্যামল দত্তচৌধুরী

প্রথম রাতেই টের পেয়েছিল অনির্বাণ। টিমটিমে আলোয় সে তার সারাদিনের অভিজ্ঞতা মাকে লিখতে বসেছিল। অবনীকাকা নাতনির হোমটাস্কের খাতা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ওকে দিয়েছেন। এক-একটা পাতায় লিখছে আর পাশে সরিয়ে রাখছে অনির্বাণ। আজ সকালে এখানে পৌঁছোবার পর থেকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

বেশ গুমোট আবহাওয়া। জানলাগুলো খোলা থাকলেও বাইরের গাছপালাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া নেই। অথচ এই অবস্থায় হঠাৎ অনির্বাণের কাগজগুলো ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াতে লাগল। ওর মাথার উপরে, এদিকে-ওদিকে কাগজ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না পদার্থবিদ্যার ছাত্র অনির্বাণ।

গ্রামে অনির্বাণদের পিতৃপুরুষের ভিটে প্রায় ধবংস হতে বসেছে। সে মার কাছে শুনেছে যে, একসময় নাকি বিশ মাইলের মধ্যে ওদের মতো পাকাবাড়ি আর একটাও ছিল না।

নরোত্তম রায় ছিলেন এই অঞ্চলে সেকালের এক ডাকসাইটে প্রতাপশালী জমিদার। বারান্দার শেষপ্রান্তে নরোত্তম রায়ের এক অয়েল পেন্টিং আজ দেখেছে অরিন্দম। ধূলিমলিন, মাকড়সার জালে প্রায় অদৃশ্য। তবু বোঝা যায় তামাটে চওড়া মুখ, ঘাড়েগর্দানে দশাসই চেহারা কুস্তিগীরের মতো। ক্রোধী চোখদুটো ছবিতেও যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। পূর্বপুরুষের জমিজিরেত চাষবাস ছিল, কিন্তু নিন্দুকেরা বলত তাদের প্রকৃত উপার্জনের উপায় ছিল ডাকাতি।

সাধারণত তারা নিজেরা ডাকাতি করতে বেরোতেন না। একদল বিশ্বস্ত লেঠেলকে পাঠানো হত, যারা জান দেবে তবু মুখ ফুটে কর্তার বিরুদ্ধে রা কাড়বে না। লেঠেলরা ছিপ নৌকায় চড়ে কিংবা পায়ে রণ-পা বেঁধে দূরদূরান্তরের গ্রামে গিয়ে নৃশংস ডাকাতি করে আসত।

শোনা যায়, নরোত্তম রায় নাকি কখনও-সখনও স্বয়ং যেতেন ডাকাতি করতে এবং কোনো কোনো সময়ে তাঁর হিংস্র আচরণ লেঠেল ডাকাতদের বুকেও ভয় ধরিয়ে দিত। লোকে বলে কোনো এক বিধবা নারীর চার ছেলে-মেয়েকে হত্যা করার অভিশাপে নাকি নরোত্তম রায় নিজেও নির্বংশ হয়ে যাবেন।

নরোত্তম রায়ের ছিল সাত ছেলে, তারা সাবালক হয়ে ওঠার আগে একে একে মারা গিয়েছিল। তিনি কেবল ছোটো ছেলে সুরেশ্বরের বিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুর আগে সুরেশ্বর দুটি সন্তানের জনক হয়েছিলেন। ছেলের নাম মনোহর, মেয়ের নাম ভাগীরথী। বালক বয়স থেকেই মনোহর শান্তশিষ্ট স্বভাবের। লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিল তাঁর। প্রজাদের দুঃখদুর্দশার সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু ভাগীরথী একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। সে ছিল দুরন্ত, ডানপিটে, নিষ্ঠুর। ওই কিশোরী বয়সেই তার স্বভাবের হিংস্রতা প্রজাদের সন্ত্রস্ত করে তুলত। একবার একটা বিড়ালছানা রাত্রিবেলা কেঁদে কেঁদে বাড়ির কাউকে ঘুমোতে দেয়নি। কনকনে শীতের রাত। সকালের আলো ফুটতেই ভাগীরথী খিড়কির বাইরে ছাইয়ের গাদা থেকে বিড়ালছানাটাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল পুকুরের মাঝখানে। বাড়ির দাসী-চাকররা ওকে যমের মতো ডরাত।

ঠাকুরদা নরোত্তমের স্নেহ বাপ-মা মরা নাতনি ভাগীরথীর উপর গভীরভাবে নেমে এসেছিল। নিরীহ মনোহরকে তিনি খুব একটা আমল দিতেন না। হয়তো ভাগীরথীর স্বভাবে নরোত্তম নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বৃদ্ধ নরোত্তম মৃত্যুর কিছুকাল আগে আইনের মাধ্যমে প্রিয় নাতনি ভাগীরথীকে ত্যাগ করেছিলেন। বিশেষ আদেশ দিয়ে তাঁর জমিদারির ত্রিসীমানায় ভাগীরথীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, এর কারণ কেউ জানে না।

লোকমুখে শোনা যায়, শ্মশানের ভবানী মন্দিরে তখন ভাগীরথী তন্ত্রসাধনা করত। কে যেন দেখেছিল, ঘোর নিশিরাতে জটাধারিণী এক ভৈরবী একলা হেঁটে হেঁটে প্রান্তর পার হয়ে চলে যাচ্ছে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ নরোত্তম রায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

মনোহর রায়ের পুত্র সুদর্শন এই এলাকায় প্রথম প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রায়বংশের পুরুষ স্বল্পায়ু। সুদর্শন রায়ও বেশিদিন বাঁচেননি। ইনি অনির্বাণের পিতা। দু-বছরের ছেলে অনির্বাণকে নিয়ে তার মা চলে আসেন মামাদের কাছে মথুরাপুরে। আদি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অনির্বাণ মেধাবী ছাত্র। আগাগোড়া পরীক্ষায় ভালো ফল দেখিয়ে সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স করেছিল। এখন রিসার্চ করছে।

ওদিকে সুদর্শন রায়ের মৃত্যুর পরে দেশের বাড়ি দেখাশোনার অভাবে অবহেলায় ভেঙে পড়ছিল। রায়বাড়ির নায়েব অবনীকাকা চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন অনির্বাণের মায়ের সঙ্গে। অবনীকাকার সনির্বন্ধ অনুরোধে এত বছর পরে মা অনির্বাণকে পাঠিয়েছেন ওই বসতবাড়ির আর জমিজমার একটা আইনসম্মত বিলিব্যবস্থা করার জন্য।

সকালে নদীর ঘাটে নামতেই কাদায় পা ডুবে গিয়েছিল অনির্বাণের। ধানখেতের আলে-আলে আধ ঘন্টাটাক হেঁটে শেষে পৌঁছেছে পিতৃপুরুষের গ্রামে। অবনীকাকাকে আগে থেকেই জানানো ছিল। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, একজন মুনিষ গিয়েছিল অনির্বাণকে পথ চিনিয়ে আনতে। ওদের বাড়ির দরজা খুলিয়ে, একটা ঘর বাসের উপযোগী করে রাখা ছিল। এল মুড়ি আর গুড়। দুপুরের খাওয়া হবে অবনীকাকার বাসায়।

অনির্বাণের মার প্রশংসায় বৃদ্ধ পঞ্চমুখ। বললেন, তিনি রায়পরিবারের সঙ্গে ষাট বছর জড়িয়ে আছেন কিন্তু কখনও এমন লক্ষ্মীমন্ত ও বুদ্ধিমতী বউ দেখেননি। শুনে অনির্বাণের খুব ভালো লাগল।

বেলার দিকে বৈষয়িক আলোচনা হল অবনীকাকার সঙ্গে। তারপর রোদ একটু পড়লে ঘুরে দেখা। সন্ধে হওয়ার আগেই কয়েকজন মাতব্বর মতন লোক এল শলাপরামর্শ দিতে। পরদিন পঞ্চায়েত অফিসে যাবে অনির্বাণ। অন্ধকার নামার আগে তারা চলে গেল তড়বড় করে।

একটা বিদ্যুতের পোল থেকে কারেন্ট টেনেছে ক্লাবঘরে। অনির্বাণ আসছে খবর পেয়ে অবনীকাকা ছেলেদের ধরেকরে রায়বাড়ির একটা ঘরে টিমটিমে বালবের আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অবনীকাকার লোক বারান্দায় একটা হারিকেনও জ্বালিয়ে গেছে। বাইরে যেতে দরকার হবে অনির্বাণের।

আজ সারাদিনে যত তথ্য জোগাড় করেছে অণির্বাণ, তার বিশদ বিবরণ লিখে সে মার কাছে পাঠাবে তাঁর মতামতের জন্য। অবনীকাকার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা আছে। তিনি কাল সকালেই একটা লোককে পাঠাবেন ওই চিঠি সমেত মথুরাপুরে।

কিন্তু লিখতে বসে এই বিপত্তি। কাগজগুলো হাওয়ায় ভেসে ভেসে উড়ছে, যদিও বিন্দুমাত্র হাওয়া চলাচল করছে না ঘরটায়।

একটু থমকে গেল অনির্বাণ। এমন অদ্ভুত ঘটনার মানে কী? ভূতুড়ে কাণ্ড! ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?

হঠাৎ কে যেন সজোরে ধাক্কা মারল তাকে। তার হাত ধরে টানছে। চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরল অনির্বাণ, কিছুতেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠবে না। কিন্তু কোনোও প্রবল অদৃশ্য শক্তি ওকে টেনেহিঁচড়ে তুলে দিল। তারপর পিঠে ধাক্কা মারতে মারতে বের করে দিল ঘর থেকে। হতভম্ব অনির্বাণ অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। তার চোখের সামনে ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। অনির্বাণ ঠেলে দেখল ভিতর থেকে বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তার গা শিরশির করে উঠল।

বারান্দার কোণ থেকে হারিকেনটা তুলে নিভু নিভু শিখা বাড়িয়ে দিল অনির্বাণ। তারপর ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বসল এই ঘটনার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কী হতে পারে।

সে আজ গ্রামে ঘুরে বুঝতে পেরেছে অনেকেই তার আবির্ভাব ভালো চোখে দেখছে না। বিষয়সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা কোনো কালেই সরল-সোজা ছিল না। এখনও নেই। তবে কি কোনো কায়েমি স্বার্থ কাজ করছে? অনির্বাণকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে? অবনীকাকা পাকাপোক্ত বিষয়ী মানুষ। তাঁর স্বার্থে কী আঘাত লাগল?

পরদিন দেখা হলে অবনীকাকাই কথাটা তুললেন—রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

অনির্বাণ তাঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, বলল,—আপনি কি ভাবলেন একলা পোড়োবাড়িতে আমি ভূতের ভয় পাব? ও বাড়িতে ভূতটুত আছে নাকি!

অবনীকাকা চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন,—তুমি বড়ো হয়ে প্রথম এখানে আসছ, ভেবেছিলাম আমার ভিটেতেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমরা শহরে লেখাপড়া শেখা ছেলে, আমার বাসায় হয়েতো কষ্ট হত তোমার। তাই শেষে তোমাদের বসতবাটিতেই থাকার বন্দোবস্ত করলাম। রাতের দিকে ওদিকে কেউ সেঁধোয় না তো, তাই এখনও চোর-গুন্ডাদের আস্তানা হয়ে ওঠেনি।

—ব্যাপারটা আমাকেও খুব অবাক করেছে অবনীকাকা। ওরকম একটা বিশাল বাড়ি শূন্য পড়ে আছে অথচ কেউ জবর দখল করেনি। অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা হয়ে ওঠেনি-এর কারণ কী?

—তোমার বাবা সুদর্শন রায় খুব বিদ্বান মানুষ ছিলেন। এলাকার সকল মানুষ তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। কিন্তু প্রয়োজনে শাসন করতে পারার ক্ষমতাও ছিল তাঁর। তোমার ঠাকুরদা মনোহর রায় আবার সেই তুলনায় একেবারে নরম-সরম মাটির মানুষ। তিনি জেলেপাড়ায় এক প্রজার ঘরে পড়ে থাকতেন। যেজন্য তাঁর অপযশ রটেছিল। তাঁর আমলেই প্রথম টের পাওয়া যায়, কোনো অশরীরী দুষ্ট আত্মা রায়বাড়িতে বাসা বেঁধেছে। মনোহরের পিতামহ নরোত্তম রায় তখনও বেঁচে। বুড়ো হয়ে ধুঁকছে রোগব্যাধিতে। দু-পা পঙ্গু, শরীরে ঘা। বিছানা ছেড়ে নড়তে পারে না। একদিন দেখা গেল পশ্চিমে বাঁশঝাড়ের ভিতরে তার লাশ পড়ে আছে। তাকে যেন কেউ টেনেহিঁচড়ে বাড়ির বার করে দিয়েছে।

একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে অবনীকাকা বলতে লাগলেন,—তোমাকে আজ বলি বাবা আমার ধারণা মনোহর রায় বাইরে বাইরে রাত কাটাতেন কিছু একটা ভয়ানক ভয়ে। তোমার বাবার আমলেও একই দৌরাত্ম্য চলেছিল। সেই জন্য সুদর্শন রায় বাড়ির পশ্চিম অংশটায় তালা মেরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে আসেন পুবের দিকটায়। অনেক ওঝাবদ্যি এসেছিল কেউ কিছু সুরাহা করতে পারেনি। তারপর তোমার বাবা মারা গেলেন অপঘাতে, তোমার মা শিশুকোলে চলে গেলেন মথুরাপুরে। রায়বাড়ি বন্ধ হয়েই পড়েছিল। মাঝে অবশ্য বদমাশদের আড্ডা হয়ে উঠেছিল। একরাতে তাদের চারটে লাশ পাওয়া যায় মজাপুকুরের কাদায়। মুখেচোখে নিদারুণ ভয়ের চিহ্ন ছিল তাদের।

অনির্বাণ সেই রাতেও থেকে গেল পিতৃপুরুষের বসতভিটেয়। অবনীকাকার গেঁয়ো গল্প বিশ্বাস হয়নি তার। বাড়িটা ঘিরে কিছু একটা রহস্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা যে বুদ্ধির অগম্য, অনির্বাণের বিজ্ঞানী মন যে কথা মানতে পারছে না। তবু, পরিবেশের জন্যই হয়তো, একটা গা-ছমছমে ভাব মাঝেমাঝেই চেপে ধরছে।

ঘরে টিমটিমে বালব জ্বলছে। তবু হারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে টেবিলের উপর রাখল। মাকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করতে হবে। টেবিলে পাতাগুলো পরপর সাজানো, ছোটো একটা পাথর চাপা। অবনীকাকার মুখে শোনা গল্পটাও লিখবে মাকে। কাল সকালে চিঠিটা খামে ভরে পাঠাবে মথুরাপুরে।

শুতে-শুতে রাত হয়ে গেল। লণ্ঠনের আলো একটু কমিয়ে শুয়ে পড়ল অনির্বাণ। হঠাৎ তার মাথার বালিশটা কেউ সড়াৎ করে টেনে নিল। অনির্বাণ অবাক হয়ে দেখল বালিশ তছনছ হয়ে তুষারপাতের মতন তুলো ঝরছে তার গায়ে-মাথায়।

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল সে। যথাসাধ্য শান্তকণ্ঠে বলল,—তুমি কে? কেন ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ? এটা আমার বাড়ি, আমি রায়বাড়ির বংশধর। এখান থেকে আমাকে তাড়াবার অধিকার কারও নেই।

সাহস করে বলল বটে অনির্বাণ, কিন্তু অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে চলছে। সহসা ওর চোখের সামনে টেবিলের পাথরটা সরে গিয়ে একটা করে মাকে লেখা চিঠির পাতা ভাসতে ভাসতে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ভয়ের সঙ্গে এবার বেদম রাগ হল তার।

অনির্বাণ চিৎকার করে বলে উঠল,—তবে রে ! আয় দেখি তোর কত ক্ষমতা, আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার চেষ্টা? এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বাড়িঘর সাফ করিয়ে আমি এবার নিজে এখানে বাস করব। দেখি তুই আমার কী করতে পারিস!

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কেবল লণ্ঠনের শিখা বেয়ে গেল নিজে থেকে। তারপর টেবিলের উপরে কলমটা চলতে শুরু করল। সাদা কাগজে খসখস শব্দে কিছু লিখছে। অনির্বাণ সাহস সঞ্চয় করে কাছে গিয়ে পড়ল আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে,—আমি ভাগীরথী।

চমকে উঠল অনির্বাণ। ভাগীরথী? তার ঠাকুরদা মনোহর রায়ের সেই ডানপিটে, নিষ্ঠুর বোন? সে নাকি ত্যাজ্য হওয়ার পরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল!

আজই বিকেলে গ্রামের একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে অনির্বাণ শুনেছে, ভাগীরথী গোপনে তন্ত্রসাধনা করত। রায়বাড়ির পশ্চিমদুয়ার পেরিয়ে মজাপুকুরের ধারে বাঁশঝাড় ছাড়িয়ে নদীতীরের শ্মশানে ছিল তাঁর পঞ্চমুণ্ডির আসন। অমাবস্যার রাত্রে সিদ্ধিলাভের আশায় ভবানী মন্দিরে সে শিশু বলি দিত। গাঁয়ের লোকে সন্দেহ করত, কিন্তু নরোত্তম রায়ের ভয়ে ঘটনা থানা-আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারেনি।

ক্রমে নরোত্তম রায়ের কানে গেল কথাটা। তিনি তখন ঘোরতর রোগশয্যায়। খুব রেগে গিয়ে তিনি আদরের নাতনি ভাগীরথীকে উইল বানিয়ে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলেন। মনোহরকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন গোপনে। তারপর ভাগীরথীকে কেউ আর চোখে দেখেনি। অবনীকাকা কী আর এসব ঘটনা জানেন না? ইচ্ছে করেই বোধহয় পরিবারের কলঙ্কের কথা অনির্বাণের কাছে চেপে গেছেন।

অমাবস্যার রাত্রে সিদ্ধিলাভের আশায় ভবানী মন্দিরে সে শিশু বলি দিত...

আবার কলমটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে চলতে শুরু করেছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে অনির্বাণ ছুটতে লাগল গ্রামের লোকবসতির দিকে...

...এই বাড়ি আমার ...দাদু ত্যাগ করেছে...কোথায় যাব... দাদা মনোহর আমাকে পশ্চিমের উঠোনে কুপিয়ে মেরে... পুঁতে রেখেছে গোয়ালঘরে... প্রতিশোধ চাই... রক্ত ...রক্ত এ বাড়ি আমার... দাদুর—দাদার... সুদর্শনের রক্তপান করেছি... এবার তোর...

হঠাৎ অনির্বাণ দেখল লণ্ঠনটা তীব্র বেগে তার দিকে ছুটে আসছে। যেন কেউ ছুড়ে মেরেছে জোরে। সে কোনোমতে মাথা বাঁচিয়ে দৌড়ে ঘরের বাইরে পালায়। শুনতে পেল পিছনে লণ্ঠনটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেছে। মশারি তোশক মুহূর্তে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে অনির্বাণ ছুটতে লাগল গ্রামের লোকবসতির দিকে। ওদিকে ধীরে ধীরে আগুন বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলল। ছুটতে-ছুটতে অনির্বাণ অনুভব করল একটা মিশকালো ঝোড়ো হাওয়ার স্তম্ভ দ্রুত এসে তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা অনির্বাণকে প্রান্তরের উপর দিয়ে সবলে টানতে-টানতে নিয়ে চলল শ্মশানের দিকে।

পরদিন ওকে ভবানী মন্দিরের গর্ভগৃহে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। অনির্বাণ তখন বদ্ধ উন্মাদ।

গাঁ-এর নাম ছমছমপুর

গৌর বৈরাগী

আজ সকালেই তুমুল একচোট ঝগড়া করল আদুরি। ঝগড়া অবশ্য একে বলা যায় না। গালমন্দ, শাপশাপান্ত যা হল সবই অবশ্য এক তরফা। আদুরি বলছে আর ওদিকে ছেলেটা শুয়ে শুয়ে শুনছে। এসব দেখে আজ সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হল তার।

ছমছমপুরের পাটালি দাস ছেলেটা রামকুঁড়ে। বয়েস চব্বিশ পার হতে চলল এদিকে কাজকম্মের কোনো ধান্ধাই করে না। বিধবা মা কতরকম কাজই খুঁজে এনে দিল। হরি মুদির দোকানে ফর্দ ধরে ধরে মাল দেবার কাজ। তো সে-কাজ পোষাল না। কেন? না বড্ড ছোটাছুটি করতে হয়। তখন নিতাই-এর সাইকেল সারাই-এর দোকানের কাজ এনে দিল আদুরি। কিন্তু দু-দিন বাদে সে-কাজও ছেড়ে দিল পাটালি। চাকায় হাওয়া দিতে গেলে বড়ো হ্যাঁচকা দিতে হয়। অত পরিশ্রম সইবে কেন তার। তখন খবরের কাগজ কেটে ঠোঙা তৈরির কাজ বাড়িতেই নিয়ে এল মা। এ কাজে ছোটাছুটি নেই। হ্যাঁচকা দেওয়াও নেই। বসে বসে কাগজ কাটো আর আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে ঠোঙা তৈরি করো, ব্যস।

কিন্তু এ কাজটাও হল না। দেখা গেল, কাটা কাগজ ডাঁই করে ফেলে রেখে পাশে শুয়ে ভোঁস ভঁসিয়ে ঘুমোচ্ছে পাটালি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো ঠোঙা তৈরি করা যায় না, বসতে হবে। আর কে না জানে যারা বেহদ্দ কুঁড়ে তারা সুযোগ পেলে বসতে চায়, বসতে পেলে শুতে চায় আর শুতে পেলে ঘুমোতে চায়। অতএব একাজও বাদ পড়ল। তাই গালমন্দ করে পাড়া মাথায় করল আজ। তারপর দুর ছাই বলে বেরিয়ে পড়ল আদুরি।

কিন্তু যাবে আর কোথায়। যতই হোক সে তো মা। পাটালিকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে না-পারলে সারাজীবন করবেটা কী? এদিকে ছেলেটার খুব বদনাম হয়ে গেছে। যার কাছেই যায় সে বলে, তোমার ছেলে তো একটাই কাজ জানে আদুরি। হয় বসা না-হয় ঘুমোনো। ও দিয়ে আমার তো চলবে না। ওই একই কথা বলল, বাজারওলা লালু। হাটে গুড়ের আড়ৎ শৈলেন খামারুর। মানুষটা ভালো। অপরের দুঃখ মন দিয়ে শোনেন। তিনি শুনেটুনে বললেন। আমার তো সব হিসেবের কাজ আদুরি। এদিকে তো তোমার ছেলে পাঁচ কেলাস অবদি পড়েছে। ও দিয়ে তো আমার কাজ হবে না।

হবে না?

না, আমার কাজ হবে না। তবে অন্য একটা কাজ আছে।

কী কাজ জ্যাঠামশাই?

শৈলেন খামারু হাসলেন। লোকে বলে, যার নেই কোনো কাজ, বসে বসে পালা ভাঁজ।

তার মানে কী জ্যাঠামশাই?

মানে হল, যাত্রাপালা। আমাদের এই ছমছমপুরে যাত্রাপালা এসেছে দেখোনি?

দেখেনি, তবে শুনেছে আদুরি। কী এক নাট্যসমাজ তিন রাত্তির তিনটে পালা করবে এখানে। মাইকে মাইকে বলে বেড়াচ্ছে। ওদিকে তো মন দিলে চলে না তার। কিন্তু সেখানে কী করবে আমার পাটালি?

অ্যাকটো করবে, অ্যাকটো। হো হো করে আবার হাসলেন শৈলেন খামারু। বলা যায় না কাজটা হয়ত তোমার পাটালির মনে ধরে গেল।

আদুরিরও মনে ধরল কথাটা। কী থেকে যে কী হয় কেউ জানে না। তাই সে হন হন করে হাঁটতে লাগল। ওই তো পালপাড়ার মাঠ। চট দিয়ে ঘিরে বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। মাইকে কে যেন তারস্বরে চিৎকার

করছে।

''আসুন... আসুন... টিকিট কাটুন। আজকের পালা 'ভূত বাংলো'। টিকিট পাঁচ টাকা আর দশ টাকা।''

মাইক শুনেই এগিয়ে গেল আদুরি। টেবিল পেতে দুটো ছোকরা বসে আছে। সে যেতেই একজন ছোকরা মাইক নিভিয়ে বলল, ক-টা দোব?

আদুরি ভয়ে ভয়ে বলল, কী জিনিস দেবে বাবা?

টিকিট গো টিকিট, আজ ভালো পালা আছে।

কিন্তু আমি তো টিকিট কিনতে আসিনি?

একটা ছোকরা ধমকে উঠল। তাহলে কী করতে এসেছ?

পালায় যদি কোনো অ্যাকটো পাওয়া যায় তাই জানতে এয়েচি।

কথা শুনে রাগের বদলে হো হো করে হাসল দুজন ছোকরা। অ্যাকটো করার খোঁজ নিতে এসেছ। এদিকে পালাই তো বন্ধ হয়ে যাবে শুনছি।

বন্ধ হবে?

হ্যাঁ। কাল কত বিক্রি হয়েছে জানো? মোটে সাতশো আশি টাকা।

যাও যাও সরো এখান থেকে।

কথাশুনে সরে আসে আদুরি। ভারী দুঃখ হয় তার। নাঃ এভাবে বেঁচে থাকার আর মানে হয় না।

২

বসে বসে দুঃখের কথা ভাবছিলেন ভবতারিণী নাট্যসমাজের ম্যানেজার নিবারণ হাজরা। নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে এই নির্জন জায়গাটা চোখে পড়ল তার। কাছেপিঠে একটাও লোক নেই। চারপাশে ক-টা বাঁশঝাড়। মাঝখানে বেশ বড়ো একটা পুকুর। এতবড়ো পুকুর, টলটলে জল অথচ কোনো ঘাট নেই। তার মানে এটা কেউ ব্যবহার করে না। ভালোই হয়েছে, এমন নির্জন জায়গাতেই তো নিজের মনে একা একা দুঃখের কথা ভাবা যায়। দুঃখ বলে দুঃখ, কী দিনকালই এল। লোকে আর যাত্রামুখো হচ্ছে না। সবাই ঘরে বসে টিভি দেখছে। এখন গ্রামগঞ্জেও ঘরে ঘরে টিভি। ঘরের বাইরে এসে পালা দেখতে বয়ে গেছে তাদের। এই ছমছমপুরে এসে ভেবেছিলেন কিছু দর্শক পাওয়া যাবে। দু-চার টাকা ঘরে আসবে। কিন্তু কোথায় কী। তিন নাইটে তিনটে পালা। ফার্স্ট নাইট—গণেশ কেন বেকার? সেকেন্ড নাইট—ভূত বাংলো আর শেষে মরণ কামড়।

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলা হয়েছে ছমছমপুর। হাটতলা, মনসাতলা, স্কুলপাড়া, পিরের মাজার। তার ওপর দু-দিন ধরে ভ্যানে মাইক লাগিয়ে এনতার প্রচার হয়েছে। অথচ লাভ কী হল? কালরাতে 'গণেশ কেন বেকার?' পালায় যা বিক্রি তাতে খাইখরচাটাও উঠবে না। নাঃ এভাবে চলে না। ভবতারিণী নাট্যসমাজকে উঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন যখন ভাবছেন তখন পুকুরের আঘাটা বেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একজন। বিধবা মানুষ। পরনে একটা নোংরা শাড়ি। মাথার চুলে জট। তার দিকে তাকিয়ে বলল, কী ভাবছেন আজ্ঞে?

মনখারাপে নির্জনে বসে একটু ভাববেন তার উপায় নেই। তাই রাগ হয়ে গেল নিবারণ হাজরার। মেয়েলোকটার আসপদ্দা তো কম নয়, কী ভাবছি তাকে বলতে হবে কেন? তাই কড়াগলায় বললেন, কে হে তুমি?

আজ্ঞে আমি আদুরি, এখেনেই বাস।

তা বেশ, তা কী ভাবছি সে-কথা তোমাকে বলব কেন?

না না আমি সে-কথা বলিনি। আদুরি জিব কাটল। আসলে জায়গাটা তো খারাপ।

খারাপ?

আজ্ঞে আমি আদুরি, এখেনেই বাস...

হ্যাঁ খারাপ। এই যে পুকুরটা এটার নাম বউডোবা পুকুর। মাঝে মাঝেই বউ-ঝি এখানে ডুবে মরে। ব্যাটাছেলেও ডোবেনি তা নয়। আসলে পানো বলে পুকুরটা ডাকে তাই এর ধারেকাছে কেউ আসে না।

কথা শুনে বেশ মজা পেলেন নিবারণ হাজরা। গ্রামগঞ্জে এরকম কত যে ভূত ছড়ানো আছে। তার অবশ্য কোনো ভূতের ভয় নেই। তাই অল্প হাসলেন। বললেন, তাহলে তুমি এসেছ কী করতে?

আজ্ঞে আমিও ডুবতে এয়েছিনু। কিন্তু পারলুম না।

কেন পারলে না?

ওই ভূতটার কথা ভেবে। আদুরি খুব দুঃখের গলায় বলল, বাড়িতে একটা জ্যান্ত ভূত রেখে কী করে জলে ডুবি বলুন?

'জ্যান্ত ভূত' কথাটা বেশ মনে ধরে গেল নিবারণ হাজরার। ব্যবসায়ি মানুষের চোখ-কান সবসময় খোলা রাখতে হয়। কখন কী কাজে লাগে কে জানে। এই যেমন এখন 'জ্যান্ত ভূত' কথাটা মনে ধরে গেল। বললেন, বাড়িতে কী করে তোমার ভূত?

শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোয়। টানা দু-দিন না-খেয়েও শুধু ঘুমোবে। সে আর বলবেননি আজ্ঞে। আপনি বলুন, এরপর ওকে কেউ কাজ দেবে?

যদি দেয়, নিবারণ হাজরা মিটি মিটি হাসলেন। আমি যদি ওকে কাজ দিই?

আপনি দেবেন? এত অবাক জীবনে হয়নি আদুরি। সে বলল, কী কাজ দেবেন?

নিবারণ হাজরা বললেন, ঘুমোবার কাজ।

৩

ভবতারিণী নাট্যসমাজের ম্যানেজার খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরলেন সুযোগটা। এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। অনেক আশা নিয়ে 'ভূত বাংলো' পালাটা লিখেছিলেন। গল্পে রহস্য আছে। রোমাঞ্চ আছে। মোটামুটি অভিনয়ও ঠিক ঠিক হচ্ছে। কিন্তু 'ভূত বাংলো'-তে একটা ভূতও আমদানি করা যায়নি। আর ভূত ছাড়া ভয়ই বা লোকে পাবে কেন।

নাটকটা শুরু হচ্ছে বনের ভেতর একটা পোড়োবাড়িতে। এক ঝড়ের রাতে হিরো-হিরোইন সেখানে আশ্রয় নেবে। প্রথম দৃশ্যে বাঁশের ফ্রেমের ওপর থার্মোকলের ভাঙা পাঁচিল দেখানো হয়েছে। পাশে ভাঙা লোহার গেট। হিরোইনের তেষ্টা পেয়েছে খুব। জলের খোঁজে দুজনেই ভেতরে ঢুকবে তখন।

তখন একটানা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। টেপ করে রাখা শেয়ালের হুক্কাহুয়া শোনা যাচ্ছে আর তার সঙ্গে নিরাপদ দলুই-এর ভয় ধরানো মিউজিক। কিন্তু এতসব করেও তেমন ভয় পাওয়ানো যায় না দর্শকদের। মানুষ আজকাল ভয় পেতেও ভুলে গেছে। একমাত্র যদি তেমন এক জ্যান্ত ভূত দেখানো যেত।

তাই আদুরির কথায় সোজা ওর বাড়ি চলে গেলেন নিবারণ হাজরা। আদুরিই ডাকল, পাটালি পাটালি বলে। ছেলে সামনে এসে দাঁড়াতে বলল, এই আমার ভূত আজ্ঞে।

নিবারণ হাজরা দেখছিলেন, আহা, খাসা চেহারা ছেলেটার। যেমন যেমন চেয়েছিলেন এ যেন তার চেয়ে বেশি পাওয়া। যেমন গায়ের রং তেমনি রোগা রিংঠিঙে। গায়ের রং যা তাতে আবলুস কাঠ হার মানে। বুকের খাঁচায় ফুটে ওঠা হাড় ক-খানা গুনে ফেলা যায়। হবে, হবে। বেশ খুশির গলায় বললেন। আমাদের যাত্রাপালায় একটা ভূত দরকার। তোমাকে যদি ভূতের পার্টটা দিই পারবে তো হে?

ভাবনার জন্যে যেন কিছু সময় নিল পাটালি। তারপর সব বুঝেশুনে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি কিন্তু বেশি নাচন-কোদন পারব না।

কথা শুনে হো হো করে হেসেছিলেন নিবারণ হাজরা। তোমাকে কিছু করতে হবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে আমাদের। এরপর আর বেশি কথা বাড়াতে চাননি তিনি। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে আদুরির হাতে দিয়ে বলেছিলেন। পার্ট ভালো হলে আরও পাবে। এখন আমি চললুম।

শুধু একা নন, সঙ্গে পাটালিকেও নিলেন তিনি। ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে হবে। আজ রাতে 'ভূত বাংলো' পালা।

ডিরেক্টর নবনী অধিকারী তখন গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সকালে জলখাবার হয়েছিল মুড়ি বেগুনি। খুবই মুখরোচক খাবার। অথচ মুখেই রুচছে না। বেলা বারোটা বাজতে চলল। ওদিকে খবর এল দুশো টিকিটও বিক্রি হয়নি।

নিবারণ হাজরা বললেন, এক কাজ করলে হয় না অধিকারী মশাই?

কী কাজ?

ফার্স্ট সিনেই যদি একটা ভূত এনে ফেলা যায়?

ফার্স্ট সিনে?

হ্যাঁ। হিরো-হিরোইন স্টেজে অ্যাপিয়ার করার আগেই যদি ভূত বাংলোর পাঁচিল, মানে বাঁশের মাচায় যদি একটা ভূতকে শুইয়ে রাখা যায়।

তা যাবে না কেন, ডিরেক্টর ফস করে বড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। লোকে আজকাল ভয় পেতে ভুলে গেছে।

সত্যি ভূত হলেও?

সত্যি ভূত...?

তখন নিবারণ হাজরা পাটালি দাসকে দেখালেন। হাড়-পাঁজরা বার হওয়া কালো-কুলো পাটালি এবার বড়োসড়ো একখানা হাসি হেসে উঠল। কালো মুখের ভেতর অমন ঝকঝকে সাদা একসারি দাঁত। দিনের বেলাতেই যেন চমকে গেল নবনী অধিকারী। তারপরেই ছেলেটাকে নিয়ে কাজে নামতে হল। নতুন ছেলে। শেখাতে-পড়াতে টাইম লাগল।

টাইম অবশ্য বেশি লাগার কথা নয়। লাগলও না। শুধু তো শুয়ে থাকতে হবে। মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করতে হবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সড়গড় হয়ে গেল পাটালি।

নিবারণ হাজরা বললেন, কী মনে হচ্ছে পাটালি?

পাটালি হেসে বলল, আজ্ঞে এতো খুব সহজ অ্যাকটো দেকচি।

৪

আটটায় পালা শুরু হলে সন্ধে ছ-টা থেকে তোড়জোর শুরু হয়। ওদিকে স্টেজ সাজানো আছে। মেকআপ আছে। মেকআপ ম্যান শম্ভু পাল তার বাক্স-প্যাঁটরা সাজিয়ে বসেছে। তখন নবমি অধিকারী বলল, অ শম্ভু, এই হল পাটালি। এরই ভূতের মেকআপ হবে।

শম্ভু অবাকময় তাকিয়েছিল। এমন লোক বোধহয় সে জীবনে দেখেনি। বলল, এ তো মেকআপ নিয়েই এসেছে অধিকারীবাবু।

নবনী অধিকারী হাসলেন। ঠিক লোককেই বাছা হয়েছে তাহলে, তুমি শুধু টাচটা দিয়ে দাও।

শম্ভু পাল তুলিতে অ্যালুমিনিয়াম পেন্ট দিয়ে বুকের ক-খানা হাড়ের ওপর একবার করে বুলিয়ে দিল। চোখের চারপাশেও দুটো গোল এঁকে দিল। পাটালি ধাঁ করে বদলে গেল ভূতে।

ডিরেক্টর এগিয়ে এল। বলল, পাটালি তোমার ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স। এখন একধারে গিয়ে বসো। থার্ড বেল পড়ে গেলেই স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর যেমন যেমন বলেছি, চুপি চুপি গিয়ে বাঁশের মাচায় শুয়ে পড়বে। ব্যাস, তোমার পার্ট শেষ। মনে আছে?

আজ্ঞে সব মনে আছে। বড়ো একটা ঘাড় নাড়ল পাটালি। এখন আমি বসছি।

পালা শুরুর মুখটায় খুব হুটোপাটি হয়। অন্য কোনো দিকে তাকাবার সময় হয় না। আজ কিন্তু নিবারণ হাজরার অন্যদিকে মন নেই। খবর পাচ্ছেন, টিকিট বিক্রি ভালো নয়। মেরে কেটে হাজার দেড়েক টাকা। আশা ছিল অন্যরকম কিছু হবে। সকালেই মাইক নামিয়ে প্রচার করিয়েছেন। 'ভূত বাংলো'-য় আজ জ্যান্ত ভূত আনা হচ্ছে। যাত্রাজগতে এই প্রথম। জ্যান্ত ভূত দেখার এমন সুযোগ আর হাতছাড়া করবেন না।

নাঃ, এত করেও ঠিক জমল না। রাত প্রায় আটটা বাজতে চলল। ফার্স্ট বেল পড়ব পড়ব। নিবারণ হাজরা দেখলেন দর্শকাসনের চার আনা ভর্তি হয়েছে মোটে। ছেলে কোলে কিছু বউ-ঝি এসেছে। কিছু ছোকরা গুলতানি করছে। আর বাবা-কাকারা যাদের অনেক রাত অবদি এমনিতে ঘুম হয় না তারা এসেছে রাত কাটাতে।

এমন চিন্তার ভেতরেই ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। আজ খুব ঘর-বার করছেন। ছেলেটা পারবে তো? না ডুবিয়ে দেবে? বড়ো একটা ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল। ঝমঝম করে কনসার্ট বাজছে। একবার তাড়াতাড়ি

টিকিট কাউন্টার থেকে ঘুরে এলেন নিবারণ হাজরা। কাউন্টারের সামনেটা শূন্য খাঁ খাঁ। নাঃ, প্রচারেও কোনো কাজ হয়নি। লোকের এতেও আর বিশ্বাস নেই। ফিরে আসতে আসতেই থার্ড বেলও পড়ে গেল।

স্টেজ অন্ধকার। কনসার্ট থেমে গেছে। টেপে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। এরপরেই শিয়ালের ডাক শোনা যাবে। পরিবেশ তৈরি। অন্ধকারে নিবারণ হাজরা ডিরেক্টর নবনী অধিকারীর গলা পেলেন। চাপা গলায় ডিরেক্টর বলছে, ছেলেটা গেল কোথায়?

কে একজন বলল, কোন ছেলেটা?

ডিরেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, ভূত। ভূত কোথায়?

ওই তো স্টেজে উঠছে সে।

অন্ধকারেও দেখা গেল। স্টেজে উঠে পাটালি দাস বাঁশের মাচায় গিয়ে শুয়ে পড়ছে।

চাপা গলায় ডিরেক্টর বলল, ডিমার।

সঙ্গে সঙ্গে আবছা হলুদ আলোটা জ্বলে উঠল। ফোকাসটা ভাঙা ভাঙা পাঁচিলের ওপর। ওই তো পাটালি শুয়ে আছে। আশ্চর্য পাটালি না ভূত? কে বলবে ও ভূত নয়। ওরকম মানুষের চেহারা হয় নাকি। বলে না-দিলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। মেকআপ ম্যান শম্ভু পালের হাতযশ আছে বলতে হবে।

চারপাশ থমথম করছে অন্ধকারে। দর্শকদের মুখে একটাও কথা নেই। একটা কী হয় কী হয় ভাব। এর মধ্যে হিরো-হিরোইন স্টেজে এসে গেছে। তাদের চোখে-মুখে ভয় আর আতঙ্ক। যদিও ভূতের দিকে তাদের চোখ পড়ার কথা নয়। বনের মধ্যে এক ভাঙা ভূত বাংলোই ভয় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। ভয়ের গলায় এবার ডায়ালগ শুরু করবে হিরোইন।

কিন্তু তাদের কিছু বলার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। পাটালি দাস শোয়া থেকে আধখানা শরীর তুলল। এরকম তো হওয়ার নয়। কিন্তু যা নয় তাই হল এখন। পুরো উঠে বসল ছেলেটা। শুধু বসাই নয়, মুখ হাঁ করে ধবধবে সাদা দাঁত দিয়ে ভয়ংকর একটা হাসি হেসে উঠল সে। সেই ভয়ার্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে।

খিল খিল। খিল খিল। খিল খিল।

সাতঘাটের জল খাওয়া নিবারণ হাজরার বুক গেল কেঁপে।

মিউজিক পার্টি সেতারের ওপর ছড় টানতে ভুলে গেল। হিরোইনের শুধু ভয় পাবার কথা। কিন্তু ভয়ের বদলে সে ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল। বউ-ঝিদের কোলে যেসব বাচ্চাদের ঘুম আসব আসব হচ্ছিল তারা চিল্লে কান্না জুড়ে দিল। দর্শকরাও যেন হতবাক। হাসি শেষ করে ভূত শুয়ে পড়তেই ক্ল্যাপ-ক্ল্যাপ-ক্ল্যাপ। হাততালি যেন থামতেই চায় না।

যাত্রাপালায় একটা কথা আছে। শুরুটা যদি ঠিকঠাক উৎরে যায় তাহলে সে পালা জমে যাবেই। নাম ছড়াবে লোকের মুখে মুখে। ভালো বায়না হবে। ম্যানেজার নিবারণ হাজরা ভাবলেন, ওই নতুন ছোকরাকে খাওয়াপরা বাদে দু-হাজার টাকা মাইনে দেবেন।

সেই ভয়ার্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে...

কিন্তু তার আফশোস হল এমন জিনিস হাজার হাজার দর্শকদের দেখাতে পারলেন। তিনি এতদিন যে যাত্রাপালায় আছেন তা তো শুধু টাকা কামাবার জন্যে নয়। যাত্রা শেষ হলে দর্শকদের চোখ-মুখের আনন্দ উচ্ছ্বাসটিও তিনি দেখে আনন্দ পান। আজও তাই তিনি গেটে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তখনই অঘটনটা ঘটল। দর্শকরা বাড়ি ফেরার বদলে তাকে ঘিরে হইচই লাগিয়ে দিল।

কী ব্যাপার?

না 'ভূত বাংলো' পালাটাই আর একবার শো করতে হবে।

নিবারণ হাজরা বললেন, তা কী করে হয়। সব ঠিক হয়ে আছে। পোস্টার পড়ে গেছে। কিছু টিকিটও বিক্রি হয়েছে 'মরণ কামড়'-এর।

রাখুন মশাই আপনার 'মরণ কামড়', ও সব আপনার আর চলবে না। আমরা 'ভূত বাংলো'র জ্যান্ত ভূতই দেখতে চাই আবার।

রাত বারোটায় চারদিক সরগরম। 'ভূত বাংলো' নিয়ে আবদার। এমন অবস্থায় কোনোদিন পড়েননি নিবারণ হাজরা। ভবতারিণী নাট্যসমাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। এই রাতে এত লোকই বা কোথা থেকে। শেষমেস তারা কথা আদায় করে চলে গেল।

৫

পরদিন ছমছমপুর সরগরম। ভূতের এখনও এত ডিমান্ড। ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করা পাটালি দাসের কথাই হচ্ছিল। ছেলেটার ভেতরে এত এলেম ছিল জানতে পারেনি কেউ।

ম্যানেজার নিবারণ হাজরাও পাকা লোক। দর্শকের উত্তেজনা আগেই টের পেয়েছেন। সেটাকেই উসকে দিতে মাইক দিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গেল পরদিন সকাল থেকেই।

''...দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে ভবতারিণী নাট্যসমাজের 'ভূত বাংলো' পালাটি আজ রাতেও অভিনীত হইবে। দশ বছরের কম কোনো শিশু কিংবা হার্টের অসুখ আছে তেমন মানুষদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে.....''

ব্যাস আগুনে যেন ঘি পড়ল, টিকিট ছিল পাঁচ হাজার। বেলা বারোটার মধ্যে সব শেষ। ডেকরেটরকে বলে এক্সট্রা চট পাতানো হল। তাতে আরও হাজার দুয়েক দর্শক আঁটতে পারে।

সন্ধে ছ-টা বাজতে-না-বাজতেই হই হই কাণ্ড। পাল পাড়ার মাঠের যাত্রা উপলক্ষ্যে একটি তেলভাজার দোকান টিমটিম করে চলছিল। সেটা বেড়ে হল চারটে। বাদাম ভাজার দোকান দুটো। একটা উনুনে কড়ায় তেল চেপেছে। তেলে পাঁপড় ছাড়তে যা দেরি। হু হু করে বিক্রি হচ্ছে পাঁপড়। ওদিকে কোথা থেকে খবর পেয়ে কে জানে দুটো ফুচকাওলাও শো-কেস ভর্তি ফুচকা নিয়ে হাজির। আটটায় শো শুরু হবে। তার আগেই প্রায় সব মাল শেষ।

বলতে বলতে ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। কনসার্টও শুরু হয়ে গেল। ওদিকে গেটের পর্দা সরিয়ে দর্শক ঢুকছে তো ঢুকছেই। স্টেজম্যান একবার স্টেজ দেখে গেল। লাইটম্যান লাইট চেক করছে। পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছেন নিবারণ হাজরা। নয় নয় করে পঁচিশ বছর পালা করছেন তিনি। একসঙ্গে এত দর্শক কোনোদিন দেখা যায়নি। এত ভিড় দেখে মাথাই ঘুরে গেছল তার। কখন সময় গড়িয়ে গেছে, থার্ড বেল পড়তে খেয়াল হল।

স্টেজ অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকা শুরু হয়ে গেছে। টেপে এবার শেয়ালের ডাকও শোনা যাবে। এখন চাপা গলায় নবনী অধিকারী নাম ধরে ডাকতে গেল। কিন্তু কাজের সময় নামটাই মনে আসছে না। তাই বুঝি চাপা গলায় ডিরেক্টর বলল। ভূত কোথায় ভূত?

অন্ধকারে বোধ হয় পাশেই দাঁড়িয়েছিল পাটালি। সে একটু বিরক্ত না-হয়ে বলল, এই তো স্যার। আমি।

যাও যাও, স্টেজে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

সে বাঁশের মাচায় গিয়ে শুতেই ডিরেক্টর লাইটম্যানকে নির্দেশ দিল, ডিমার।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবছা আলোটা জ্বলে উঠল। ওই তো পাটালি দাস শুয়ে আছে। এখন দেখলে কে বলবে ও আসলে একটা মানুষ। এবার স্টেজে অ্যাপিয়ার করছে হিরো আর হিরোইন। সব বলা-কওয়া আছে। বলা না-থাকলেও সবই তো মুখস্থ থাকার কথা। ওই তো ঘাড় তুলে আধশোয়া হচ্ছে পাটালি। ভূত বাংলোর ভূত জেগে উঠছে বুঝি। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। এত যে দর্শক কেউ টুঁ শব্দটি করছে না।

ঠিক তখনই খিল খিল খিল খিল শব্দে ভয়ংকর হাসিটা হেসে উঠল পাটালি। ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে যাবার কথা। ভাগ্যিস জানা ছিল যে ওটা ভূত নয়, মানুষ।

নিবারণ হাজরা দেখলেন হিরোইন কালকের মতো আর চমকে ওঠেনি। শুধু ভয়টাই মুখে লেপটে যাচ্ছে। ওটাই তো দরকার। ওই ভয় নিয়েই পরের ডায়ালগ, 'আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে' কথাটা বলবে।

হিসেব মতো সব ঠিক ঠিক চলছে। ডায়ালগটা বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি তখনই কে যেন অন্ধকার থেকে বলল, তেষ্টা পেয়েছে বুঝি?

কে বলল কথাটা? এটা তো ডায়ালগে ছিল না। আবছা আলোয় দেখা গেল শুয়ে পড়ার বদলে পাটালি দাস উবু হয়ে বসেছে। শুধু বসাই নয়, নতুন ডায়ালগটা তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে বোঝা গেল।

তেষ্টা পেয়েছে বুঝি, বেশ বেশ। বলতে বলতে শূন্যে হাতটা তুলল পাটালি। আর কী আশ্চর্য, অন্ধকারে শূন্য থেকে তার হাতে চলে এল এক গেলাস জল। শুধু আনাই নয়, এবার হাতে ধরা জলের গ্লাসটি বাড়িয়ে দিল হিরোইনের দিকে।

এসব কী হচ্ছে? অভিনয় করার সময় কেউ ডায়ালগ ভুল বললে অন্য সহঅভিনেতা তা ম্যানেজ করে নেয়। কিন্তু এখানে তেমন কিছু করার কথা মনেই আসছে না। ওদিকে পাটালির হাতে ধরা এক গেলাস জল। তেষ্টা মেটাবার জন্যে সেই জল হাত বাড়িয়ে নেবার কথা হিরোইনের। তো সে যখন এগিয়ে আসছে না। তখন তেষ্টার জল তার দিকেই এগিয়ে যাবার কথা। হলও তাই।

নাও ধরো। বলে হাতটা বাড়িয়ে ধরল পাটালি দাস। হাতটা তার বাড়ছে...... আরও বাড়ছে..... লম্বা হচ্ছে... বাড়তে বাড়তে সেটা এবার গিয়ে পৌছাল দশ হাত দূরে হিরোইনের মুখের সামনে।

এর পরেও আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে স্টেজের ওপর পড়ে গেল হিরোইন। তেমনটা দেখেই আবার সেই আগের হাসিটা হাসল পাটালি। আর তারপর কাজ শেষ হয়েছে দেখে সে শুয়ে পড়ল।

এমন কাণ্ডে হাততালি পড়বে সে তো জানা কথা। সে হাততালি যেন থামতেই চায় না। নিবারণ হাজরাও চোখের সামনে এসব দেখলেন। যাত্রাপালা নয়, যেন ম্যাজিক দেখলেন। দর্শকরা না-বুঝুক, তিনি তো বুঝবেন। কিন্তু তিনিও বুঝতে পারছেন না। অন্ধকারে জল ভর্তি একটা গেলাস পাটালি দাসের হাতে এল কী করে? দু-ফুট মাপের একটা হাত বাড়তে বাড়তে দশ ফুট দূরে পৌঁছলেই বা কী করে?

কিন্তু এসব ভাবার তখন সময় কোথা। পালা জমিয়ে দিয়েছে পাটালি। এবার শুধু দেখে যাওয়া। রাত বারোটায় শেষ হল যখন তখন চারপাশে লোকে লোকারণ্য। গ্রামের মুরুব্বি বিশাল দত্ত স্টেজে উঠে ঘোষণা করলেন, হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন পাটালি দাসকে। আহা ভূতের ভূমিকায় যা ফাটাফাটি অভিনয় করেছে ছেলেটা।

তখনই খোঁজ পড়ল পাটালির। খোঁজ খোঁজ। কোথায় গেল সে? সে কোথাও নেই। তার বদলে পাওয়া গেল পাটালির মাকে।

কোথায় তোমার পাটালি আদুরি?

সে তো আমিই জানতে এয়েচি আজ্ঞে। অবাক গলায় নিবারণ হাজরাকে বলল, সেই সে আপনার সঙ্গে বাড়ি ছাড়ল তারপর দু-দিন তো তার পাত্তাই নেই। লোকের মুখে খপর পেলুম ছেলেটা আজও নাকি ভূত সেজে পালায় নেবেছে।

দু-দিন ফেরেনি? ভারি অবাক হলেন নিবারণ হাজরা। ছেলেটা মাঝখানে বেপাত্তা হয়ে গেল কী করে?

এমন যখন ভাবছেন তখনই খোঁজ পাওয়া গেল। ডেকরেটরের লোকেরা চট খুলছিল। তারাই গ্রিনরুম থেকে চিৎকার করল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

নিবারণ হাজরা গ্রিনরুমে ঢুকে দেখলেন, চটের থলে জড়িয়ে-মড়িয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে পাটালি। ওদিকে স্টেজ থেকে মাইকে ডাকা হচ্ছে পাটালি দাস। পাটালি দাস তুমি যেখানেই থাকো চলে এসো।

নিবারণ হাজরা গলা তুলে বললেন, অ্যাই ওঠ, ওঠ।

অমন ডাকে ধড়মর করে উঠে বসল পাটালি। দু-হাতে ভালো করে চোখ ডোলে নিয়ে বলল, এবার বুঝি এসটেজে যেতে হবে?

সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। স্টেজে যাবি মানে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পাটালি লজ্জায় জিব কাটল। গায়ে রং টং মাখানো হতে আমি এখেনে বসলুম। বসার পর মনে হল একটু শুই। শুতেই তো ঘুম এসে বসল চোখে। সেই ঘুম ভাঙল এখন। আমার কি দেরি হয়ে গেল

নাকি?

তার মানে? চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালেন নিবারণ হাজরা। তার মানে দুটো দিন তুই পড়ে পড়ে এখানে ঘুমিয়েছিস?

উত্তর দিল আদুরি। বলল, তাই-ই তাই। একবার ঘুমুলে দু-দিনের আগে ওর ঘুম ভাঙে না।

তাহলে ভূতের ভূমিকায় দু-দিন প্লে করল কে?

সবাই যখন এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে তখন এগিয়ে এল পঞ্চায়েত সদস্য গুলু মাইতি। একগাল হাসি নিয়ে বলল, আপনারা আসল কথাটাই ভুলে গেলেন দেখছি।

আসল কথা?

আসল কথা হল, এ গাঁ-টার নাম ছমছমপুর।

হরিহরাত্মা

শিশির বিশ্বাস

মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ভুটভুটি ধরা গেল না। হরিশঙ্কর যখন ঘাটে পৌঁছোলেন, শেষ ভুটভুটি তখন এগিয়ে গেছে অনেকটাই। রাতে খড়গলির ঘাট থেকে জিরাট যাওয়ার এটাই শেষ ভুটভুটি। অথচ রাত এমন কিছু বেশি নয়। সবে আটটা। তার উপর আজ সপ্তমী পুজো। বছর কয়েক আগেও এই দিনে রাতভর ভুটভুটি চলত। এই বাইচচর থেকে দল বেঁধে মানুষ পুজো দেখতে যেত ওপারের জিরাটে। জিরাট থেকেও অনেকে আসত বাইচচরের পুজোয়। তখন গোটা পাঁচেক পুজো হত এদিকেও। গ্রাম হলেও বাইচচর তখন হেলাফেলার নয়। মস্ত গ্রাম। হাজার কয়েক মানুষের বাস। তিনটে স্কুল। বিডিও, পঞ্চায়েত আর ইরিগেশন অফিস। গমগম করত। নদীর ভাঙনে মাত্র বছর পনেরোর মধ্যে সব শেষ। বাড়ি, জমি হারিয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে গেছে। যারা আছে, তারা দিন গুনছে, যদি কোনও দিন মা গঙ্গা ফের মুখ তুলে তাকান, সেই আশায়। এই খড়গলির ঘাটের কাছেও আগে বড়ো একটা পুজো হত। এই সপ্তমীর রাতে তখন মানুষের ঢল। মেলা, দোকানপাট, নাগরদোলা, চরকিপাক আর নৌকো বাইচ। সন্ধের পরেও আলোর রোশনাই, মানুষের মেলা। আর আজ নিশুতি থমথমে রাত। ঘাটের পাশে ছোটো এক দোকান, মহামায়া স্টোর্স। একসময় বেশ বড়ো ছিল এই দোকান। পাওয়া যেত সবকিছু। এখন টিমটিম করে টিকে আছে। শেষ ভুটভুটি ছেড়ে যেতে ঝাঁপ ফেলার তোড়জোড় করছিল বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে। হরিশঙ্করকে দেখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'জ্যাঠামশাই যে! এই রাতে!'

'হ্যাঁ রে ভাই। জিরাট যাব।'

'কিন্তু ভুটভুটি যে ছেড়ে গেল জ্যাঠামশাই।'

'সে তো দেখছি। দেখি এগিয়ে, কোনো জেলে নৌকো পেয়ে যাব ঠিক।'

ছেলেটার নাম কিশোর। বিলক্ষণ চেনে গ্রামের এই প্রবীণ মানুষটিকে। বলল, 'এই রাতে একা নৌকোর খোঁজে যাবেন! চলেন আমিও সঙ্গে যাই।'

'না রে বাপু, সামনেই পরীক্ষা তোর। বাড়ি যা এবার। সময় নষ্ট করিসনে।' প্রায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন হরিশঙ্কর। বড়ো ভালো ছেলে এই কিশোর। বাড়িতে বাবা অসুস্থ। মা-ছেলে মিলে এই দোকানের উপর নির্ভর করে কোনওমতে টেনে চলেছে সংসার। সেই সাথে পড়াশোনাও। এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। হয়তো সেই সকালের পর পেটেও কিছু পড়েনি ছেলেটার। শহর কলকাতার ছেলেরা ভাবতেও পারবে না এসব।

মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোর আর কথা বাড়ল না। কী ভেবে দোকানের এক কোনা থেকে হাত দুয়েক লম্বা মোটা একটা লাঠি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা রাখেন জ্যাঠামশাই।'

হরিশঙ্কর এবার আর আপত্তি করলেন না। বরং খুশিই হলেন। রিটায়ার করেছেন আজ প্রায় দশ বছর। সত্তরের কোঠায় বয়স হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই। মনের জোরও অসাধারণ। এই শেষের ব্যাপারটা অবশ্য হরিশঙ্করের আজন্ম। খুব গরিব ঘরের মানুষ ছিলেন। এই কিশোর ছেলেটার মতোই মানুষ হয়েছিলেন খুব কষ্টের মধ্যে। তারপর স্ত্রী যখন মারা যায়, দুই ছেলে তখন একেবারেই নাবালক। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন। দেখাশোনার কেউ নেই। বলা যায়, দুই ছেলের কথা ভেবেই ফিরে এসেছিলেন বাইচচরের এই গ্রামে বাড়িতে। কষ্ট হলেও এই বাইচচর থেকেই কলকাতায় অফিস করেছেন। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। তবে তাতে ছেলেদের সমস্যা হয়নি। বাড়িতে কাজের মানুষ ছিল। আর ছিল হরনাথ। বড়ো ভালো

মানুষ ছিলেন ওই হরনাথ। ছেলেবেলার বন্ধু। একই ক্লাসে পড়তেন। কেউ সামান্য টিফিন আনলেও দুজন ভাগ করে খেতেন। সবাই বলত হরিহরাত্মা।

পড়া শেষ করে হরনাথ গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি শুরু করেছিলেন। বিয়ে-থা করেননি। দুই ছেলেকেই তিনি সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। হরনাথ বিমুখ করেননি। হরিশঙ্করের দুই ছেলেই এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশে বড়ো চাকরি করে। বাবাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি করাতে পারেনি। বরং রাতদুপুরে ছেলেরা যখন ফোনে বাবার খবর নিত, সামান্য বিরক্তই হতেন কখনও। আসলে দুই ছেলে বিদেশে চলে যাবার পরেও হরনাথের সাহচর্যে হরিশঙ্কর কখনও একাকিত্ব বোধ করেননি। দুই বন্ধু তখনও সেই আগের মতো। সেই হরিহরাত্মা। কিন্তু হঠাৎই শেষ হয়ে গেল সব। মর্মান্তিক এক ঘটনায় হঠাৎই মারা গেলেন হরনাথ। হরিশঙ্করের দুঃখ এই কারণে আরও যে, সেই সময় তিনি দেশেও ছিলেন না। সেবার বড়ো ছেলে শিবশঙ্কর একরকম জোর করেই বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে। তিন কয়েক ঘুরে আসবেন। বলা হয়েছিল হরনাথকেও। কিন্তু রাজি করানো যায়নি। হরিশঙ্করের এখন মনে হয়, ছেলের কথায় রাজি না-হলে হরনাথ এভাবে হয়তো চলে যেত না।

কথাটা ভুল নয় খুব। ছেলেদের কাছে মাস খানেক ছিলেন হরিশঙ্কর। তার মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক ব্যাপারটা। বন্ধু চলে যাবার পরে সময় কাটাতে হরনাথ সন্ধের দিকে নবসাক্ষরদের এক স্কুলে পড়াতে যেতেন। মাইল পাঁচেক পথ। গঙ্গার পাড় ধরে সাইকেলে যাওয়া-আসা করতেন। সেদিনও গিয়েছিলেন। রাতে ফেরার সময় অন্ধকারে বুঝতে পারেননি, খানিক আগে কখন পাড় ভেঙে সেই পথ হারিয়ে গেছে নদীতে। বেশ জোরেই আসছিলেন। সাইকেল নিয়ে যদি জলে গিয়ে পড়তেন, বেঁচে যেতেন হয়তো। কিন্তু শূন্যে ছিটকে উঠে মাথা ঠুকে গিয়েছিল সামনে ভাঙন-কূলের শক্ত মাটিতে। ঘাড় ভেঙে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

হরনাথের ওই হঠাৎ মৃত্যুর পরে বড্ড একা হয়ে গিয়েছেন হরিশঙ্কর। নইলে আজ এভাবে একা পথে বেরোতে হয় না। কবিগানের টানে এভাবে কতদিন রাতবিরেতে দুজন পাড়ি জমিয়েছে গ্রামের পথে। দিব্যি গল্পে মজে কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেছে সময়। আসলে সেই ছেলেবেলা থেকে দুজনেরই কবিগানের দিকে টান। কোথাও কবিগানের আসর বসেছে। খবর পেলেই ছুটতেন। হরনাথ তো এসব নিয়ে খানিকটা ভাবনাচিন্তাও করতেন। আসরে দুই কবিয়ালের চাপানউতোর সামান্য খুঁত হলেই বন্ধুকে বলতেন, 'এটা ঠিক হল না রে হরি।'

তবে 'তরজা' বা 'খেউড়' নয়, ওদের পছন্দ ছিল 'মালসী' আর 'সখীসংবাদ'। সিনেমা, টিভির জাঁতাকলে পড়ে বাংলার এসব ক্লাসিক জিনিস আজ হারিয়েই গেছে প্রায়। তেমন উঁচু দরের কবিয়ালও আর নেই। তবু এই গ্রামের দিকে এখনও টিমটিম করে টিকে আছে কোনো মতে। তাই কোথাও কবিগান হচ্ছে খবর পেলে দুই বন্ধু যত দূরেই হোক ছুটতেন। অন্যথা হয়নি আজও।

তবে জিরাটের ওদিকে আজ যে কবিগানের আসর, তা আগে থেকে জানতে পারেননি হরিশঙ্কর। আসলে হরনাথের মৃত্যু বড়ো একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে তাঁকে। বাড়ি থেকে আজকাল তেমন আর বের হন না। তবু আজ সপ্তমী বলেই সন্ধের পর পঞ্চায়েত মাঠের দিকে গিয়েছিলেন। ওখানে এখনও ছোটো করে পুজো হয় একটা। খবরটা সেখানেই পেয়েছিলেন। আর তারপর দেরি করেননি এক মুহূর্ত।

খবরটা যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেই নন্দ পাল অবশ্য বারণই করেছিলেন, 'এই রাতে একা আর নাই বা গেলেন হরিশঙ্করদা। দিনকাল ভালো নয়।'

কিন্তু বলা বাহুল্য হরিশঙ্কর তাতে কান দেননি। তবে ঘাটে যে ভুটভুটি পাবেন না, সেটা ভাবেননি। তবে মনস্থির করতেও সময় লাগেনি। যদিও বেশ জানেন, এই রাতে কোনও মাঝি নৌকো পাবেন কিনা, বা পেলেও রাজি করাতে পারবেন কিনা। তবে সেসব নয়। হরিশঙ্করের মাথায় তখন পাক খাচ্ছিল হরনাথের কথা। আসলে কবিগানের সঙ্গে হরনাথের স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে ভীষণ ভাবে। মানুষটার মৃত্যুর পর এই প্রথম চলেছেন কবিগানের আসরে। ভাবতে-ভাবতে কিশোরের দেওয়া সেই লাঠি হাতে নদীর পাড় ধরে

দ্রুত পথ চলছিলেন হরিশঙ্কর। পথের ধারে বেগুন খেত। লকলক করে বেড়ে ওঠা গাছে চমৎকার বেগুন ধরেছে। কিন্তু ভাঙনে খেতের অনেকটাই ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছে নদীতে। নতুন পথ এখন খেতের ভিতর দিয়ে। পায়ে-পায়ে মুড়িয়ে গেছে অনেক গাছ। এদিকে বেশিরভাগ জমিতেই তাই চাষবাস বন্ধ। ফাঁকা জমিতে কাশফুলের ঝাড় দোল খাচ্ছে বাতাসে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাড়ে। ভাঙা ঢেউয়ে চাঁদের ঝিকিমিকি। কিন্তু যতদূর চোখ যায় কোনও নৌকোর দেখা পেলেন না।

কাশফুলের ফাঁকা জমিটা পার হয়ে পোড়ো এক আম-লিচুর বাগান। কতক গাছ ভেঙে নদীগর্ভে চলে গেছে, কতক হেলে পড়ে দিন গুনছে। সেই বাগানের কাছে এসে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, ভাঙা পাড়ের নীচে ছোটো এক নৌকো। শুধু তাই নয়, অদূরে বাগানে এক গাছের তলায় দুটো মানুষ। ওকে দেখেই ঝট করে সেঁধিয়ে গেল ঝোপের অন্ধকারে। তবে ব্যাপারটাকে পাত্তা না-দিয়ে হরিশঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিলেন নৌকোর দিকে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে সেই লোক দুটো বের হয়ে এল। কর্কশ গলায় বলল, 'এই বুড়ঢা ভাগ।'

এই গ্রামেই জন্ম হরিশঙ্করের। অপরিচিত কেউও কোনোদিন এভাবে তার সঙ্গে কথা বলেনি। আজও এই অঞ্চলে যথেষ্টই সম্মান তাঁর। তবু ব্যাপারটা গায় না-মেখে এগিয়ে চললেন। আর তখনই গাছপালার ফাঁকে আবছা আলোয় নজরে পড়ল ব্যাপারটা। বাগানে মালিদের জন্য একসময় ছোটো একটা ঘর ছিল। এখন পরিত্যক্ত। জনা কয়েক মানুষ ধরাধরি করে সেই ঘরের ভিতর থেকে মুখবন্ধ বড়ো একটা ভারী বস্তা নিয়ে চলেছে নৌকার দিকে।

ব্যাপার দেখে হরিশঙ্করের বুঝতে বাকি রইল না, লোকগুলো সাধারণ নয়। এভাবে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি একেবারেই। মুহূর্তে পিছন ফিরতে যাবেন, লোক দুটো ছুটে এল ওর দিকে। একজনের হাতে বড়ো একটা ভোজালি। কেউ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মার ডালো বুড়ঢাকো।'

যৌবনে একবার তাড়া করে ডাকাত ধরেছিলেন হরিশঙ্কর। এত সহজে হার মানার পাত্র নন। ভোজালি হাতে লোকটা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরও । হাতের লাঠিটা ধরাই ছিল। মুহূর্তে সেটা চালিয়ে দিলেন তার মাথা লক্ষ করে। আর্ত চিৎকার করে লোকটা মুহূর্তে মাটিতে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এমনটা হবে ভাবতেও পারেনি তার সঙ্গী। তবে এসব অভ্যাস আছে তার। হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়ে উঠতে তাই সময় লাগল না। মুহূর্তে কোমরে সার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা দেশি পিস্তল। লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে, ভাবেননি হরিশঙ্কর। তবু সামলে উঠে ফের হাতের লাঠি চালালেন। ওদিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটাও গর্জে উঠল সেই মুহূর্তে। এক ঝলকা আগুন আর কান ফাটানো শব্দ।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন হরিশঙ্কর। তবে সেটা বোধ হয় মুহূর্তের জন্য। চোখ মেলেই বুঝলেন, পড়ে আছেন মাটিতে। পাশে একটা মানুষ। বয়স প্রায় তারই কাছাকাছি। তবে অন্ধকারে মুখটা দেখতে পেলেন না। মুহূর্তে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চারপাশে তাকালেন। সেই লোক দুটোকে দেখতে পেলেন না কোথাও। মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ শুধু। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। পাশের লোকটা বলল, 'শাবাশ মশাই! লাঠির দুই ঘায় ষণ্ডা দুটোকে শেষ করে দিলেন! এলেম আছে বটে!'

কেউ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মার ডালো বুডঢাকো...

'কিন্তু, কিন্তু কোথায় তারা? এর মধ্যেই সরে পড়ল' অবাক হয়ে হরিশঙ্কর বললেন।

'কী দরকার মশাই অত খোঁজে। তার চেয়ে চলুন দেখি সরে পড়ি। এরপর থানা-পুলিশ হবে। মেলা ঝামেলা।'

যুক্তি মন্দ নয়। এই বয়সে এসব হ্যাপায় না-থাকাই ভালো। চটপট উঠে পড়লেন তিনি। পাশে লোকটা বলল, 'চলুন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

শরীরটা ফের ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। তবু লোকটার কথা ফেলতে পারলেন না। যা কাণ্ড হল। এরপর আর ঝুঁকি না-নেওয়াই ভালো। বললেন, 'তাই চলুন, কিন্তু আপনাকে যে ঠিক চিনতে পারলাম না। এদিকে নতুন বুঝি?'

কিন্তু লোকটা সেই কথার জবাব না-দিয়ে দ্রুত পথ চলতে লাগল। তাল দিতে না-পেরে একটু পিছিয়ে পড়েছিল হরিশঙ্কর। হঠাৎ এক ব্যাপার ঘটল। নদীর পাড় ধরে সরু পায়ে চলা পথ। সামনের মানুষটা দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। আবছা চাঁদের আলোয় হরিশঙ্করের নজরে পড়ল সামনে মানুষটা যেখান দিয়ে চলেছেন, সেখানে বড়ো একটা ফাটল। সাবধান করতে যাবেন, ফাটলটা আরও হাঁ হয়ে গেল। দুলে উঠল মাটি। বিশাল চাঙড়টা ভেঙে পড়বে এক্ষুনি। ছুটে গিয়ে হরিশঙ্কর যখন তাঁকে টেনে আনলেন, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল চাঙড়টা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নদীতে।

'ধন্যবাদ মশাই।' হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলল, 'এই নিয়ে আর একবার প্রাণ পেলাম।' কিন্তু সেই কথা কানেই গেল না হরিশঙ্করের। ততক্ষণে মানুষটার মুখের দিকে নজর পড়েছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, 'আরে হরনাথ তুই! এ-এখানে কী করে এলি!'

'কেন আসতে নেই বুঝি!' ম্লান হাসল ওপক্ষ। 'আসলে ব্যাপার কী জানিস, সবাই ভুল খবর দিয়েছিল তোকে, আমি মরিনি রে। দেখতেই পাচ্ছিস, বেঁচেই আছি দিব্যি। অবশ্য আজ এইভাবে তুই না-বাঁচালে অন্য রকম হয়ে যেত।'

'কিন্তু, কিন্তু সবাই এমন মিথ্যে রটাল কেন?' ভরু কুঁচকে উঠল হরিশঙ্করের।

'সে অনেক কথা। পরে শুনিস। তার আগে বল, এই রাতে একা ওদিকে যাচ্ছিলি কোথায়।'

'আর বলিস কেন। তুই নেই, তাই একাই বের হয়েছিলাম কবিগান শুনতে। তা হল আর?' খুশিতে দু-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল হরিশঙ্করের।

'কবিগান!' আনন্দে দু-চোখ নেচে উঠল হরনাথেরও। 'কোথায় রে?'

'জিরাটের ওদিকে। ষষ্ঠীতলার—।'

'তাহলে চল যাই।' হরিশঙ্করের কথা কেড়ে নিয়ে হরনাথ বললেন, 'কতদিন যে দুজন একসাথে কবিগান দেখিনি।'

'কিন্তু যাবি কী করে? শেষ ভুটভুটি চলে গেছে। এতক্ষণ খুঁজে একটা নৌকোও তো পেলাম না।'

'কী দরকার নৌকোর।' হরিশঙ্করের কথা প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন হরনাথ, 'চল হেঁটেই পার হয়ে যাই।'

বলতে-বলতে বন্ধুর হাত ধরে হরনাথ নেমে পড়লেন জলে। হরিশঙ্কর অবাক হয়ে দেখলেন, কারও গোড়ালি ডুবল না। দিব্যি হেঁটে চলেছেন জলের উপর দিয়ে। সেই কতদিন আগের মতো খুশিতে গল্প করতে-করতে দুই বন্ধু চলতে লাগলেন ষষ্ঠীতলার মাঠে কবিগানের আসরের দিকে।

হরিশঙ্কর অবাক হয়ে দেখলেন, কারও গোড়ালি ডুবল না...

পাতালরেলের টিকিট

রতনতনু ঘাটী

অফিস থেকে বেরোতে-বেরোতে সন্ধে সাতটা পেরিয়ে গেল। সকাল থেকেই মনটা কেমন আনমনা হয়ে আছে। সকালেই একটা কোকিল একটানা ডেকেছিল অনেকক্ষণ। কেমন মন কেমন করা সেই ডাক। আমাদের বাড়ির পাশের মোহনবাঁশি আমের গাছটায় কোকিলটা মাঝে-মাঝে এসে বসে। একটানা অনেকক্ষণ ডাকে। আজও ডেকেছিল কোকিলটা।

কোকিলের ডাক শুনলে মন ভালোও হয়ে যায় এক-এক দিন। আজ মনটা আনমনাই হয়ে আছে।

আমি চাঁদনিচকে পাতালরেল ধরে বাড়ি ফিরি। স্টেশনে স্মার্ট গেটে কার্ডটা পাঞ্চ করতে গিয়ে দেখলাম কার্ডের টাকা ফুরিয়ে গেছে। অগত্যা টিকিট কাউন্টারে স্মার্ট কার্ডে টাকা ভরার জন্য দাঁড়ালাম। এটাই আবার এগজ্যাক্ট ফেয়ারের কাউন্টারও। কাউন্টারের ভিতর থেকে ভদ্রলোক বললেন, মেশিন খারাপ। স্মার্ট কার্ডে টাকা ভরা যাবে না। আমার কাছে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার এগজ্যাক্ট ফেয়ারে খুচরো ছ-টাকা নেই। তাই পাশের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

স্মার্ট কার্ড নিয়ে মাঝে-মাঝে নানারকম সমস্যা হয়। কখনও গেটে পাঞ্চ মেশিন খারাপ থাকে। তখন আবার বিনে পয়সার পাতালরেল ভ্রমণ হয়ে যায়। কখনও এই স্টেশনে টাকা ভরা যায় না, অন্য স্টেশনে যাও। কত দিন হয়ে গেল, এখনও কেন যে পুরো ব্যবস্থাটা চালু করা গেল না, কে জানে?

টিকিট কাটার লাইনটা বেশ বড়ো। ধীরে-ধীরে লাইন এগোচ্ছে। আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। প্যান্ট-শার্ট পরা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। চোখে চশমা। ভদ্রলোক একবার বাঁ-পকেটে, একবার ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো টাকা বের করে গুনছেন, ফের পকেটে রেখে দিচ্ছেন। আমি ভাবলাম, ভদ্রলোকের যদি খুচরো টাকা আছে তো উনি এগজ্যাক্ট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতেই পারেন। খামোখা কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ওই কাউন্টারটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। একসময় ভদ্রলোক ফের খুচরো টাকা বের করে গুনতে লাগলেন। আমি বললাম, ''দাদা, আপনি তো এগজ্যাক্ট ফেয়ারের কাউন্টারে টিকিট কাটলেই পারতেন। তা হলে তো কষ্ট করে এতক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হত না!''

ভদ্রলোক কেমন স্মিত হাসি হেসে বললেন, ''কষ্টে কী আসে যায়!''

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ কীরকম কথা! কষ্টে কী আসে যায়? যাক গে। উনি যদি কষ্ট করতে চান তো করুন। ওঁর ব্যাপার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক কাউন্টারে পৌঁছোলেন। ছ-টাকা দিয়ে একটা মহানায়ক উত্তমকুমার যাওয়ার টিকিট চাইলেন। টিকিট নিয়ে পকেটে রাখতে-রাখতে সরে দাঁড়ালেন। আমি দশ টাকা দিয়ে একটা মহানায়ক উত্তমকুমার যাওয়ার টিকিট চাইলাম। ওই স্টেশনে নেমে আমাকে ঠাকুরপুকুর যেতে হয় দু-বার অটো বদলে। হঠাৎ দেখলাম, আমার পায়ের কাছে একটা টিকিট পড়ে আছে। ওই ভদ্রলোকই বোধ হয় টিকিটটা পকেটে রাখতে গিয়েছিলেন। ভুল করে পড়ে গিয়েছে। আমি চিকিটটা কুড়িয়ে ভদ্রলোকের পিছন-পিছন ছুটলাম, ''এই যে দাদা, শুনছেন। আপনার টিকিটটা পড়ে গিয়েছিল। এই নিন।''

ভদ্রলোক সকালবেলার সেই কোকিলের ডাকের মতো বিষণ্ণ গলায় বললেন, ''টিকিটে কী আসে-যায়?'' বলে হাত বাড়িয়ে টিকিটটা চাইলেন। আমি টিকিটটা ওঁর হাতে দিতে গিয়ে দেখলাম টিকিটের উপর একটা লাল কালির ফোঁটা। হঠাৎ আমার মনে হল ওটা রক্তের ফোঁটা নয়তো? তারপরে ভাবলাম, তাই বা কেন হবে? এমন অলীক ভাবনার কোনো মানে আছে কি? পাতালরেলের টিকিট, সদ্য মেশিন থেকে বেরিয়েছে।

এতে রক্তের ফোঁটা আসবে কোথা থেকে? নিজের এমন অবাস্তব ভাবনার জন্য নিজেকেই বকে দিলাম। তবে লাল দাগটা কিন্তু ভুল দেখিনি।

ভদ্রলোক তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আমিও এগিয়ে গেলাম। ট্রেন আসতে চার মিনিট দেরি এখনও। প্ল্যাটফর্মে নেমে সামনেই দাঁড়ালাম। প্রথম কম্পার্টমেন্টে উঠলে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের বাইরে বেরোনোর গেটটা কাছাকাছি হয়। যাঁরা নিয়মিত পাতালরেলে যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা অনেকেই নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে ওঠেন। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে দেখা হয়। আমিও ঠিক এরকম সময় যখন পাতালরেলের এই কম্পার্টমেন্টে উঠি, তখন অনেক চেনা মুখের দেখা পাই। তবে আমি একটু লাজুক স্বভাবের বলে যেচে তেমন কারও সঙ্গে আলাপ করি না।

এমন সময় দেখলাম, আমার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। আমি ট্রেন ধরার জন্যে রেডি, ট্রেনটা প্রায় এসে গিয়েছে, হঠাৎ পাশে তাকাতেই দেখলাম, সেই ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ট্রেন ধরার জন্যে। ট্রেনটা কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোক ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে গেলেন। হতচকিত আমি খামচে ধরে ফেললাম জামাসুদ্ধ ভদ্রলোককে। কোনও রকমে বাঁচানো গিয়েছে। অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ভদ্রলোককে কেমন যেন বিমর্ষ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটা কম বয়সি ছেলে ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে। উনি একটু ঘামছেন।

আমিও এগিয়ে গেলাম ওঁর কাছে...

আমিও এগিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। এই ট্রেনটা আমারও ধরা হল না। ক-মিনিট পরে ট্রেনটা চাঁদনিচক স্টেশন ছেড়ে গেল। উলটো দিকের ট্রেনও এল, ছেড়েও গেল দমদমের দিকে। এখন প্ল্যাটফর্মটা বেশ ফাঁকা।

আমি ওঁর পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। সমব্যথীর গলায় বললাম, "এমন কাজ করতে গেলেন কেন? মানুষ বেঁচে থাকার জন্যেই তো কত কষ্ট করে। আর আপনি...।"

ভদ্রলোক খুব শান্ত এবং নিরীহ গলায় বললেন, "বেঁচে থাকায় কী আসে-যায়?"

আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, "না না, আপনাকে বেঁচে থাকতেই হবে।"

উনি খুব বিষণ্ণ চোখে তাকালেন আমার মুখের দিকে। কোনো কথা বললেন না।

আমি বললাম, "জীবনের উপর আপনার এত রাগ কেন?"

আবারও উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। তেমনই বিষণ্ণ চোখ।

আমি কী করব? নতুন যাঁরা প্ল্যাটফর্মে জড়ো হচ্ছেন ট্রেন ধরার জন্য, তাঁরা তো জানেন না, এই ভদ্রলোক একটু আগেই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছিলেন। আমি কী সবাইকে জানিয়ে দেব, এই ভদ্রলোক একটু আগে...। তারপর জোর করে ওঁকে ট্রেনে তুলে দেব? অনেক তরুণ আছে, তারা জানলে ওঁকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমার এইসব ভাবনার ফাঁকে দেখলাম, ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছেন প্ল্যাটফর্মের মাঝের দিকে।

আমিও নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিলাম। যাক, যা করার করুন উনি। আমার কী? আমার উপর তো সব আত্মহননকারীকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেউ চাপিয়ে দেয়নি। তারপর আজ রাতে আমাকে একটা কবিতা লিখতে হবে। কাল সকালে ওই লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফোন করবেন। ফোনেই আমি কবিতাটা বলে দেব। সম্পাদক লিখে নেবেন। আজকাল এমনই চল হয়েছে। ডাকবিভাগের অপদার্থতা আর দায়িত্বহীনতার জন্যেই এমন পথ বেছে নিতে হয়েছে মানুষকে।

সাতপাঁচ ভাবনার ফাঁকে পরের ট্রেন এসে গেল। আমিও হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। ফিরে দেখা হল না, ওই ভদ্রলোক কী করলেন। মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। টানেল দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। আমার ফের সকালবেলার কোকিলের ডাকটা কানে বেজে উঠল। বেআক্কেলে কোকিল! আজ কেন যে অমন করে ডাকল! কখন যে ট্রেনটা মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনে এসে গেছে, খেয়াল হল ট্রেনের ঘোষকের গলার ঘোষণায়।

ট্রেন থেকে নেমেই এক অসম্ভব দৌড় শুরু হয় যাত্রীদের মধ্যে। এতে যে ঠিক কতখানি লাভ হয় কার, কে জানে। যারা দৌড়োয় তারাও কি জানে? কখনও কি তারা ভেবে দেখেছে? আমি ওই দৌড়ের মধ্যে থাকি না যেমন, আবার এই দৌড়ের সময় আমার মধ্যেও কেমন একটা দৌড়োনোর স্রোত বয়ে যায়। অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। তখন আস্তে হলেও দৌড়োই।

আমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেশ বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে। আজকের চাঁদটাকে অন্য দিনের চেয়ে মনমরা মনে হল যেন। আজকের দিনটাই যেন এমন!

টালিগঞ্জে অটোর লাইনে দাঁড়ালাম। দু-বার অটো ধরে তবে ঠাকুরপুকুর যেতে হয়। এই অটোর লাইন অনেক সময় অ্যানাকোন্ডার মতো এঁকেবেঁকে চলে যায় পিছনের পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত। আজ তত লম্বা লাইন নেই। জনা তিরিশেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তবে আজ অটোর ফ্লো কম। রাস্তায় কোথাও জ্যামে আটকে আছে মনে হয়। লাইন খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। এখনই ঘড়িতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বাড়ি পৌঁছোতে সাড়ে ন-টা পেরিয়ে যাবে।

মন থেকে ওই ভদ্রলোকের চিন্তা কিছুতেই যাচ্ছে না। কী হল ভদ্রলোকের? উনি কি আমার ট্রেনটাতেই উঠেছিলেন? নাকি আমার ট্রেনে না-উঠে পরের ট্রেনে...? বাড়িতে গিয়ে টিভির খবরটা দেখতে হবে। কিছু যদি ঘটে তবে খবরে তো দেখাবে। ভদ্রলোক কি সংসারে খুব দুঃখী? কেন? স্ত্রী কি ভালোবাসেন না? সংসারে কি খুবই টানাটানি? হয়তো খুবই সামান্য চাকরি করেন। পান্তাজোটালে নুন ফুরিয়ে যায়? আমার মনে হয়, এই নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেললে কেমন হয়? লিখলে গল্পটা খুবই দুঃখের হবে। কিন্তু কেন? পৃথিবীতে এত দুঃখ ছড়িয়ে আছে, এত দুঃখের ঘটনা। তার উপর আবার দুঃখের গল্প কেন? এই বিষয়টা নিয়ে আনন্দের গল্প লিখলে কেমন হয়? তাই তো উচিত। দুঃখী মানুষকে যতটুকু আনন্দ দেওয়া যায়।

এসব ভাবনার মধ্যে এতটাই ডুবে ছিলাম যে কখন অটো এসেছে, আমি অটোয় উঠে বসেছি, খেয়ালই নেই। আমি বসেছি অটোচালকের ডান দিকে। অটো করুণাময়ী ব্রিজ পেরোল। পিঁপড়ের সারির মতো অটোর লাইন, এই রাত ন-টাতেও। অটো হরিদেবপুর পর্যন্ত ঢিমে গতিতে চলল। তারপর বেশ গতি পেয়ে গেল। এই মার্চ মাসের সন্ধে-রাতে বেশ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব আছে বাতাসে। আমি বেশ একটু গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। এমন সময় লুকিং গ্লাসে চোখ পড়তেই দেখলাম, ওই ভদ্রলোক আমার পিছনে অটোর ডান দিকে বসে আছেন। আমি চমকে উঠলাম। টালিগঞ্জে অটোর লাইনে তো আমার সামনে ভদ্রলোককে দাঁড়াতে

দেখিনি! তা হলে উনি অটোতে বসলেন কী করে? মনে-মনে ভাবলাম, না না, উনি ঠিকই অটোর লাইনে ছিলেন। আমিই আনমনা ছিলাম বলে ওঁকে দেখতে পাইনি।

মনে-মনে ভাবলাম, তা হলে ভদ্রলোক আমাদের দিকেই থাকেন। যাক, তা হলে ওঁকে বাঁচিয়ে একটা ভালো কাজ করেছি। হয়তো দেখা যাবে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন। দেখাই যাক, উনি কবরডাঙায় গিয়ে ঠাকুরপুকুরের অটো ধরেন কিনা।

আজ সকাল থেকেই ক্ষণেক্ষণে ভীষণ আনমনা হয়ে যাচ্ছি। কোনো কিছুতেই ঠিকমতো মন বসাতে পারছি না। কেন এমন হল আজ? তখনই মনে পড়ল, এ সেই কোকিলটার কাজ। সেই যে সকালে এমন মন কেমন-করা সুরে ডাকল একটানা, আর তারপর থেকেই তো...।

একদিন আমার বাড়ির পাশের ওই আমগাছটায় এসে বসেছিল একটা হলদে শালিখ। কী তার চোখ-জুড়োনো রূপ! তার ওই আগুন-ছড়ানো হলদে রং দেখে সেদিন মনটা যেন অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠেছিল। অনেকে ওই পাখিটাকে বেনে বউ বলে ডাকে, অনেকে বলে ইষ্টিকুটুম। আমরা ছেলেবেলায় মেদিনীপুরের গ্রামে ওই পাখি অনেক দেখেছি। আমরা ডাকতাম হলদে পাখি বলে। সেদিন সেই হলদে শালিখ দেখার পর সারাদিনই মনটা টইটই করেছিল আনন্দে। এক-একদিন এক-একটা পাখি, ফুল কেমন মন ভালো রাখে সারাদিন। আজ যেমন ওই কোকিলটা মন খারাপ করে দিয়েছে।

হঠাৎ খেয়াল হতে দেখি আমি ঠাকুরপুকুরের অটোয় বসে চলে এসেছি একদম বাড়ির কাছে। জেমস লং সরণির কাছে বাজারে নেমে গেলাম। বাঁ-দিকে আমার পাড়া। তিন মিনিট হাঁটলেই আমার বাড়ি। প্রায় দশটা বাজতে চলল। তড়িঘড়ি বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

বাড়িতে থাকি আমরা দুটি প্রাণী, আমি আর মেঘনাদদা। আমার স্ত্রী থাকে হলদিয়ায়, চাকরি করে ওখানে। ছেলে-বউমা আর মেয়ে থাকে বেঙ্গালুরুতে। মহিষাদলে গ্রামের বাড়িতে মা আর ভাইরা থাকে। মেঘনাদদা আমার বাবার আমলের লোক, কবে থেকে যে আমাদের বাড়িতে আছে, কেউই মনে করতে পারে না। সবাই বলে, এই মাইক্রো ফ্যামিলির যুগে এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। মেঘনাদদার রান্নার হাতও ভালো। দারুণ সুক্তো রাঁধতে পারে। মাংসটাও রাঁধে দারুণ। আমাদের কলকাতার বাড়িতে আমি একা থাকি। মা মেঘনাদদাকে পাঠাল। সেই থেকে আমরা দু-জন এই বাড়িতে। মেঘনাদদাই রাঁধে, বাজার করে, সব দিক সামলায়। সপ্তাহান্তে আমার স্ত্রী চলে আসে এখানে। কখনও আমি চলে যাই হলদিয়ায়। ছেলে-বউমা, মেয়ে ছুটি পেলে চলে আসে। আমাদের এই বাড়ি তখন যেন মুখরা মেয়ে। হইহট্টগোলে জমজমাট হয়ে ওঠে। মেঘনাদদাও তখন আহ্লাদে ষোলোখানা। একাই দশ হাতে সব সামলায়।

বাড়ি এসে আমি আর মেঘনাদদা একসঙ্গে রাতের খাওয়া খেয়ে নিলাম। খেতে বসে ওই ভদ্রলোকের গল্প করলাম। অবাক হয়ে শুনল মেঘনাদদা। সব গুছিয়ে মেঘনাদদার শুতে দেরি হয়। আমি শুতে চলে গেলাম।

আমার ঘরের দরজা ভেজানো থাকে। বন্ধ করি না। সকালবেলা মেঘনাদদা ঘুম থেকে ওঠার ডাক দেবে বিছানার পাশে এসে। আর তখনই আমি উঠব। কিন্তু কিছুদিন হল, একা-একাই আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কখনও কোকিলের ডাকে, কখনও মোরগের ডাকে। আমার বাড়ির চারপাশের গাছে যে এখন কত রকমের পাখি ডাকে। ঘুম ভেঙে যায়। এসব ডাক বেশ ভালোও লাগে এক-একদিন।

আমি একটু উঁচু বালিশপছন্দ করি। তাই আমার বালিশটার উপর আমার স্ত্রীর বালিশটাও দিই। এতে যেন আরাম লাগে। মেঘনাদদা দেখলে বকে। ডাক্তারের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ বোধ হয় মেঘনাদদা খেয়াল করেনি। দুটো বালিশ পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘরের লম্বা জানলাটা দিয়ে বিকেলবেলার কনে দেখা আলোর মতো অদ্ভুত একটা আলো এসে পড়েছে। গতকালের সেই কোকিলটা ডেকে উঠল একবার। সকাল এসে পড়েছে আমার ঘরের জানলায়। কুয়াশা কেটে রোদ ওঠার মতো চোখের পাতা থেকে ঘুমটা সরে যেতেই আমার মনে হল, মাথাটা যেন অনেক নীচে পড়ে আছে। হাত দিয়ে দেখলাম, একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি আমি। আর-একটা বালিশ কোথায়

গেল? ঘুমোবার সময় দুটো বালিশই তো উপর-উপর রেখে শুয়েছিলাম। আমি পাশে হাতড়ে দেখতে গেলাম, বালিশটা কোথায়? অমনি আমার হাতে লাগল একটা বরফ-ঠান্ডা কিছুর উপর। চোখ বড়ো করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সেই লোকটা। আমি আঁ-আঁ করে চিৎকার করেই......। আর কিছু মনে নেই। তারপরের কথা মেঘনাদদার মুখ থেকে শুনলাম জ্ঞান ফেরার পর। আমার চিৎকার শুনে মেঘনাদদা ছুটে এসেছিল আমার ঘরে। ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছিল। আমি নাকি মিনিট পাঁচেক মড়ার মতো পড়েছিলাম।

চোখ বড়ো করে তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সেই লোকটা...

এই মাত্র চোখ মেলে তাকালাম। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঘনাদদা ঠাকুর প্রণাম করল কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে। তারপর বলল, "দাদাবাবু, তুমি চুপ করে বসে থাকো বিছানায়। আমি একটু দুধ গরম করে

আনি। তুমি যেন এখনই উঠতে যেয়ো না!"

আমি বাধ্য শিশুর মতো ঘাড় নেড়ে মেঘনাদদার কথায় সায় দিলাম। কপালে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ঘাম জমে আছে। নাকি ঘাম নয়, মেঘনাদদার দেওয়া জলের ঝাপটার গুঁড়ো?

মেঘনাদদা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ফ্যানের বাতাস যতটা ঠান্ডা লাগার কথা, তার চেয়েও অনেক বেশি ঠান্ডা লাগছে। তা হলে কি ভোররাতে বৃষ্টি হয়েছিল?

অভ্যেস মতো বালিশের পাশে মোবাইল ফোনটা রেখে ঘুমোই। হাতড়ে মোবাইলটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। কোথাও পাচ্ছি না। ফের যেন ঘামতে শুরু করলাম। একবার মনে হল পাশের বালিশটার নীচে ফোনটা নেই তো? যেই বালিশটা তুলে সরিয়ে দিলাম, অমনি আবার আমার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। দেখলাম, বালিশের নীচে গত কালকের লোকটার সেই পাতাল রেলের টিকিটটা। টিকিটে সেই রক্তের দাগের মতো গোল লাল দাগ।

তারপর? আর আমার কিছু মনে নেই।

চ্যালেঞ্জ

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সকালেও একই ব্যাপার হল। ঠিক ঘরের মাঝখানে বলটা। অথচ আমার ভালোই মনে আছে রাতে ওটাকে টেবিলের নীচে এককোণে সরিয়ে রেখেছিলাম। সপ্তাহ দুয়েক হল ম্যানেজারের পোস্টে এই অফিসে জয়েন করেছি। উঠেছি এই বিশাল বাড়িতে। এতবড়ো কোয়ার্টারে আগে কখনো থাকিনি। হয়ত তাই, রাতে ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে না। ছেলে বুবাই-এর এবারেই ক্লাস টেন হল। ফলে স্ত্রী বা ছেলে কেউই সঙ্গে আসেনি। একা থাকতে হবে জেনেই আসা। তবু এই থাকাটা ভালোভাবে মানাতে পারছি না। কোথায় যেন একটা অস্বস্তি জ্বালিয়ে মারছে।

চা বাগান ভেদ করে অফিসের জিপটা যখন ওপরে উঠছিল, অদ্ভুত ভালোলাগায় বুঁদ হয়ে ছিলাম। একপাশে চা পাতার বাগান, পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বানিয়েছে। অন্যদিকে নেমে যাওয়া খাদের ধারে ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। তাদের দীর্ঘশাখা প্রশাখায় আকাশ ছোঁবার এক নিরলস আকাঙক্ষা। টের পাই চা পাতার বুনো গন্ধ আমাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে। কার্শিয়াং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোমো খাওয়া হল। সঙ্গে এই অঞ্চলের বিখ্যাত সুগন্ধী চা। বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ বাদেই ভুতুড়ে সাদা কুয়াশা যখন সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করল, খুবই হতাশ হলাম। ঘড়িতে তখন সবে পাঁচটা, অথচ চারপাশে অসময়ের সন্ধ্যা। কিংবা বলা যায়, দিনের কোন সময়ে আছি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনখারাপটা তখনই দরজা খুলে বুকের একদম কোনে সেঁধোয়। আর এখনও যায়নি।

আপাতত মাথার মধ্যে একটা কথাই ঘুরছে, বলটা ঘরের মধ্যে এল কীভাবে? আবার কাছে গিয়ে একশ্যুট মারলাম ওটাকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফের আগের জায়গায় ফিরে এল। অবাক কাণ্ড! ওখানে কি অদৃশ্য চক দিয়ে কোনো পয়েন্ট করা আছে যে বলটা বারবার ওখানেই ফিরে আসে।

উঠেছি এই বিশাল বাড়িতে...

বলটার বেয়াড়া আচরণ অগ্রাহ্য করে পেছন ফিরলাম আমি। না, এক্ষুনি চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যাচ্ছে না। অফিস যেতে হবে। তার বাঁধাধরা প্রস্তুতি আছে। বলটা ইয়ার্কি মারলেও আমার তাতে যোগ দেওয়ার সময় কই?

এখানে বদলির অর্ডারটা পেয়ে কলকাতা থেকে ফোন করেছিলাম। এই অফিসের তৎকালীন ম্যানেজার মি. সান্যাল সেসময় খুবই আশ্বস্ত করেন।

আরে বোসসাহেব, এত ভাবছেন কেন? একটা সুটকেসে ঘানকতক জামাকাপড় ভরে স্রেফ চলে আসুন। ওয়েল ফার্নিসড কোয়ার্টার। একজন আধুনিক মানুষের যা যা লাগে সব আছে। আর হ্যাঁ, তাস খেলার নেশা আছে? তাহলে একসেট নিয়ে আসতে পারেন। আমি মশাই ফাঁকা কোয়ার্টারে একা একাই পেসেন্স খেলে কাটাই। এইরকম পাহাড়ি জায়গায়, নিরিবিলিতে, তাসটা জমে ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ।

ওনার হাসির আওয়াজ আমার কানে ঠিক ভালো ঠেকেনি। কলকাতার ফ্ল্যাটে বউ-বাচ্চা রেখে বিদেশ যাত্রা এর আগে করিনি তা নয়, তবে প্লেন ল্যান্ড আর হিলের মধ্যে তফাৎ আছে বৈকি। নাঃ ওনার কথামতো তাস নিয়ে আসিনি। বই পড়তে ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের তিনটি খণ্ড, বিভূতিভূষণ আর শরদিন্দুর রচনাবলির বেশ কয়েকটা, সুটকেসে ভরে নিয়ে এসেছি। এছাড়া ইংরেজি কিছু পুরোনো নভেল তো এখানেই খুঁজে পেলাম। সময় খারাপ কাটছিল না। কোথা থেকে যে এক উটকো অশান্তি শুরু হল।

প্রথম যেদিন কোয়ার্টারে এসে ঢুকি তখন সন্ধে সাতটা। সমস্ত এলাকায় লোডসেডিং। ইনভার্টারের কল্যাণে আমার বাসস্থানে শুধু দু-একটি বিজলি বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। গার্ড দরজা খুলতে লাল কার্পেট মোড়া দীর্ঘ কড়িডর দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম! এত বিশাল ব্যাপার স্যাপার! আমার মতো নশো স্কোয়ারফিটের খুপরি বাড়ির বাসিন্দার এখানে পোষালে হয়! করিডরে নেভা আলোগুলো নিঃশব্দে ঢুলছে। তার ছায়া পড়েছে পাশের দেয়ালে। বেডরুমে ঢুকেও বুকটা টিপটিপ করে উঠল। যেন রাজার ঘর! ঘরের চারপাশের প্রান্তে ঠেসানো সেগুন কাঠের দেরাজ, খোলা বুকসেলফ, পুরোনো আমলের বিশাল বিশাল আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল। অন্যপাশে ফায়ারপ্লেসের ঘোলাটে গর্ত। একমাত্র খাট আর আলনাটাকে মোটামুটি চেনা যাচ্ছে। সেগুন কাঠের হলেও আমাদের বাড়ির ফার্নিচারগুলোর সঙ্গে একটু-আধটু মিল আছে। কার্শিয়াং পেরোতেই রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সুটকেস থেকে সোয়েটার বার করেছি। বাগড়োগরা এয়ারপোর্টে নেপালি ড্রাইভার বলেছিল বাবুজি, আপকা সোয়েটার কাঁহা?

ওসব লাগবে না আমার।

সেসময় ওই কথা শুনে বোধহয় মনে মনে হেসেছিল ছেলেটা। যেমন হেসেছিলাম আমি ওর গায়ে চামড়ার জ্যাকেট দেখে। নাঃ এখানের ঠান্ডাটা বেশ ভালোই। হয়ত সেজন্যই চাপা অস্বস্তিতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। কাল রাতে ঘুমের ঘোরেই শুনেছিলাম, পাশের ঘরের কাঠের মেঝেতে বল গড়াচ্ছে। ঠিক যেন শ্যুট মেরে মেরে খেলছে কেউ। যদিও সকালে ঘুম ভাঙতে, রাতের সবকিছুকেই দুঃস্বপ্ন বলে সহজেই উড়িয়ে দিয়েছি।

বলটা আছে ওই ঘরেই। ওটা বসার ঘর। সোফা-কোচেও চোদ্দ-পনেরো জনের বসার আয়োজন। অন্দর সজ্জাতেও অ্যান্টিকের ছড়াছড়ি। এখানে ছেলের কথা বারবার মনে হচ্ছে। ও ছবি আঁকতে ভালোবাসে। চারিদিকে বিষয়ের তো অভাব নেই। বসে বসে আঁকতেই পারত। বাইরের ঘরেও একটা হাতে আঁকা ছবি নজরে এল। মনে হয় ঘরের জানলার একপাশের ধুলো সরিয়ে ঝাঁট দিতে দিতে, ঝাড়ুদার ময়লা ঝেড়ে আবার যত্ন করে রেখে দিয়ে গেছে রোল করা কাগজটা। খুলে দেখি অপটু হাতের স্কেচ। পেন্সিলে পাহাড়তলির রাস্তা, চা বাগান, ঘরবাড়ি, কাগজের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে কেউ। দেখে মনে হচ্ছে ছোটো বাচ্চার আঁকা। এখানে থাকত হয়ত।

বলটা আছে ওই ঘরেই...

কিসকো হ্যায় ইয়ে? ওটা দেখিয়ে ঝাড়ুদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

মালুম নেহি।

তর ফেঁক দো...।

একদম কথা শোনেনা লোকটা। ওঘরের পর্দা সরিয়ে দেখি আজও কাগজটা তেমনি পড়ে আছে। বিরক্ত হই। আচ্ছা ঠ্যাঁটা তো! কবে থেকে বলছি, তবু বলটা ও ফেলছে না। ওঘরে ঢুকলেই ওটা ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে মিচকি-মিচকি হাসে। আমি যেই শ্যুট মারি দেয়াল ছুঁয়ে আবার জায়গায় ফিরে আসে। বুঝে যাই ঝাড়ুদারটার মতো বলটাও বেজায় অবাধ্য। নিজের মতে চলে।

দুদিন হল আবার একটা নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। সাদা ধবধবে লোমে ঢাকা এক কুকুরছাড়া যখন তখন ঘরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করছে। প্রথমদিন ওকে বেশ পছন্দ হয়েছিল। রবিবার, তাই অফিস বন্ধ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলাম। রান্নার দিদি জিনিস কিনতে বাজারে। বোধহয় ঠিকমতো লাগেনি বাইরের দরজা। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বক্সী আমার হাতে। চারপাশে জগৎসংসার প্রায় বিলুপ্ত! তখনই আওয়াজটা পেলাম। মৃদু খসখসে আওয়াজ, তবে বোঝা যায় স্পষ্ট।

হঠাৎ বসার ঘরে বল গড়ানোর শব্দ শুরু হতে গিয়ে দেখি বল ছাড়াও একটা লোম ঝুলঝুল মিষ্টি বাচ্চা কুকুর এসে দাঁড়িয়েছে ওঘরের লাল কার্পেটে। আমি যেতে ভালো করে একবার আপাদমস্তক দেখল আমায়। তারপর দরজার নীচে ভাঙা কাঠের ফাঁক গলে সুরুত করে চলে গেল বাইরে। বুঝলাম ওর এভাবে যাওয়া আসার পুরোনো অভ্যেস আছে।

ওই ঘরের আর একটা দরজা বাড়ির পেছনের দিকে। খুলে দেখি পেছনের ঢালু জমি বেয়ে ওটা তরতরিয়ে নীচে নামছে। এককালে কুকুর ভালোবাসতাম, তাই সাধ হয়েছিল ভাব করার। হল না।

ফিরে আসতেই চোখে পড়ল, বাজার থেকে ফিরে রান্নার দিদি করিডরের কার্পেটটা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছছে। তার মানে ও এদিক দিয়েই এসেছিল। আমি টের পাইনি।

সারাদিন এখানে কুয়াশা আছেই। ছুটির দিনেও ঘরবন্দি থাকতে হয়। দুপুরবেলা চারপাশ মেঘলা করে ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামে। বড়ো মনখারাপ হয়। এতবড়ো কোয়ার্টারে কিই বা করি, বিছানায় বইহাতে গড়াতে গড়াতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। আধোঘুমে বল গড়ানোর শব্দটা যেন মিহি উৎপাতের মতো কানের পর্দায় ধাক্কা মারে। কুঁড়েমির জন্য উঠি না। তা ছাড়া মনে মনে বুঝে নিয়েছি ওই ঝুলঝুলে ডগ-ই এসেছে আবার। বিকেলে ওঘরের আলো জ্বালতেই নজরে এল ঘরের এককোণে, কুণ্ডুলি পাকিয়ে, চুপ করে শুয়ে আছে। টানা বৃষ্টিতে বেচারি ফিরতে পারেনি হয়ত। মায়া হয়। আর বিরক্ত করি না।

প্রতিদিনের মতো সেদিন রাতেও লম্বা বারান্দা পেরিয়ে খেতে যাই ডাইনিং হলে। আলো জ্বললেও রাতে এদিকটা বড়ো নিঃশব্দ হয়ে থাকে। কেমন ছমছমে ভাব! দরজা খুলতেই চমকাই। এখানেও লাল কার্পেটে ছোটো ছোটো পায়ের ময়লাটে ছোপ। বেশি পুরোনো নয়। কিন্তু কুকুরটা এ ঘরে এল কীভাবে? দরজা তো বন্ধই থাকে। কিংবা হয়তো রান্নার দিদির ভুলে ঘটেছে ঘটনাটা। লম্বা টেবিলের একপাশে খেতে বসে যাই। একা একা খেতে খেতে চারপাশের সারি দেওয়া চেয়ারগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় পথ ভুলে কোনো এক বিচিত্র জগতে আটকা পড়েছি। আজ মনে হল কুকুরটার জন্য একবাটি দুধ মাখা ভাত নিয়ে গেলে হয়। পরমুহূর্তেই ভাবি, খাবে কিনা কে জানে, ও তো আমাকে পাত্তাই দেয়নি।

সেদিনও ভালো ঘুম হয় না। ঘুমের মধ্যে সেই চেনা আওয়াজটা ফিরে ফিরে আসে। বল গড়াচ্ছে। গড়াতে গড়াতে গড়গড় গড়গড় আওয়াজ তুলছে। তার মানে কুকুরটা রাতেও ফিরতে পারেনি।

সকালে অফিসে গিয়ে কাজের তাড়ায় কিছুই মনে ছিল না। বিজি ব্রাঞ্চ। থৈ থৈ করছে কাস্টমার। সবাই ব্যস্ত। মাঝে মাঝেই সেন্ট্রাল অফিসের ফোন আসছে। এ ছাড়াও অফিসের অন্য কাজকর্ম দেখাশোনার ব্যাপার আছে। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। এরই মাঝে মোবাইলটা বেজে উঠল হঠাৎ। ছেলের কল। বাবা, কেমন আছ তুমি? আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে? কতদিন পাহাড় দেখি না।

এই তো দেখি, পুজোর ছুটিতেই না হয়...।

তোমার একা একা খুব খারাপ লাগছে না?

তেমন কিছু না। কিন্তু তোর ব্যাপার কি? স্কুল যাসনি কেন? একটু জ্বরজ্বর লাগছে। তুমি আবার দুশ্চিন্তা করতে আরম্ভ করো না।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখি আমার চেম্বারের এককোণে ঝাড়ুদার হাতজোর করে দাঁড়িয়ে। ভীতু চোখে তাকিয়ে বলে। নমস্তে সাব। মেরা পেমেন্ট আভিতক নেহি মিলা। থোড়া সে ...। ক্যাজুয়াল লেবার। এখনও টাকা পায়নি। ফাইলের দিকে চোখ রেখেই বলি, নবীন...।

সাব,...।
তুমকো বোলা হ্যায় না ও বল ফেঁক দেও...।
হাঁ।
তব?
জরুর ফেঁক দেগা। বাকি সার...।
ঠিক হ্যায়। আভি যাও।
মনে মনে ভাবি কথা না শুনলে ওর বিল আটকে রাখব। সন্ধেবেলা বসার ঘরে ঢুকে বলটাকে দেখতে পাই না। দুপুর আড়াইটে নাগাদ অফিসের কাজ সেরে ও আমার কোয়ার্টারে ঝাড়ু দিতে যায়। বলটা ফেলেই দিয়েছে বোধ হয়।
রাতে লোডশেডিং। ইনভার্টারেও গোলমাল। তবু অদ্ভুতভাবে একটানা ঘুমিয়ে থাকি। ঘুম ভাঙে ভোরের দিকে, একটা চেনা শব্দে। যেন বলটা গড়াচ্ছে পাশের ঘরে। কাঠের মেঝেতে আওয়াজ বাড়তেই থাকে। তখনও আবছা অন্ধকার। দিনের আলো ফোটেনি। আমি কাঠ হয়ে বিছানায় শুয়ে। বিছানা ছেড়ে উঠি না।
সকালে বল আর কুকুরের খোঁজে ঘরটার আনাচকানাচ দেখি। না কোথাও কিচ্ছু নেই। থম মারা শূন্যতায় গায়ে কাঁটা দেয়। ভাঙা শার্সি দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ে একটু দূরে, পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে লাফাতে লাফাতে নামছে কুকুরটা। ওর পাশে পাশে হাঁটছে লাল সোয়েটার পরা একটা বাচ্চা ছেলে। এদিকে তো কোনো ঘরবাড়ি নেই। ছেলেটা কোথা থেকে এল? ভাবতে ভাবতেই সে সোজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় আমার দিকে। ওর রাগত দৃষ্টির ঝাপটা দূর থেকেও আমাকে ছুঁয়ে যায়। হয়তো একটু বেসামালই হয়েছিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি ঘোর কুয়াশা। আর নীচু অবধি বিস্তৃত ঢালু জমিটা হঠাৎই ফাঁকা! ছেলে বা কুকুরের চিহ্ন নেই।
পেছন ফিরতেই চমকে যাই। লাল কার্পেটের ওপর উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বলটা। মনে মনে ওটার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব টের পেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। মনে হয় অজানা কেউ যেন এখুনি তাড়া করবে। দরজার বাইরের ক্ল্যাচ আটকে টেনে দেখে নিই। তালা এনে লাগিয়ে দিতে হবে।
সকাল থেকে নিজের সঙ্গে নিজের স্নায়ুযুদ্ধ সামলে কোনোরকমে অফিসে যাই। আর পাঁচটা স্বাভাবিক দিনের মতো কাজে মন দিতে চেষ্টা করি।
হঠাৎ কি মনে হতে ঝাড়ুদারকে ডেকে পাঠাই। এসে দাঁড়ায় লোকটা।
তুমহারা পেমেন্ট কেয়া মিল গিয়া?
হাঁ সাব।
ঔর ও বল?
কিঁউ? ও তো কব বাহার ফেঁক দিয়া।
ঠিক হ্যায়। যাও।
আর কিছু ভাবতে পারি না। সব গোলমাল হয়ে যায়। ওর কথা সত্যি হলে ঘরে বলটা এল কী করে? কাকেই বা বলব কথাটা। তা ছাড়া এরকম একটা উদ্ভট সন্দেহের কথা কাউকে বলা যায় কি?
তখনই ফোন আসে। কলকাতা থেকে। স্ত্রীর ফোন।
জানো, বুবাই-এর জ্বর একদম সেরে গিয়েছিল। আবার ভোররাত থেকে তেড়েফুঁড়ে এসেছে।
আমি ভাবতে কোনো সময় নিই না। ওকে বলি, ডঃ সেনকে কল দাও, জ্বর বাড়লে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হবে। অফিসের কাজ সামলে আজকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি। ঘাবড়িও না।
ফোন রাখতে রাখতে বলটার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা মনে পড়ছিল। ও কি আমায় চ্যালেঞ্জ করছে?

ফ্যান

দেবাশিস সেন

ফাঁকা ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে বাইরে যাবার দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন পীযূষকান্তি। ফ্ল্যাট থেকে সবার শেষে বেরিয়েছে ওঁর এক ভাইপো। দরজাটা বাইরে থেকে ওই টেনে দিয়েছে। খচ করে দরজার ল্যাচটা লক হবার শব্দও পেয়েছেন পীযূষকান্তি। দরজার বাইরেই কার একটা গলা, ''দরজায় তালা দেবে না রবিদা?''

ভাইপো রবির নিশ্চিন্ত স্বর শুনতে পেলেন পীযূষকান্তি, ''দরকার নেই। ফ্ল্যাট বাড়ির এইতো মজা। দরজা টানো আর বেরিয়ে যাও। সিকিউরিটি নিয়ে খুব একটা ভাবতে হবে না। তা ছাড়া শ্মশানে খুব লাইন না-থাকলে আমরা তো ঘন্টা চার-পাঁচের মধ্যে ফিরেই আসব।''

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে রবির কথায় সায় দিয়ে পীযূষকান্তি স্বগতোক্তি করলেন, ''আরে সেই ভরসাতেই তো বাড়িতে থেকে গেলাম। তোরা ফিরে আসার আগেই নিশ্চয় ইন্ডিয়া ম্যাচ শেষ করে দিতে পারবে। সিডিউলড টাইমতো সাড়ে তিন ঘন্টা। তোরা সুষ্ঠুভাবে আমার সৎকারটা সেরে আয়, আমিও নিশ্চিন্তে ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখি।'' দরজা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পীযূষকান্তি কয়েক পা এগিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা রিমোটটার দিকে হাত বাড়ালেন।

রিমোটটা হাতে তুলে নিতে গিয়েও থমকে গেলেন পীযূষকান্তি। তাঁর এই সূক্ষ্ম শরীর কি রিমোটটা ধরতে পারবে? এতোক্ষণ তো ঘর ভর্তি লোক ছিল। কেউ তাঁর এই শরীরটাকে দেখতে পায়নি। তিনিও এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়িয়েছেন। এর শরীরের মাঝখান দিয়ে, তার শরীরের ভেতর দিয়ে এমনকী নিরেট দেয়ালের মাঝখান দিয়েও দিব্যি গলে গেছেন, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পীযূষকান্তি নিজেকে দেখতে পাননি। নিজের দিকে তাকিয়ে শরীরটাকে কেমন যেন ছায়াছায়া মনে হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল পীযূষকান্তির। টিভিটা যদি চালুই করতে না-পারেন তবে আর ফাঁকা ঘরে থেকে লাভ কি? কিছুক্ষণ আগে তাঁর মৃত শরীরটা জড়িয়ে ধরে তাঁর বড়ো মেয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করছিল, ''বাবাগো, তুমি আর ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালটা দেখে যেতে পারলে না। এতো খেলা ভালোবাসতে তুমি, আর সেই তুমি কিনা ফাইনাল শুরু হবার আগেই চলে গেলে...।''

শোকের বাড়ি হলেও বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে কথা। ভেতরের ঘরে বিছানায় শোওয়ানো ছিল পীযূষকান্তির পার্থিব দেহটা। ড্রইংরুমে টিভি চলছিল। বাড়ির লোকজনেরা পীযূষকান্তির আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা আসা-যাওয়া করছে। তারই ফাঁকফোকরে সকলেই টিভির সামনে দু-চার মিনিট দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পীযূষকান্তির সূক্ষ্ম শরীর কিন্তু সেই প্রথম ওভার থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে টিভির সামনে। বিজ্ঞাপন বিরতিতে শুধু একবার করে দেখে আসছেন নিজের ছেড়ে আসা শরীরটাকে। সঙ্গে আত্মীয়-পরিজনদেরকেও। হরভজন সিং-এর ওভারের প্রথম বলটার সময়েই বড়োমেয়ের বিলাপটা কানে এসেছিল। ওভার শেষ হতে পাশের ঘরে গিয়ে বড়োমেয়ের মাথায় আলতো করে হাতটা রেখে বলেছিলেন, ''নারে মা, খেলা আমি ঠিকই দেখছি। শেষ বল অবধি দেখব। ভারতকে আজ চ্যাম্পিয়ন করতেই হবে। আঠাশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি। আজ একটা বলও মিস করব না।''

বড়োমেয়ে অনেকদিন পর এবাড়িতে এসেছে। আর কিছুক্ষণ মেয়ের পাশে বসার ইচ্ছে ছিল পীযূষকান্তির। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকদের চিৎকার কানে এসে পৌঁছোতে দ্রুত পায়ে

বেড়রুমের দেয়ালের মাঝখানে দিয়ে এঘরে চলে এলেন পীযূষকান্তি। পরের ওভার শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যুবরাজ সিং।

ছটফট করে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন পীযূষকান্তি। ভারতের ইনিংস যেকোনো মুহূর্তেই শুরু হবে। আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। আশেপাশের কোনো ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়তে হবে। টিভিতো চলছে সব বাড়িতেই। ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন পীযূষকান্তি। কার ফ্ল্যাটে যাবেন তিনি। ইন্ডিয়ার জেতা-হারার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। যার-তার ফ্ল্যাটে তো যাওয়া যায় না। একটু ভাবতেই মুখে হাসি ফুটে উঠল পীযূষকান্তির। দোতালার দত্তদের ফ্ল্যাটে সেদিন কীসের যেন পার্টি ছিল। ওখানে বসেই লর্ডস-এর সেই ম্যাচটা দেখেছিলেন না? নর্থ-ওয়েস্ট ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হবার পর সৌরভের সেই জার্সি খুলে মাথার ওপর ওড়ানো! সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন পীযূষকান্তি। বন্ধ দরজার মাঝখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

বন্ধ দরজায় সজোরে আঘাত করে পীযূষকান্তির শরীরটা ছিটকে পড়ল ধরের ভেতরের মেঝেতেই। অবাক হয়ে দরজাটার দিকে তাকালেন তিনি। এতো বড়ো আঘাতেও ব্যথা লাগেনি ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হল কেন। এতক্ষণ তো দিব্যি সব কিছুর মধ্যে দিয়েই চলে যেতে পারছিলেন। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন পীযূষকান্তি। ওর শরীরটা আর ছায়াছায়া লাগছে না-তো। দুটো হাত তুলে ধরলেন মুখের সামনে। দৃষ্টি আটকে গেল হাতের এপাশেই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছোটো আয়নাটার দিকে তাকালেন। গোল আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পেলেন নিজের মুখ। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন পীযূষকান্তি। থাক। এবার টেলিভিশন সেটটা অন করতে কোনো অসুবিধে হবে না। নিজের ঘরে, তার সেই পয়মন্ত চেয়ারটাতে বসেই ইন্ডিয়ার ইনিংসটা দেখতে পাবেন তিনি। পরক্ষণেই একটা চিন্তা এল মাথায়। তাহলে কি আর সূক্ষ্ম শরীরে ফিরে যেতে পারবেন না। ভাবনাটা মাথায় আসতে-না-আসতেই শরীরটা যেন হালকা হয়ে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শরীরটা আবার সেই আগের মতো ছায়াছায়া হয়ে গেছে। আয়নাতেও দেখাও যাচ্ছে না তাঁর মুখটা। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পীযূষকান্তির বেশি দেরি হল না। নিজের ইচ্ছেতেই তিনি এখন শরীরী বা অশরীরী হতে পারছেন। বার কয়েক হাতে-কলমে পরীক্ষা করে খুশিমনে সেন্টার টেবিলের দিকে এগোলেন পীযূষকান্তি। রিমোটটা হাতে তুলে শোফার দিকে এগোতে গিয়েই থমকে গেলেন তিনি। দেয়ালে লাগানো ছ-ফুট লম্বা আয়নাটায় নিজের পুরো শরীরটা দেখতে পেয়েই লজ্জায় জিব কাটলেন তিনি। ছি ছি, এ কী অসভ্যতা। রিমোটটা সোফায় ছুড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে খোলা দরজার মাঝখান দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন পীযূষকান্তি। আলমারি খুলে ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি বার করে শরীরে গলিয়ে ফিরে এলেন ড্রইংরুমে। আর সময় নষ্ট না-করে টিভি সেটটা চালু করে সোফায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে সামনের টুলে পা দুটো তুলে দিলেন। টিভিতে খেলা দেখার সময়। এটাই ওর চিরকালের বসার ভঙ্গি।

ভেতরের ঘরে বিছানায় শোওয়ানো ছিল পীযূষকান্তির পার্থিব দেহটা...

শচীন, সেহওয়াগ ক্রিজে পৌঁছে গেছে। মালিঙ্গার হাতে বল। চোখ বন্ধ করে দু-হাত জড়ো করে শচীনের শততম সেঞ্চুরির জন্য সবে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন পীযূষকান্তি, ঠিক তখনই ডোরবেলাটা বেজে উঠল।

চমকে সোফা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন পীযূষকান্তি। এখন আবার কে এল? দ্রুতপায়ে দরজায় সামনে পৌঁছে ডোর আইতে চোখ রাখলেন পীযূষকান্তি। সর্বনাশ। বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু মনতোষ! আশেপাশে আর কেউ নেই. মনতোষ কি তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে ছুটে এসেছে? কিন্তু ও জানল কী করে? দুপুর থেকে ওঁর ছেলে-মেয়েরা অনেক ফোন করেছে ঠিকই, কিন্তু মনতোষকে তো কেউ ফোন করেনি। ঠিক তখনই শুনতে পেলেন দরজার ওপাশে অধৈর্য গলায় মনতোষ বলছে, "এতো দেরি করে কেন দরজা খুলতে। খেলাতো শুরু হয়ে যাবে। প্রথম বল থেকে ম্যাচ না-দেখলে কী ভালো লাগে!"

যাক, নিশ্চিন্ত হলেন পীযূষকান্তি। ব্যাটা খেলা দেখার জন্য সেই গড়িয়া থেকে দমদম ছুটে এসেছে। ওঁর মৃত্যু সংবাদ এখনো পায়নি।

দরজাটা খুলে ধরে খেঁকিয়ে উঠলেন পীযূষকান্তি, ''তোমার কি কোনো দিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না? শচীনের একটা সেঞ্চুরির জন্য ওপরওয়ালার কাছে আর্জি জানাচ্ছি, আর ঠিক সেই সময়েই তোমাকে বেলটা বাজাতে হবে?''

পীযূষকান্তির কথাটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না-দিয়ে টিভির সামনের সোফাটায় দু-পা তুলে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে মনতোষ বললেন, ''বাবা বীরু মালিঙ্গার প্রথম বলেই একটা চার হাঁকাও দেখি।''

গজগজ করতে করতে নিজের আসনে বসে পীযূষকান্তি বললেন, ''দিয়েছ আমার প্রার্থনাটার বারোটা বাজিয়ে। এখন শচীন যদি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায় তবে তোমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেব।''

''নাঃ' প্রথম বলে রান পেল না বীরু। ভাবলাম বাউন্ডারি মারবে। যাকগে। হ্যা, কী বলেছিলে? শচীনের সেঞ্চুরি! তার জন্য প্রার্থনা! ভগবানকে ডাকো যেন সেঞ্চুরি না-পায় শচীন। ও সেঞ্চুরি পেলে তো ম্যাচ জেতে না ভারত। ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকার খেলা দুটো ভুলে গেলে?''

একটু ঢোক গিলে প্রসঙ্গ পালটালেন পীযূষকান্তি, ''তা হঠাৎ এতোদিন পরে আমার বাড়িতে এলে যে? বেশ কয়েকবছর তো এদিকে আসছই না। অবশ্য আমারও যাওয়া হয় না। বয়স হয়েছে তো?''

একটু ইতস্তত করে মনতোষ বললেন, ''আসলে আজকে বাড়িতে... মানে... ইয়ে—আরে আরে দেখেছো কাণ্ড... পায়ে লাগল যে... আরে আউট দিয়ে দিল। কোনো মানে হয়। সেকেন্ড বলেই উইকেট!''

পীযূষকান্তি বিমর্ষস্বরে বললেন, ''রিভিউ চেয়েছে। দেখা যাক। তবে মনে তো হচ্ছে কারেন্ট ডিসিশনই দিয়েছে আলিমদার।''

পীযূষকান্তি আর মনতোষ। সত্তর বছরের খেলা-পাগল মানুষ দুটির বন্ধুত্বের বয়স বছর পঞ্চাশ। ইডেন গার্ডেনসে পাশাপাশি দুটি আসনে বসার সূত্রে দুজনের আলাপ। ইডেনের কোনো টেস্ট ম্যাচই কেউ বাদ দিতেন না। গত বছর দশেক ধরে অবশ্য মাঠে যাওয়া কমে এসেছে দুজনেরই। কিন্তু যেকোনো ধরনের ক্রিকেট ম্যাচ থাকলেই দুজনের কেউই টিভির সামনে থেকে ওঠেন না। একসময় দুজনে পাশাপাশি বসে টিভিতে খেলা দেখতেন। গত কয়েকবছর বয়সের ভারে কাবু হয়ে যে-যার নিজের বাড়িতে বসেই খেলা দেখেন। দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ঝগড়া চলত দুজনের। ভারতের বাইরে মনতোষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভক্ত, পীযূষকান্তি অস্ট্রেলিয়ার। মনতোষের মতে সোবার্সই পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার, পীযূষকান্তির মতে ডন-এর আশেপাশে কেউ নেই। মনতোষ বিশ্বনাথের সমর্থক। পীযূষকান্তি গাভাসকারের। পাশাপাশি বসে খেলা দেখার সময় গত পঞ্চাশ বছর ধরেই ওরা দুজনে সমানে তর্ক করে চলেছেন। কিন্তু সৌরভ ভারতের হয়ে খেলা শুরু করার পর দুজনের তর্কের বিষয় শচীন-সৌরভ। পীযূষকান্তির মতে শচীন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটসম্যান। মনতোষ বাজি ধরেন সৌরভের ওপর। সৌরভ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে, তারও আগে দুজনের যোগাযোগ কমে এসেছে, পাশাপাশি বসে খেলা দেখা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই শচীন-সৌরভকে নিয়ে দুজনের তর্কের সুযোগ নেই, কিন্তু টপ ফর্মের ওই দুই তারকা যখন একসঙ্গে বড়ো ইনিংস খেলত তখন পীযূষকান্তি আর মনতোষের ভাবভঙ্গি থাকত একই রকম। কোলে বালিশ নিয়ে সোফার ওপরে আসন করে বসে মনতোষ, পাশে টুলে দু-পা তুলে পীযূষকান্তি। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন দুজনে টিভির দিকে। শরীর না-নড়লেও মুখের কোনো বিরাম থাকত না।

...''ফ্যান্টাস্টিক। এরকম পুল শচীন ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। ম্যাকগ্রাথের বলে ওভাবে ছয় মারা রাজা-প্রজা কারোর কম্মো নয়।''

''ধুর ফিল্ডারটাকে স্টিভ ওখান থেকে সরিয়ে দিল কেন? ও থাকলে তো সোজা হাতে ক্যাচ। পুলে ছয় পাওয়া বেরিয়ে যেত।''

''আরে ছিঃ ছিঃ এটা রানিং বিটুইন দ্যা উইকেটস? ওসব মহারাজকীয় চালচলন রাজপ্রাসাদে চলে, বাইশ গজে নয়।''

''লাভলি। শ্যেনকে স্টেপ আউট করে কী ছয়টাই না মারল।

এরকম অ্যাফোর্টলেস শর্ট হোল ওয়ার্ল্ডে কেউ মারতে পারে না। এটাকেই বলে 'বাপী বাড়ি যা' শট।''
''এবার বাড়িই যাবে। শ্যেনকে ছয়! শ্যেন এবার গুগলি দেবে।''
''আহাহাহা, চোখ জুড়িয়ে গেল, কী দারুণ কাভার ড্রাইভ। রাহুল ঠিকই বলেছিল। অফ সাইড শর্টে ভগবান ফার্স্ট পজিশানে থাকলে সৌরভ অবশ্যই সেকেন্ড।''
''আরে ম্যাকগ্রাথের লাইন লেংথ তো সব নষ্ট করে দিচ্ছে শচীন। ভাবা যায়। থ্রি কন্সিকিউটিভ ফোর্স।''
এভাবেই খেলার সঙ্গে সঙ্গে ধারা বিবরণী চালাতেন দুই বন্ধু।
মালিঙ্গার প্রথম ওভারটা শেষ হতে মনতোষ বললেন, ''ওহে পীযূষ, আমার সেই লাকি কুশনটা কোথায়? ওটাকে কোলে না-রাখলে হবে না।''
ডান হাত দিয়ে কুশনটা এগিয়ে পীযূষকান্তি বললেন, ''শচীন এই ওভারে প্রথম ফেস করবে, দয়া করে একটু ওকে সাপোর্ট করো। তোমার মহারাজতো আর এখন দলে নেই।''
গর্জে উঠলেন মনতোষ, ''ওকে তো অন্যায়ভাবে অবসর নিতে বাধ্য করা হল। অবশ্যই ওর এখনো এই টিমে থাকা উচিত ছিল।''
''দাঁড়াও, কথা বোলো না। শচীন ফেস করবে। কুলশেখর বল নিয়ে আসছে।''
ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ঠেলে শচীন এক রান নিল। একটু নিশ্চিন্ত হলেন পীযূষকান্তি। প্রথম রানটা না-পাওয়া অবধি বড্ড টেনশন থাকে। আড়চোখে একবার মনতোষের দিকে তাকালেন পীযূষকান্তি। একদৃষ্টিতে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন মনতোষ। পীযূষকান্তি ভাবলেন বেচারা জানেও না যে ও একটা ভূতের পাশে বসে খেলা দেখছে। ভূত! শব্দটা মনে হতেই হাসি পেল পীযূষকান্তির। ভূত আর মানুষ কী কখনো পাশাপাশি বসে খেলা দেখেছে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল পীযূষকান্তির। খেলাতো সবে শুরু হল। সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টাতো সময় লাগবেই। এই সময়ের ভিতর কেউ যদি ফ্ল্যাটের বেল বাজায় তাহলে কী হবে? ... যাকগে। সেরকম পরিস্থিতি হলে তখন ভাবা যাবে। এখনতো খেলাতে মন দেওয়া যাক।
খেলা গড়িয়ে চলেছে। চমৎকার খেলছে শচীন, গম্ভীর দুজনেই। কুলশেখরার দ্বিতীয় ওভারে নিখুঁত দুটো বাউন্ডারিও মেরেছে শচীন। মনতোষও মাথা নেড়ে তারিফ করেছেন।
সপ্তম ওভারেই ছন্দপতন, আবার সেই মালিঙ্গা। ওর চুতর্থ ওভারের প্রথম বলেই অফস্ট্যাম্পের বাইরের বলে খোঁচা মারল শচীন। পীযূষকান্তির মুখ থেকে 'এইরে' শব্দটা শুরু হয়ে শেষ হবার আগেই সাঙ্গাকারা লুফে নিল ক্যাচটা।
দু-হাতে মুখ ঢাকলেন পীযূষকান্তি। পাশ থেকে গলা খাঁকারি দিলেন মনতোষ। মুখ থেকে হাত সরিয়ে পীযূষকান্তি বললেন, ''তখনই জানি। আমার প্রার্থনার মাঝখানে যখনই তুমি বেল বাজলে, তখনই বুঝেছি আজকে অঘটন ঘটবেই। হল না। আঠাশ বছর অপেক্ষা করে আছি। এবারো হল না। আবার চার বছর অপেক্ষা। কিন্তু তখন কি আর শচীন খেলবে?''
মনতোষ হেসে বললেন, ''আরে পীযূষ, এটা আমাদের শাপে বর হল। শচীন সেঞ্চুরি পেলে ইন্ডিয়া জিতত না। এবার আমি সিওর ইন্ডিয়া আজকে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেই।
দুঃখ ভুলে খেঁকিয়ে উঠলেন পীযূষকান্তি, ''শচীন ওয়ানডেতে আটচল্লিশটা সেঞ্চুরি করেছে। ওই ম্যাচগুলোর একটাতেও কী ইন্ডিয়া জেতেনি?''
''আহা আমি ফাইনালের কথা বলছি।''
''কেন নাইনটি এইটে সারজায়?''
'' কুড়ি বছরে দু-বার। সারজায় আর গত বছর অস্ট্রেলিয়ায়।''
উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলেন পীযূষকান্তি। ওভারের দ্বিতীয় বলে মালিঙ্গার বাউন্সার। ডাক করল তরুণ কোহলি। পীযূষকান্তি মৃদুস্বরে বললেন, ''মালিঙ্গাই শেষ করে দেবে।''

খেলা এগোচ্ছে। গম্ভীর আর কোহলি মসৃণভাবে ইনিংস গড়ছে। পুরোনো দিনের মতো পরিস্থিতি নয়। দুজনেরই প্রায় নিশ্চুপভাবেই খেলা দেখছেন। একসময় কোহলিও আউট হয়ে গেল। ওদের দুজনকে অবাক করে মাঠে নামল ধোনি। প্রথম দিকে ধোনি একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক। পীযূষকান্তি একটু অসহিষ্ণু, "আঃ আস্কিংরেট বেড়ে যাচ্ছে, ধোনি করছে কী?"

আস্তে আস্তে ধোনি খোলস ছেড়ে বেরুল। গম্ভীর সমান সাবলীল। টিভির সামনে বসে থাকা দুই দর্শকের মাথায় চাপটা একটু কম। একটু আড়মোড়া ভেঙে পীযূষকান্তি বললেন, "ওহে মনতোষ, তোমাকে চা খাওয়াতে পারলাম না। বউমা আজ আর ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রেখে যায়নি।"

"চা"। একটু নড়েচড়ে বসলেন মনতোষ, "নাঃ চা আর খেতে ইচ্ছে করছে না।"

অবাক হয়ে মনতোষের দিকে তাকালেন, পীযূষকান্তি, "সে কি! তোমার আবার চায়ে অনীহা হল কবে? শরীরটরীর ঠিক আছে তো?"

"নাহে। ক-দিন ধরে তেমন ভালো ঠেকছে না।"

"তবে আজ আর এলে কেন? বাড়িতে বসে খেলা দেখলেই পারতে।"

"তাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু বাড়ির টিভিটা বন্ধ করে রেখেছে। বললাম চালিয়ে দে, খেলটা দেখি। তা কেউ কথাটা কানেই নিল না। তাই তোমার এখানেই চলে এলাম। আর এটাতো সত্যি, এই সোফাটায় বসেই তিরাশির বিশ্বকাপ ফাইনালটা দেখেছিলাম। সেদিন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, আজও হব।"

পীযূষকান্তি কিছু বলার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। পীযূষকান্তি বসেই ছিলেন, ইচ্ছে ছিল ওটা বেজে বেজে থেমে থাক। কিন্তু মনতোষ বলে উঠলেন, "কী হল ফোনটা ধরো।"

বেজার মুখে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নীচু গলায় বললেন পীযূষকান্তি, "হ্যা।"

"কাকু বলছেন?" উলটো প্রান্তে মনতোষের ছোটোছেলে রঞ্জিতের ভারি গলা, "কাকু, বাবা চলে গেছেন।"

বিরক্তিতে কপালের ভাঁজটা আরেকটু বাড়ল পীযূষকান্তির। বেশি কথা না-বাড়িয়ে ছোট্ট উত্তর দিলেন, "জানি।"

"সেকি!" বিস্ময় ঝরে পড়ল রঞ্জিতের গলায়, "এতো তাড়াতাড়ি গড়িয়া থেকে দমদমে কে খবরটা পৌঁছে দিল। এখনোতো কাউকে জানানো হয়নি।"

"কেউ জানায়নি। চোখের সামনেইতো দেখতে পাচ্ছি। আমার পাশেই আছে ও।"

"হ্যাঁ কাকু।" এবার রঞ্জিতের গলা আরেকটু ভারি, "জানি, আপনাদের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তবে আপনি বেশি ভাববেন না। বাবা খুব শান্তিতেই গেছেন। ক-দিন ধরেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল। তবে তেমন কিছু নয়। আজ সকালেও বলেছিলেন খেলাটা দেখতেই হবে। চেঁচিয়েই আজ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন করতে হবে ইন্ডিয়াকে। কিন্তু খেলা শুরু হবার কিছুক্ষণ আগেই বুকে ব্যথা শুরু হল। ডাক্তার ডাকার আগেই সব শেষ। ঠিক আছে। এখন রাখছি কাকু। অনেক টেলিফোন করতে হবে।"

রিসিভারটা হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে মনতোষের দিকে তাকালেন পীযূষকান্তি। মুরলিধরনের অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলটাকে একস্ট্রা কভার দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে অর্ধশতরান পূর্ণ করল ধোনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাজার মুখে বসে রয়েছেন মনতোষ। পীযূষকান্তি ওঁর দিকে তাকাতেই বললেন, "ছোটকুটা ফোন করেছিল, তাই না? ব্যাটাদের আর তর সয়না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু রঞ্জিত এসব কী বলছে? তুমি নাকি ইয়ে... মানে..."

ঘাড় নাড়লেন মনতোষ, "ঠিকই বলেছে ছোটকু। আমি আজ দুপুর দুটোয় মারা গেছি।"

"অ্যাঁ।" বিস্মিত পীযূষকান্তির হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গিয়ে কয়েক টুকরো হয়ে গেল।

"অ্যাই পীযূষ, ভয় পাচ্ছ নাকি? আরে তুমি ভয় পেলে তো আমাকে এখান থেকেও চলে যেতে হবে। আর এখন এই সিট ছাড়া মানেই ইন্ডিয়া নিঘঘাত জেতা ম্যাচটা হেরে যাবে।" একটু থেমে মনতোষ আবার বললেন, "আর এগারো দিন পরে তো পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে জানি না কোথায় যেতে হবে। এটাই তো

আমার দেখা শেষ ওয়ান ডে। আর মাত্র বারো ওভার খেলা বাকি রয়েছে। দেশের স্বার্থে একটু সাহসী হও। প্লিজ ভয় পেয়ো না।"

আমি আজ দুপুর দুটোয় মারা গেছি...

মনতোষকে অবাক করে হো হো করে হেসে উঠলেন পীযূষকান্তি তারপর একলাফে সোফার সামনে এসে মনতোষকে জড়িয়ে ধরলেন। মনতোষ ছটফট করে উঠতে হাসি থামিয়ে পীযূষকান্তি বললেন, "সারাজীবন আমরা সোবার্স-ডন থেকে শুরু করে শচীন-সৌরভ নিয়ে শুধু তর্ক করে গেলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে এতো মিল! আরে ভাই আমিও তো তোমার মতোই দুটোর আগেই শেষ নিশ্বাসটা ফেলেছি।"

মনতোষ হতবাক। সোফায় বসে সামনের টুলে পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত গলায় পীযূষকান্তি বললেন, "আর কোনো কথা নয়। চল এবার একসঙ্গে গম্ভীর আর ধোনিকে সাপোর্ট করে যাই। ইন্ডিয়াকে আজ চ্যাম্পিয়ন করতেই হবে।

মালিঙ্গার সপ্তম ওভারের পঞ্চম বল। দুরন্ত গতির ইয়র্কারটাকে ধোনি স্কোয়ার লেগের পাশ দিয়ে ঠেলে একরান নিতে ছুটল।

পাশাপাশি বসে দুই বন্ধু একসঙ্গে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালেন। আর মাত্র সাতষট্টি রান দরকার ভারতের ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে। আত্মা সর্বজ্ঞ কিনা জানা নেই তবে পীযূষকান্তি আর মনতোষের কোনো সন্দেহ নেই ভারত আজ আঠাশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাচ্ছে।

মাস্টারমশাই

প্রচেত গুপ্ত

ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারবাবু কাশ্যপকে কাছে ডাকলেন। তার কাঁধে হাত দিয়ে নীচু গলায় বললেন, ''তোমার বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না কাশ্যপ। আত্মীয়স্বজনকে খবর দাও। তারা শেষবারের মতো এসে মানুষটাকে দেখে যাক। মাস্টারমশাইয়ের নিজের যদি কোনো শেষ ইচ্ছে থাকে সেটাও জেনে নিও। পূরণ করবার চেষ্টা কোরো।''

একটু থামলেন ডাক্তারবাবু। মাথা নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, ''আর কী বলব বলো? মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। তাকে একদিন চলে যেতেই হয়। ইচ্ছে করে না তবু যেতে হয়। মানুষ জন্মের এটাই সবথেকে বড়ো দুঃখ। মাস্টারমশাই শুধু তোমাদের বাবা নন, এই চাঁপাডাঙা গ্রামের সকলের প্রিয় মানুষ, শ্রদ্ধার মানুষ। তার কত ছাত্র দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক বা গবেষক। তুমি দুঃখ করো না, এইসব মানুষের মৃত্যু হয় না। তারা ছাত্রদের মাঝখানে বেঁচে থাকেন।'' আর কথা বাড়াতে পারলেন না ডাক্তারবাবু। শোকে তার গলা বুঁজে এল। তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

কাশ্যপ চিন্তায় পড়ল। ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, সময় আর বেশি নেই। সবাইকে খবর দিতে হবে। তারা বাবাকে শেষবারের মতো দেখে যাবে। কিন্তু কীভাবে খবর দেবে? আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা, ফোন নম্বর সে কিছুই জানে না। দীর্ঘ কুড়ি বছর বিদেশে রয়েছে। সিডনিতে? চাকরি করে। বেশি আসতে পারে না। মাঝে মাঝে আসে। এবার এসেছে তিন বছর পর। বাবার শরীর খারাপ শুনে এসেছে। কারও সঙ্গেই তার প্রায় যোগাযোগ নেই। কাশ্যপ বহুবারই বাবাকে সিডনিতে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাবাই রাজি হননি। কেন রাজি হননি কে জানে। কাশ্যপের মা মারা গেছেন অনেকদিন হয়ে গেল। গ্রামের এই ছোট্ট বাড়িতে উনি একাই আছেন। বাইরে যাওয়ার কথা শুনলে বলেছেন, ''অসম্ভব। এই বাড়ি, এই গ্রামের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগাযোগ। এসব ছেড়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া ওই যে স্কুলটা দেখছিস, চাঁপাডাঙা হাইস্কুল, ওখানে আমি তেত্রিশ বছর মাস্টারি করেছি। এই স্কুলবাড়িটা দিনের মধ্যে একবার না-দেখলে আমি বাঁচব না।''

মেঘনাদ সামন্ত চোখ বুঁজে খাটে শুয়ে আছেন...

অনেক বুঝিয়েও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে কাশ্যপ। কিন্তু এখন কী হবে? বাবার ঘরেও এল কাশ্যপ। মেঘনাদ সামন্ত চোখ বুঁজে খাটে শুয়ে আছেন। একাশি বছরের বৃদ্ধ। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মাথাটা দুটো বালিশের ওপর উঁচু হয়ে আছে। কে বলবে মানুষটার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে? মাথার ওপরের খোলা জানলা দিয়ে মুখে সকালের আলো এসে পড়েছে। ঝলমল করছে। যারা খুব ভালো মানুষ হন তাদের বেলাতে সম্ভবত এরকমই হয়। মৃত্যুর ছায়া মুখে পড়তে পারে না। সবসময় ঝলমল করে। কাশ্যপ খাটের পাশে রাখা মোড়ায় বসল। মেঘনাদবাবুর গায়ে হাত রেখে বলল, ''বাবা, বাবা।''

মেঘনাদবাবু চোখ খুললেন, ''কিছু বলবি?''

কাশ্যপ একটু চুপ করে থেকে বলল, ''বাবা, তোমার কাছে একটা ডায়েরি ছিল না?''

''ডায়েরি! কীসের ডায়েরি?''

''একটা ছোটো বাঁধানো ডায়েরি। যেখানে বড়োমামা, জেঠুমণি, ন-কাকা, ফুলমাসিদের ফোন নম্বর, ঠিকানা সব লেখা ছিল।''

মেঘনাদবাবু দম টেনে বললেন, ''ওদের ফোন নম্বর, ঠিকানা দিয়ে কী হবে?''

কাশ্যপ একটু থমকে গেল। কী বলবে? কোনো মানুষকে কি বলা যায়, তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য সবাইকে খবর দেব? বলা যায় না। সে বলল, ''তোমার শরীরটা ভালো নেই সেই খবরটাই বলব।''

মেঘনাদবাবু হাসলেন। তার হাসি এখনও উজ্জ্বল। বললেন, ''কী হবে খবর দিয়ে? তারা আমাকে এই অবস্থায় দেখে দুঃখ পাবে। থাক কাউকে খবর দিতে হবে না।''

কাশ্যপ মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল। গাঢ় স্বরে বলল, ''তোমার যদি বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে, তুমি বলতে পারও বাবা। আমি অবশ্যই যোগাযোগ করবার চেষ্টা করব।''

মেঘনাদ মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। উদাস গলায় বললেন, ''যদি মনে আসে বলব।''

দূরের কাউকে খবর দেওয়া না-হলেও, চাঁপাডাঙা গ্রামের অনেকেই 'মাস্টারমশাই'কে দেখতে এলও। আসাটাই স্বাভাবিক। মানুষটা এই গ্রামের জন্য কম করেননি। একদিন বিকেলে চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের মাস্টারমশাইরা সবাই দলবেঁধে এলেন। সঙ্গে এখনকার হেডমাস্টারমশাই বিশ্বম্ভরবাবু। মেঘনাদবাবু খুব খুশি হলেন। মানুষটা চাঁপাডাঙা স্কুলের সঙ্গে জড়িত কাউকে দেখলেই খুশি হন। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবাইকে ভালোবাসেন। কুড়ি বছরের বেশি হয়ে গেল উনি স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু মন থেকে স্কুলকে সরাতে পারেননি। অবসর নেওয়ার পর উনি বহুদিন স্কুলে গিয়ে বিশেষ ক্লাস নিতেন। তার জন্য কখনও একটা পয়সাও নেননি। বিশেষ ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন। মেঘনাদস্যারের কাছে অঙ্ক শেখার জন্য ছেলেরা উন্মুখ হয়ে থাকত। অঙ্কের মাস্টারমশাইরা সাধারণত রাগি হন। মেঘনাদবাবু ছিলেন একেবারে উলটো। অঙ্কের জন্য কোনো ছাত্রকে তিনি কখনও বকাঝকা, মারধোর করেননি। তিনি বলতেন, ''অঙ্ক কঠিন লাগার আসল কারণ ভয়। যুগযুগান্ত ধরে মাস্টারমশাইরা নিয়ম করে দিয়েছেন, অঙ্ক না-পারলেই পিঠে বেত পড়বে। এই কারণেই ছেলে-মেয়েরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। অঙ্কে পুরো মন দিতে পারে না। আমি এই নিয়ম মানি না।''

চাঁপাডাঙা স্কুলের মাস্টারমশাইদের বসতে বলে মেঘনাদ সামন্ত বললেন, ''তোমাদের দেখে মনটা ভরে গেল। তোমাদের মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই। আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা স্কুলটাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে।''

বিশ্বম্ভরবাবু ভারি গলায় বললেন, ''ওভাবে বলবেন না মাস্টারমশাই। আপনাকে আমরা কোথাও যেতে দেব না।''

মেঘনাদ সামন্ত একটু শুকনো হাসলেন। বললেন, ''ঠিক আছে ওসব কথা থাক। স্কুলের খবর বলো। খেলার মাঠটাকে ঠিক করা গেছে? ছেলেদের খাবার জলের জন্য আর একটা ডিপটিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল। সেটার কী হল? মাস দুয়েক আগে শুনেছিলাম, ক্লাস নাইন, টেনের বেঞ্চের অবস্থা মোটে ভালো নয়। মেরামত করেছ? নতুন কিনলেই তো ভালো হয়।''

মেঘনাদবাবুর কথায় স্কুলের মাস্টারমশাইরা অবাক হলেন। অসুস্থ অবস্থাতেও উনি স্কুলের ব্যাপারে এত খোঁজখবর নিচ্ছেন! এত উৎসাহ দেখাচ্ছেন! বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নামিয়ে বললেন, ''টাকাপয়সার টানাটানি চলছে। এতগুলো কাজ করতে লাখ দুয়েক টাকা লাগবে। তা ছাড়া, ভেবেছিলাম, একটা লাইব্রেরির ঘর বানাব। কিন্তু সবটাই আটকে আছে।''

মেঘনাদবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, ''তোমরা সরকারের কাছে আবেদন করছ না কেন?''

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "করেছি, এখনও কোনো সাড়া পায়নি। সেই আবেদনের চিঠি হারিয়ে গেছে কিনা তাও জানি না। আপনি তো জানেন মাস্টারমশাই, গাঁয়ের স্কুলের কথা সবার শেষে মনে পড়ে।"

মেঘনাদবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছ। আমার সময়েও এরকম সমস্যায় পড়তাম। একবার ক্লাস এইট বি-এর ক্লাসরুমের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়তে লাগল। আমি সরকারের কাছে চিঠি পাঠালাম। ছাদ মেরামতের জন্য টাকা চাই। সেই টাকা এল বর্ষা পেরিয়ে শীতের শেষে। আচ্ছা, তোমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু টাকা তুলতে পারো না? আমার সময়ে কিন্তু আমি ঘুরে ঘুরে স্কুলের জন্য টাকা তুলতাম। চাঁপাডাঙা গ্রামের ধনী মানুষদের বাড়িতে যেতাম। অনেকেই টাকা দিত। দোতলাটা তো ওই টাকাতেই হয়েছিল।"

বিশ্বম্ভরবাবু হেসে বললেন, "মাস্টারমশাই, সেই দিন আর নেই। এখন ধনী মানুষরা আর চট করে স্কুলটুলের জন্য টাকাপয়সা দিতে চায় না। টাকা থাকলে অন্য জায়গায় লাগায়। যাতে টাকা আরও বাড়ে। তা ছাড়া চাঁপাডাঙায় আর ধনী মানুষ কে আছে? যারা ছিলেন বাড়িতে তালা দিয়ে শহরে চলে গেছে।"

মেঘনাদ সামন্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, "তাও ঠিক। তবু তুমি চেষ্টা করো। সরকারের অফিসে দরবার করো। একটা ভালো লাইব্রেরি ছাড়া স্কুল কী করে চলবে?"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "মাস্টারমশাই আপনার জন্য একটা সামান্য উপহার এনেছি।"

মেঘনাদ সামন্ত অবাক হয়ে বললেন, "উপহার! এই সময়ে উপহার কী দেবে?"

বিশ্বম্ভরবাবু ব্যাগ থেকে কাগজ মোড়া একটা চৌকো মতো জিনিস বের করলেন। কাগজ খুলতে দেখা গেল, চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের একটা হাতে আঁকা ছবি। ভারি সুন্দর। জল রং দিয়ে আঁকা হয়েছে। তবে ছবিটা বেশ কয়েকবছর আগের। সোনালি ফ্রেম দিয়ে যত্ন করে বাঁধানো হয়েছে। মেঘনাদ সামন্ত হাতে ছবিটা নিয়ে অস্ফুটে বললেন, "বাঃ। অপূর্ব।"

বিশ্বম্ভরবাবু উৎসাহ নিয়ে বললেন, "মাস্টারমশাই ছবিটা কার আঁকা আপনি কি বলতে পারবেন?"

ছবির গায়ে হাত বোলাচ্ছেন মেঘনাদবাবু। যেন পরমযত্নে তার সন্তানের গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। বিড়বিড় করে বললেন, "কার আঁকা?"

"আমাদের স্কুলেরই এক ছাত্রের। আপনার সময়েই স্কুলে পড়ত। স্কুলের পুরোনো কাগজপত্র পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ পাওয়া গেছে। দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থাতে পাওয়া গেছে।"

মেঘনাদবাবু উজ্জ্বল চোখে বললেন, "তাই নাকি! কী নাম?"

"তীর্থঙ্কর রায়। ক্লাস টেনে পড়ত।"

মেঘনাদবাবু চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করলেন। নিজের মনে মনে বললেন, "তীর্থঙ্কর.... তীর্থঙ্কর...তীর্থঙ্কর...ছবি আঁকত...এখনই ঠিক মনে করতে পারছি না।"

চাঁপাডাঙা স্কুলের ড্রইং স্যার জীবন চক্রবর্তী বসেছিলেন হেডমাস্টার মশাইয়ের পাশে। বললেন, "মাস্টারমশাই আর আপনাকে কষ্ট করে মনে করতে হবে না। খবর পেয়েছি, সেই ছেলে আর এখন এদেশে থাকে না। বিদেশে গিয়ে খুব বড়ো আর্টিস্ট হয়েছে। ছবি আঁকার স্কুল খুলেছে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "মাস্টারমশাই, আমরা কাশ্যপকে বলে যাচ্ছি, সে যেন ছবিটা আপনার সামনে ওই দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। আপনি চোখ খুললেই দেখতে পাবেন।"

মেঘনাদবাবু ধীরগলায় বললেন, "ভালো করেছো। খুব ভালো করেছো। এখন তো আর নিজে গিয়ে স্কুলটাকে দেখে আসতে পারি না। এই ভালো। যতদিন বাঁচব চোখ খুললেই দেখতে পাব। তবে তীর্থঙ্করকে মনে করতে পারছি না! এত সুন্দর ছবি আঁকত, এই ছেলেকে ভুলে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। খুবই অন্যায় হয়েছে।"

কাশ্যপের খুব ভালো লাগল। বাবা কত আনন্দ নিয়ে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কথা বললেন! মনেই হচ্ছিল না, মানুষটা অসুস্থ। আসলে ভালো লাগার বিষয় নিয়ে কথা বললে মানুষ কষ্ট ভুলে যায়। সে দরজা পর্যন্ত

সবাইকে এগিয়ে দিল। বিশ্বম্ভরবাবুকে বলল, ''আপনারা যদি মাঝেমধ্যে আসেন খুব ভালো হয়। চাপাডাঙা স্কুলের কাউকে দেখলে বাবা খুব খুশি হন।''

সন্ধেবেলা ছেলেকে কাছে ডাকলেন মেঘনাদ সামন্ত।

''আমার একটা ইচ্ছে আছে।''

কাশ্যপ বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ''কী ইচ্ছে বাবা?''

''আমি মৃত্যুর আগে আমার এক ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।''

''কে?'' কাশ্যপ উৎসাহ নিয়ে বলল।

''তার নাম তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর রায়। ওই যে দেয়ালে ছবিটা দেখছ ওটা তারই আঁকা। আমি তাকে মনে করতে পারছি না, এর জন্য আমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করছি। যে ছেলে এত সুন্দর ছবি আঁকত, তাকে আমি কেন ভুলে যাব? যে করেই হোক তুমি তার সঙ্গে আমার একবার কথা বলিয়ে দাও। শুনলাম সেও তোমার মতো বিদেশে থাকে। আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো শহরে।''

''নিশ্চয় দেব বাবা। তুমি তার টেলিফোন নম্বর বা মেইল আই ডি দিতে পারবে? আমি ল্যাপটপ থেকে আজই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিচ্ছি।''

''ওসব কিছুই আমার কাছে নেই। এবার দেখো তুমি যদি কিছু পারো।''

এতটা কথা বলে মেঘনাদ সামন্ত হাঁপিয়ে উঠেছেন। তিনি চোখ বুজলেন। চিন্তিত মুখে কাশ্যপ বলল, ''ঠিক আছে দেখছি।''

কাশ্যপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে করেই হোক তীর্থঙ্কর রায়কে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। তার মেইল আইডির সন্ধান পেলে আর সমস্যা হবে না। আধুনিক প্রযুক্তিতে তো এটাই সবথেকে বড়ো সুবিধে। পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কাশ্যপ রাতের খাওয়া সেরে ল্যাপটপ খুলে বসল। 'আর্টিস্ট তীর্থঙ্কর রায়' লিখে 'সার্চ'-এ ক্লিক করতেই একশো ছাপান্নজন তীর্থঙ্কর রায়ের তালিকা ভেসে উঠল পর্দায়। সকলেই শিল্পী! এর মধ্যে বাবার ছাত্র কোন জন? জানতে হলে সকলের পরিচয় ঘাঁটতে হবে। একশো ছাপান্ন জনের পরিচয় দেখা কঠিন বিষয়। তার ওপর আর একটা সন্দেহ আছে। সেই তীর্থঙ্কর রায় কি চাঁপাডাঙার কথা লিখবে। গ্রামের স্কুলের কথা অনেকে চেপে যায়। এড়িয়ে চলে। অনেক সময় বানিয়ে বড়ো কোনো শহরের স্কুলের কথা বলে। এই ছেলেও যদি সেরকম হয়? তাহলে তো কিছুই করা যাবে না। যাই হোক, বাবার এই ইচ্ছে পূরণ করবার চেষ্টা করতেই হবে। নিজে গিয়ে রান্নাঘরে কফি বানাল কাশ্যপ। তারপর কফির মগ নিয়ে বসে একশো ছাপান্নজন তীর্থঙ্করের প্রোফাইল খুঁজতে শুরু করল কাশ্যপ। কিন্তু রাত দুটো পর্যন্ত হাতড়েও কোনো লাভ হল না। চাঁপাডাঙার তীর্থঙ্কর কোথাও নেই। যদি থেকেও থাকে সে 'চাঁপাডাঙা'র নাম গোপন করেছে। কাশ্যপ হতাশ। এতটা এগিয়েও লাভ হল না। বাবার ইচ্ছেটা মেটানো গেল না। খানিকটা রেগেই কাশ্যপ এবার একটা কাণ্ড করল। নিজে একটা বার্তা লিখল। তারপর 'সেন্ড' করে দিল একশো ছাপান্ন জন 'শিল্পী তীর্থঙ্কর রায়'-এর কাছে। ইংরেজিতে লেখা সেই বার্তার মানে এরকম —

''নমস্কার, আমার নাম কাশ্যপ সামন্ত। আমার বাবার নাম মেঘনাদ সামন্ত। তিনি পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে থাকেন। সেই গ্রামের নাম চাঁপাডাঙা। একসময়ে আমার বাবা চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। সেই সময় ক্লাস টেনের এক ছাত্র খুব সুন্দর ছবি আঁকত। সে জলরং দিয়ে স্কুলের একটা ছবিও এঁকেছিল। সম্প্রতি সেই ছবিটি স্কুলের পুরোনো কাগজপত্রের ভেতর থেকে উদ্ধার করা গেছে। ছেলেটি নাকি এখন একজন বড়ো শিল্পী। বিদেশে আছে। কিন্তু বাবা কিছুতেই তাকে মনে করতে পারছেন না। আমার বাবা অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায়। তার খুব ইচ্ছে, ছেলেটির সঙ্গে তার একবার যোগাযোগ হোক। তার ঠিকানা, ফোন নম্বর, ইমেইল আইডি আমরা কিছুই জানি না। আমি আপনার কাছে এই বার্তাটি পাঠাচ্ছি কারণ সেই ছেলের নামও আপনার মতো তীর্থঙ্কর রায়। আপনি যদি চাঁপাডাঙার তীর্থঙ্কর রায় হন. তাহলে দয়া করে আমার

মেইলে খুব তাড়াতাড়ি জবাব পাঠান। আমি টেলিফোনে বা কম্পিউটারে বাবার সঙ্গে আপনার একবার কথা বলিয়ে দেব। একজন মৃত্যুপথ যাত্রী মাস্টারমশাইয়ের শেষ ইচ্ছার কথা ভেবে আশা করি আপনি নিশ্চয় সাড়া দেবেন। আমি এখন চাঁপাডাঙায় বাবার কাছেই আছি। আমার মোবাইল ফোন নম্বর সঙ্গে দিয়ে দিলাম।"

একদিন, দু-দিন, তিনদিন কেটে গেল। কাশ্যপ রোজই কম্পিউটারে তার মেইল চেক করে। না, কোনো জবাব নেই। এদিকে মেঘনাদবাবুর অবস্থার অবনতি হয়েছে। শনিবার শরীরটা বেশি খারাপ হল। কাশ্যপ বসে ছিল পাশে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কে এল! গ্রামের কেউ বাবার খবর জানতে এসেছে? হতে পারে। শুধু সকালে কেন, কেউ কেউ রাত করেও খবরাখবর নিতে আসে। কাশ্যপকে বলে যায়, "কোনও চিন্তা করবে না, যত রাতই হোক দরকার হলেই আমাদের ডাকবে।" নিশ্চয় সেরকম কেউ। কাশ্যপ উঠোন পেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। খুলে চমকে গেল।

না, গ্রামের কেউ নয়। লম্বা চওড়া চেহারার একটি ঝকঝকে ছেলে, দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় তারই বয়সি। ধোপদুরস্ত শার্ট প্যান্টে ঝলমল করছে। পিছনে, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চকচকে বড়ো গাড়িও দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে যুবক এই গাড়িতে এসেছে। কাশ্যপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনি নিশ্চয় কাশ্যপ? আমি তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর রায়। আপনার বাবার ছাত্র। মাস্টারমশাই কেমন আছেন?"

কাশ্যপ প্রায় লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছে করল ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরতে। তার মুখের কথা জড়িয়ে গেল।

"আপনি, আপনি তীর্থঙ্কর? উফ আপনাকে যে কীভাবে খুঁজছি।"

তীর্থঙ্কর সামান্য হাসল। বলল, "আর খুঁজতে হবে না, আমি এসে গেছি। আপনার মেইল পেয়েছি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মাস্টারমশাইয়ের কাছে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ উনি নিজেও জানেন না। উনি না-থাকলে আমি আজ শিল্পীই হতে পারতাম না। সকালে কলকাতা থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম। তবে আমার হাতে সময় খুব কম।"

"ধন্যবাদ। বাবার শরীরটাও খুব খারাপ। আর কতদিন বাঁচবেন জানি না। আপনি যদি দেরি করে ফেলতেন তাহলে হয়তো দেখাই হত না।"

কাশ্যপ আর কথা বাড়াল না। তীর্থঙ্করকে বাবার কাছে নিয়ে গেল। মেঘনাদ সামন্ত চোখ খুললেন। কাশ্যপ ঝুঁকে পড়ে বলল "বাবা, দেখ কে এসেছে। তোমার সেই ছবি আঁকিয়ে ছাত্র তীর্থঙ্কর। দেখো তো চিনতে পারো কিনা।"

মেঘনাদ সামন্ত চিনতে পারলেন না। তিনি জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বললেন, "কেন এমন হচ্ছে! কেন আমি তোমাকে চিনতে পারছি না?"

তীর্থঙ্কর মেঘনাদ সামন্তর হাতটা ধরে বলল, "সেটাই তো স্বাভাবিক মাস্টারমশাই, আপনার তো চিনতে পারার কথা নয়। অনেক বছর আগের কথা। আমার চেহারাও অনেক বদলে গেছে। তখন আমি হাফপ্যান্ট পরতাম। স্কুলের ইউনিফর্ম। কালো হাফপ্যান্ট, সাদা শার্ট।"

বালিশে শুয়েই আক্ষেপে মাথা নাড়লেন মেঘনাদ সামন্ত। বললেন, "সে তো সবাই পরত। তবু তো অনেক ছাত্রকে চিনতে পারি। তোমার মতো একজন গুণী ছেলের কথা আমার অবশ্যই মনে থাকা উচিত ছিল। আমার খারাপ লাগছে।"

তীর্থঙ্কর তার মাস্টারমশাইয়ের কপালে হাত রাখল। বলল, "যাদের সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ আছে তাদের হয়তো চিনতে পারেন। আপনি দুঃখ পাবেন না, আপনার আমাকে মনে না-থাকুক, আমার তো আপনাকে মনে আছে। মনে আছে, ভূগোল ক্লাসে পড়া না-শুনে, ম্যাপ খাতার পাতায় ছবি এঁকেছিলাম। স্কুলের ছবি। ভূগোলের মাস্টারমশাই ধরে ফেললেন। রেগে আগুন। কান ধরে নিয়ে গেলেন হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। আপনি ছবি দেখে কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, সঙ্গে রং তুলি এনেছিস? আমি কাঁদোকাঁদো গলায় বললাম, না, রং কেনার পয়সা নেই। আপনি বললেন, ঠিক আছে আমি রং কিনে

আনাচ্ছি। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, মাস্টারমশাই আর কখনও করব না। ছবি আঁকব না। আপনি ধমক দিয়ে বললেন, চোপ। এই ছবি এখনই এখানে বসে রং করবি। এটাই তোর শাস্তি। ভূগোল মাস্টারমশাই তো অবাক! এমন শাস্তির কথা তিনি কখনও শোনেননি। কান ধরে দশবার ওঠবোস নয়, পিঠে দু-ঘা বেত নয় তার বদলে পেনসিলে আঁকা ছবি রং করা! তাও আবার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে রং তুলি কিনে আনার ব্যবস্থা করলেন। আমিও শাস্তির মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম না। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। স্কুলের পিয়োনকাকু রং তুলি কিনে আনার পর আপনার ঘরে বসে ছবি রং করলাম চোখের জল মুছতে মুছতে। মাস্টারমশাই, আপনি চলে গেলেন ক্লাস নিতে।"

কাশ্যপ বলল, "চোখে জল কেন!"

তীর্থঙ্কর হেসে বলল, "বাঃ, তখনও তো আমি জানি এরপরেই আমার বিরাট কোনো বিপদ আসছে।"

মেঘনাদ সামন্ত নীচু গলায় বললেন, "তারপর?"

"তারপর আপনি ফিরে এসে আমার ছবি দেখলেন। দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই একদিন খুব বড়ো শিল্পী হবি। সবার মুখ উজ্জ্বল করবি। এই ছবিটা রেখে দিলাম। এটা চাঁপাডাঙা স্কুলের সম্পত্তি হল। তুই এই রং তুলি রাখ। এটা তোর সারাজীবনের সঙ্গী হবে। আমার যে কী আনন্দ হল আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

কথা শেষ করে তীর্থঙ্কর দেয়ালের দিকে তাকাল। তার চোখে জলের বিন্দু। সেখানে তার আঁকা ছবিটা ঝুলছে। তীর্থঙ্কর এবার তার হাতের ব্রিফকেস খুলে স্কুলের জন্য একটা চেক বের করল। মেঘনাদ সামন্ত বললেন, "এটা কী!"

"দু-লক্ষ টাকার চেক। চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের নামে লিখে এনেছি। এটা আসলে আমার আপনাকে প্রণাম। আমি জানি চাঁপাডাঙা স্কুলকে আপনি কত ভালোবাসেন। এটা আপনি না করতে পারবেন না। আপনাদের আশীর্বাদে বিদেশে ছবি বিক্রি করে, আর ছবি আঁকা শিখিয়ে কিছু টাকাপয়সা রোজগার করেছি। দয়া করে আপনি এটা স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা যদি স্কুলের কোনো কাজে লাগে আমি বড়ো খুশি হব। আজ আমি উঠব।"

মেঘনাদ সামন্ত তীর্থঙ্করের হাত ধরে কিছু বলতে গেলেন। পারলেন না। তার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"মাস্টারমশাই, আপনি কি এবার আমাকে চিনতে পারলেন?"

মেঘনাদ সামন্ত এবার চোখ বুজে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, "না। বড়ো কষ্ট হচ্ছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল তীর্থঙ্কর। মুহূর্তখানেক ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল তার প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের দিকে। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। গাড়িতে ওঠবার সময় কাশ্যপ বলল, "আপনি যে এতদূর এসেছেন এর জন্য কী বলে যে ধন্যবাদ দেব...। কিছু মনে করবেন না। বাবা যে অবস্থায় আছেন, তাতে অনেকদিন আগে দেখা কাউকে মনে করাটা তার পক্ষে কঠিন।"

অন্যমনস্ক ভাবে তীর্থঙ্কর বলল, "আমি কিছু মনে করছি না। উনি কষ্ট পাচ্ছেন এটাই খারাপ লাগছে।"

তীর্থঙ্করের গাড়ি চলে যাওয়ার পর বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কাশ্যপ। এমন মানুষ আজও আছে! উঠোন পেরিয়ে বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কাশ্যপ। আজ সারাদিন সে বাবার পাশেই থাকবে। চাঁপাডাঙা স্কুলে একটা খবর দিতে হবে। তীর্থঙ্কর রায়ের চেকটা দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে বাবার ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল কাশ্যপ। তারপরই থমকে দাঁড়াল।

একি! ঘরে ও কে বসে আছে! কে? ছোটো একটা ছেলে। সাদা জামা, কালো প্যান্ট। স্কুলের ইউনিফর্ম পরেছে যেন! বসে আছে মেঘনাদ সামন্তর মাথার কাছে। মাথায় হাত বোলাচ্ছে পরমযত্নে! পায়ের আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে মুখ ফেরাল ছেলেটা। ঠান্ডা একটা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল কাশ্যপের! মুখটা সে চিনতে পেরেছে। তীর্থঙ্কর রায়!

বসে আছে মেঘনাদ সামন্তর মাথার কাছে...

কাশ্যপের চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। সে দরজা ধরে মেঝেতে বসে পড়ল।

মেঘনাদ সামন্ত মারা গেলেন সেদিন দুপুরেই। মুখে কোনো কষ্টের ছাপ নেই। যেন দীর্ঘজীবন তাকে পরমতৃপ্তি দিয়েছে।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর পড়ল কাশ্যপ। খবরের শিরোনাম 'শিল্পীর মৃত্যু।' লণ্ডনে এক ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় তীর্থঙ্কর রায় নামে এক বাঙালি শিল্পীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। চাঁপাডাঙা নামের এক অখ্যাত গ্রামে এই শিল্পী তার বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার দিন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে হিথরো বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন। কারণটা বড়ো অদ্ভুত। তিনি দু-

দিনের জন্য দেশে যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলেন তার পুরোনো চাঁপাডাঙা গ্রামে। সেখানে তার স্কুলের এক শিক্ষক খুব অসুস্থ। তিনি নাকি তাকে দেখতে চান। সেই কারণেই......।'

কাশ্যপ কাগজ ফেলে উঠে পড়ল। আলমারি থেকে চেকটা বের করল। চেকের ওপর দুর্ঘটনার দিনের তারিখ! কাশ্যপের সারাশরীর ঝিমঝিম করে উঠল।

নরকের চলচ্চিত্র

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ডিয়ার মিস্টার রাজশেখর, অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরস-এর ডিরেক্টর হিসেবে আপনার সমস্ত অভিযোগ মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। সত্যিই আপনার কাজ শেষ করতে আমাদের অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেল। বুঝতে পারছি, যেহেতু এই কাজটুকু আপনার আগামী সিনেমা 'অন্তিমযাত্রা'-র অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই আমাদের জন্যে সেই সিনেমাও আপনি শেষ করতে পারছেন না। আমি সত্যিই আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

হয়তো এইটুকু লিখেই এই চিঠি শেষ করে দেওয়া যেত, তাতে ব্যবসায়িক সৌজন্যও রক্ষিত হত। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে এমন কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। আমার মন বলছে 'অন্তিম যাত্রা'-র অ্যানিমেশনের কাজ করতে গিয়ে যে অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছি তা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে রাখাই উচিত। কী জানি কেন, আমার কেবলই মনে হচ্ছে সেই অলৌকিক ঘটনার জের এখনো শেষ হয়নি। হয়তো আমার ঘর ছেড়ে সেই দুর্ভাগ্য, সেই দুঃস্বপ্ন এবার আপনার ঘরে ঢুকবে।

সিনেমা পরিচালক হিসেবে আপনার খ্যাতি আমার অজানা ছিল না, বিশেষত হরর ফিলম বা ভয়ের ছবির পরিচালক হিসেবে। জানতাম, এ ব্যাপারে আপনার প্রথম দুটো সিনেমা হলিউডের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছে। সারা দুনিয়া একবাক্যে স্বীকার করেছে—এই কলকাতায় বসে, টালিগঞ্জের স্টুডিয়োগুলোর সামান্য কারিগরী কৌশল ব্যবহার করে আপনি যে বিশ্বমানের ছবি তৈরি করেছেন তা প্রতিভা ছাড়া হয় না। আর সেই জন্যেই, আপনার আগামী ছবির কিছু বিশেষ দৃশ্যের অ্যানিমেশন করে দেওয়ার জন্যে আপনি যখন আমাকে প্রথম অনুরোধ করলেন তখন আমি ভীষণই গর্বিত বোধ করেছিলাম। একজন প্রতিভাবানের কাছ থেকে কাজের স্বীকৃতি পাওয়া তো যে কারুর পক্ষেই ভাগ্যের ব্যাপার। আপনি আমাদের কী পারিশ্রমিক দিচ্ছেন সেটা আমার কাছে গৌণ ছিল। আসল লক্ষ্য ছিল একটা চ্যালেঞ্জিং কাজকে সফলভাবে রূপায়ণ করার যে আনন্দ, সেই আনন্দটুকু পাওয়া।

হ্যাঁ, আপনি যে কাজটা আমাদের দিয়েছিলেন তা ছিল চ্যালেঞ্জিং, ভীষণই চ্যালেঞ্জিং। আপনি চেয়েছিলেন নরকের একটা বিশ্বাসযোগ্য চলমান ছবি আমরা আপনাকে বানিয়ে দিই। সেই ছবি আপনার মূল কাহিনিতে আপনি ব্যবহার করবেন।

আপনি যে ধরনের দৃশ্য কল্পনা করেছিলেন, আজ থেকে পনেরো বছর আগেও সে দৃশ্যের কথা কোনো পরিচালক কল্পনা করতে সাহস পেতেন না। কারণ স্টুডিয়োতে অমন দৃশ্য বানানো যেত না, তা সে যত আধুনিক স্টুডিয়োই হোক না।

আজ কিন্তু বানানো যায়; স্টুডিয়োয় নয়, কম্পিউটারের স্ক্রিনে। যেসব অসম্ভব দৃশ্য স্টুডিয়োর ফ্লোরে তৈরি করা যায় না, তারা রূপ পায় আমাদের মতন অ্যানিমেটরদের মাউসের ক্লিকে। গর্জমান ডায়নোসর থেকে নিমজ্জমান টাইটানিক—সবই এই অ্যানিমেটরদের কারিকুরি।

সেইজন্যেই পনেরো বছর আগে যে দৃশ্যের স্বপ্ন দেখা যেত না, আজ তা যায়। যেমন আপনি দেখেছিলেন।

আপনি আমাদের বানিয়ে দিতে বলেছিলেন লেলিহান আগুনের চলচ্চিত্র। আপনি চেয়েছিলেন সেই আগুনের মধ্যে অগণিত ছায়ামূর্তি। সেই আগুনের রং যেন পৃথিবীর কোনো আগুনের মতন না-হয়। সেইসব ছায়ামূর্তির মধ্যে যেন যন্ত্রণার ছাপ থাকে। এমন আরো অনেক কিছুই আপনি চেয়েছিলেন আমাদের কাছে।

তবে সবশেষে আপনি পুরো ব্যাপারটাই আমাদের ওপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন সব মিলিয়ে যেন নরকের একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে ওঠে আপনার সিনেমার মধ্যে।

আর আমি পুরো কাজের দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছিলাম অনির্বাণের ওপর। অনির্বাণ মজুমদার, আমার সব থেকে কমবয়েসি সহকর্মী। কিন্তু সব থেকে প্রতিভাবান।

দু-বছর আগে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সিলিকন ভ্যালির একটা কলেজ থেকে অ্যানিমেশনে ডিগ্রি নিয়ে এসে আমাদের কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিল অনির্বাণ।

আমাদের এই অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরস-এর ছাদের তলাতেই ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ কর্মী আছেন। তারা টেকনিকাল দিক থেকে হয়তো অনির্বাণের চেয়ে বেশি দক্ষ, কিন্তু এই দু-বছরে অনির্বাণ তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে একটা জায়গাতেই। কল্পনাশক্তিতে।

কোনোকিছু নিখুঁতভাবে কপি করতে বললে ও পারত না। রেগে যেত। কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে বললে ও ভীষণ খুশি হত। তখন ওর মনোযোগ দেখে কে! আর ওর প্রতিটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হওয়ার পরে আমরা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেছি, এমন অরিজিন্যাল কাজ এ দেশে বিরল। ওর এমন কিছু কাজের দৌলতে 'অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরসকে আই টি দুনিয়ার রথী-মহারথীরাও সম্মান করতে শুরু করেছিল।

তো, সেই অনির্বাণ মজুমদারকেই আমি নরকের চলচ্চিত্র বানানোর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? এই কাজটায় তো কল্পনাশক্তিই লাগত। নরক সম্বন্ধে তো আর কারুর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই।

অনির্বাণ কিন্তু তা বিশ্বাস করত না।

কাজটা হাতে পাওয়ার পরেই অনির্বাণ বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। নানা রকমের বই। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা বই, কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কিনে আনা বৃষ্টির ছিটে লাগা হলুদ পাতার বই, ক্ষীণজীবী সাময়িক পত্রপত্রিকা, আর সর্বোপরি ই-বুক তো ছিলই। অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও বহুক্ষণ ও নিজের কিউবিকলে ঘাড় গুঁজে বসে বই পড়ত। তখন শুনশান অফিসে থাকতাম খালি আমরা দুজন—আমি আর অনির্বাণ।

অ্যাসাইনমেন্টটা ওকে দেওয়ার মাস দুয়েক বাদে, এরকমই এক জনশূন্য সন্ধ্যাবেলায় অনির্বাণ তার সমস্ত বইপত্র সরিয়ে রেখে আমার চেম্বারে ঢুকল। ওকে দেখে আমার খুব অস্বাভাবিক লাগছিল। চোখ দুটো যেন কেমন ঘোর লাগা। আমি বললাম, বসো অনির্বাণ। কিছু বলবে?

হ্যাঁ, একটাই কথা বলব বলে এলাম। আমার বিশ্বাস নরক ব্যাপারটা কাল্পনিক নয়। রূপক তো নয়ই। সত্যিকারেই নরক রয়েছে, যেমন রয়েছে এই কলকাতা।

ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি বেশি পড়াশোনা করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমার ঘোর সন্দেহ হল, অনির্বাণের তাই হয়েছে। তবু বহু বছর ধরে অফিস চালাচ্ছি তো, তাই মনের কথা বেমালুম মনে চেপে রেখে বললাম, কেমন করে বুঝলে?

সে তো এককথায় আপনাকে বোঝাতে পারব না। তবে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মহাকাব্য, লোককথা, উপকথায় অদ্ভুতভাবে একেবারে একইরকম ছবি আঁকা হয়েছে নরকের। এটা কেমন করে সম্ভব, যদি না একটাই মডেল থাকে আঁকার জন্যে?

আমি তর্ক করতে পারতাম। বলতে পারতাম পৃথিবীর সব মানুষেরই মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে একটা ভয় আছে। সেই ভয়টাই অমন ভয়ংকর ছবি হয়ে দেখা দেয় তাদের লেখায় কিংবা আঁকায়। ভয়টা যেহেতু একরকম, তাই ভয়ের ছবিগুলোও একরকম। কিন্তু তা না-করে আমি অনির্বাণকে বললাম, বাঃ! এতে তো তোমার কাজ সহজ হয়ে গেল। তোমাকে আর কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে না। ওইসব লেখায় যেমন বর্ণনা পাচ্ছ তেমন করেই অ্যানিমেশন ফিলমটা বানিয়ে দাও না মিস্টার রাজশেখরের জন্যে।

উঁহু। বেশ জোরে ঘাড় নাড়ল অনির্বাণ। এত জল মিশেছে না ও সব লেখায়। জল না-বলে রং বলাই ভালো। বহুবছর আগে লেখা মহাকাব্য কিংবা উপকথাগুলোয় পরের যুগের মানুষ যখনই পেরেছে একটু করে রং চড়িয়েছে। নানা যুগের নানা রকম মিথ্যে গল্প ঢুকতে ঢুকতে মূল গল্পটাকেই আর চেনা যাচ্ছে না। আমি যদি এখন 'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড, তাহাতে ডুবায় ধরে পাতকীয় মুণ্ড'—এই বর্ণনা অনুযায়ী নরকের ফিলম বানাই, তাহলে সে ফিলম দেখে আপনি ভয় পাবেন না হেসে ফেলবেন? হতাশা আর বিরক্তি একই সঙ্গে ঝরে পড়ছিল ওর গলা থেকে।

তাহলে? এবার আমিও সত্যি করেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি কাজের মানুষ। নরক আছে কী নেই তাতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। আমার মাথায় শুধু ঘুরছে আপনার তাগাদার ফোন আর চিঠিগুলো। অনির্বাণ কাজটা এখনো শুরুই করল না, শেষ করবে কবে? তাই আবারও বললাম তাহলে কী করবে ভাবছ বলো তো।

একবার যদি নিজের চোখে দেখতে পারতাম মৃত্যুর পরের সেই দেশটা!—প্রায় স্বগতোক্তির মতন মৃদুস্বরে বলল অনির্বাণ। আমি মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, তোমার নামটা তাহলে অনির্বাণ থেকে পালটে নচিকেতা করে দিতাম। বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমরা একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের এমন বাচ্চাদের মতন আইডিয়া দেখে। তাই এবারে বেশ কড়া সুরেই বললাম, তুমি যাই করো অনির্বাণ, মিস্টার রাজশেখরের কাজটা কিন্তু আমাকে আর একমাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তার বেশি সময় তোমাকে আমি দিতে পারব না।

মাত্র একমাস! স্পষ্টতই হতাশ হল সে।

আমার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে মায়াও হচ্ছিল ওর জন্যে। বেশ বুঝতে পারছিলাম—যে জিনিসকে একবার বাস্তব বলে ভেবে ফেলেছে ও, তাকে আর কল্পনায় ধরতে ওর মন চাইছে না। এই দোটানায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা। কী করবে ও কে জানে! কিন্তু আমাকেও তো কাজটা শেষ করাতে হবে। আর দু-একদিন দেখে অন্য কারুর কাছে ট্রান্সফার করে দেব তাহলে অ্যাসাইনমেন্টটা, এরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু সে-সময় আর পেলাম না।

ঠিক দু-দিন বাদে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনির্বাণের গাড়ি কোনা-এক্সপ্রেসওয়ের ওপর একটা উঁচু ব্রিজের ওপর থেকে নীচে পড়ে গেল।

পড়ে গেল? নাকি অনির্বাণ নিজেই নিজেকে ছুড়ে দিল অতল শূন্যতার বুকে? আজ আমার সন্দেহ হয়, দ্বিতীয়টাই ঠিক। ও মৃত্যুর পরের দেশ দেখতে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সেই দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় অনির্বাণের।

মিস্টার রাজশেখর, বুঝতে পারছি আপনার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। তবে আমি আর বেশি সময় নেব না।

অনির্বাণের মৃত্যুর ঠিক দু-দিন পরের ঘটনা। মানে আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন আগে। তারিখটা ছিল আঠারোই জানুয়ারি। সেই রাতে যেমন শীত পড়েছিল, তেমন শীত কলকাতায় অন্তত আমি কখনো পাইনি। তীব্র ঠান্ডায় কুঁকড়ে নিথর হয়ে গিয়েছিল পুরো শহর। তারই মধ্যে আমার সেলফোনটা বেজে উঠল। ঘুম জড়ানো চোখে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম আলোকিত স্ক্রিনের ওপর ফুটে ওঠা ঘড়ি সময় দেখাচ্ছে রাত দুটো। যে নামটা ফুটে উঠেছে সেটাও আমার খুব পরিচিত। মিস্টার আহুজা। নিউ আলিপুরে রাস্তার যে পাশে আমাদের 'অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরস'-এর অফিস, তার ঠিক উলটোদিকেই মিস্টার আহুজার বাড়ি। কিন্তু এত রাতে তার ফোন কেন!

ভারি অবাক হয়ে বললাম, বলুন মিস্টার আহুজা।

মিস্টার প্রধান, শান্ত ভাবে শুনুন। ডোন্ট গেট প্যানিকড। আপনার অফিসে আগুন লেগেছে। আমি আপনাকে ফোন করার আগে ফায়ার-ব্রিগেডে খবর দিয়ে দিয়েছি। ইনফ্যাক্ট দে হ্যাভ অ্যরাইভড অ্যান্ড ডাউজড দা ফায়ার। আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। তবু আপনার একবার আসা উচিত মনে হয়।

এক্ষুণি আসছি আমি। আর আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব...

ও সব পরে হবে। আপনি চলে তো আসুন আগে।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে আমার সল্টলেকের বাড়ি থেকে নিউ আলিপুরে যতক্ষণে পৌঁছোলাম ততক্ষণে আগুন পুরোটাই নিভে গেছে। অফিসঘর জলে থই থই করছে। কিন্তু তা ছাড়া, দেখে আস্বস্ত হলাম, ক্ষতি প্রায় কিছুই হয়নি। এবং তার জন্যে পুরো কৃতিত্বটাই প্রাপ্য মিস্টার আহুজার। উনি যদি অত তাড়াতাড়ি দমকলে খবর না-দিতেন তাহলে অনেক কিছুই আগুনের গ্রাসে হারিয়ে যেত।

দমকলের লোকেরা যখন বিদায় নিল তখন ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে। ক্লান্ত শরীর এবং বিধবস্ত মন নিয়ে মিস্টার আহুজার ফ্ল্যাটেই গিয়ে বসলাম। ওনার কাজের লোক আমাদের দুজনের জন্যেই ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিস্টার আহুজা যা বললেন তা শুনে আমি চমকে উঠলাম। উনি বললেন আপনার স্টাফেদের মধ্যে কেউ কি রাতে অফিসে থেকে গিয়েছিল, মিস্টার প্রধান?

না তো, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?

না, মানে আমি তো অনিদ্রারোগী। রোজকার মতনই জানলার ধারে বসে বই পড়ছিলাম। তার মধ্যেই একবার চোখ তুলে দেখি আপনার অফিসের ভেতর একটা ছায়ামূর্তি চলাফেরা করছে। একটা কিউবিকলে আলো জ্বলছিল। সেই আলোর সামনে ঝুঁকে বসে কিছু করছিল লোকটা। মাঝে মাঝে আবার জানলার ধারে এসে তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে। যেন ওই রাতের আকাশে কিছু একটা ফুটে উঠবে এক্ষুণি।

আমি ভেবেছিলাম আপনার কোনো স্টাফ ওভারটাইম কাজ করছে বুঝি। একটু পরে আলোটা নিভে গেল আর তার কিছুক্ষণ পরেই আগুনের প্রথম হলকাটা দেখতে পেলাম। আমি আর দেরি করিনি। কিন্তু...কিন্তু....তাহলে কি কেউ স্যাবোটেজ করল আপনার অফিসে!

আমি বললাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিস্টার আহুজা। আমার এত বড়ো শত্রু কেউ আছে বলে তো জানি না। তা ছাড়া দমকলের লোকেরা তো আমার অফিসে ঢোকার কোলাপসিবল গেট, রোলিং শাটার সব বন্ধই পেয়েছিল। ওরা হাতুড়ি দিয়ে তালা ভেঙে ঢুকেছে। তাহলে ভেতরে লোক আসবে কোত্থেকে?

মাঝে মাঝে আবার জানলার ধারে এসে তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে...

না, মানে ধরুন কাল অফিস ছুটির পরে যদি কেউ লুকিয়ে বসে থাকে...

অসম্ভব। আমার দীর্ঘদিনের অভ্যেস সবার শেষে অফিস থেকে বেরোনো, এবং তার আগে পুরো অফিস তন্ন তন্ন করে দেখে যাওয়া। প্রতিটি কম্পিউটার সাট-ডাউন করা আছে কিনা তাও দেখে, নিজের হাতে তালা লাগিয়ে অফিস থেকে বেরোই। কালকেও তাই করেছি।

তবে কি আমিই ভুল দেখলাম? হতে পারে। বয়েস হচ্ছে। বিমর্ষ স্বরে বললেন মিস্টার আহুজা।

না, মিস্টার আহুজা ভুল দেখেননি।

পরের দিন অফিস পরিষ্কার করে নতুনভাবে কাজ শুরু করলাম আমরা। আমার নিজস্ব কম্পিউটারটা একেবারেই আমার নিজস্ব পাস ওয়ার্ড দিয়ে খুললাম, এবং খুলেই দেখলাম একটা নতুন আইকন জ্বলজ্বল

করছে আমার ডেস্কটপে। তার নাম...'নরকের চলচ্চিত্র'।

হ্যাঁ, মিস্টার রাজশেখর। প্রায় আধঘন্টার একটা ভিডিয়ো ক্লিপিংকে ওই নামেই আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করে দিয়ে গিয়েছিল কেউ। না, এমন অস্পষ্ট ভাষায় বলার প্রয়োজন নেই। বলছি যখন তখন আমার ধারণাটা খুলেই বলি, তাতে আপনি যদি আমাকে উন্মাদ ভাবেন তাতে আমার কিছু করার নেই। ওই ছবি আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করে দিয়ে গিয়েছিল অনির্বাণ। মৃত্যুর দেশ থেকে ফিরে এসে।

আমি, কেবল আমিই আমার কম্পিউটারের মনিটরে চালিয়ে দেখেছি সেই চলচ্চিত্র।

ওই চলচ্চিত্র এ জগতের নয়। আগুনের অমন রং আমরা পৃথিবীর মানুষেরা কোনোদিন দেখিনি। সেই আগুনের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে যে জীবগুলো তারাও এই জগতের কেউ নয়। অত যন্ত্রণাবিকৃত মুখ পৃথিবীর মানুষের হতে পারে না।

এই চিঠি যার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি তার হাতেই ওই ভিডিয়ো আমি একটা সিডি বন্দি করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার নিজের কাছে ওই ভয়ংকর দৃশ্যের আর কোনো কপি রাখলাম না।

আপনি ভিডিয়োটা নিজে দেখুন। দেখে আপনি স্থির করুন ওই ছবি আপনার সিনেমায় জুড়বেন কিনা। যদি আমার পরামর্শ নেন, তাহলে বলি জুড়বেন না। মৃত্যুর পরের জগতে উঁকি মারার অধিকার বোধহয় আমাদের, জীবিত মানুষদের নেই।

বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই নেই। তার প্রমাণ কি জানেন? আমার অফিসের ওই আগুন।

পরলোক থেকে তার আরব্ধ কাজ শেষ করে যাওয়ার জন্যে এসেছিল অনির্বাণ। করেও ছিল শেষ। জানি না মৃত্যুর পরে কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল সে, কিন্তু অমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতার জোরেই সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নরকের চলমান ছবি। সে ছবি রেখেও গিয়েছিল আমার কম্পিউটারে। কিন্তু ততক্ষণে টনক নড়েছে নরকের প্রহরীদের। তারা ধাওয়া করেছিল অনির্বাণকে। জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল আমার কম্পিউটারটা। জ্বালিয়ে দিতে পারেনি শুধু দ্রুত দমকলের লোকেরা চলে আসায়।

কিন্তু ওরা কি চেষ্টা ছেড়ে দেবে? মনে হয় না। সেইজন্যেই আবার বলছি, আপনি সাবধানে থাকবেন।

নমস্কারান্তে—

সুধাময় প্রধান
ডিরেক্টর, অ্যাডভান্সড অ্যানিমেটরস
3 ফেব্রুয়ারি 2011

দৈনিক পূর্বদিগন্ত

4 ফেব্রুয়ারি, 2011 নিজস্ব সংবাদদাতা : গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় বাংলা ছবির পরিচালক রাজশেখর সিনহা, প্রচারমাধ্যমে যিনি এস রাজশেখর নামেই পরিচিত ছিলেন।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কথায় জানা যাচ্ছে যে, তিনি নিজের ঘরে বসে কম্পিউটারে কিছু কাজ করছিলেন। এইসময়েই সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে তার কম্পিউটারে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছুঁয়ে যায় রাজকুমারবাবুর শরীর। সাধারণত এমন আগুনের শিখা বেশিদূর ছড়ায় না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এই ঘটনায় আগুনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে রাজকুমারবাবু তার আসন ছেড়ে ওঠবার সময় অবধি পাননি। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায় তার সমস্ত শরীর। কম্পিউটার এবং রাজকুমারবাবুকে গ্রাস করে সেই আগুন যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল, তেমন হঠাৎই নিভেও যায়।

এইসময়েই সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে তার কম্পিউটারে আগুন লেগে যায়...

রাজশেখরবাবুর মৃত্যুতে অসমাপ্ত রয়ে গেল তার নির্মীয়মান ছবি 'অন্তিম যাত্রা'।...

আশ্চর্য চিঠি

সুকুমার রুজ

রাত দেড়টা। তবুও পল হ্যারির চোখে ঘুম নেই। অথচ অপরিমেয় ক্লান্তিতে তিনি আর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন পেছনদিকে। পা দুটো টানটান করেছেন টেবিলের তলা দিয়ে। চোখ বুজে চেষ্টা করছেন ক্লান্তি দূরে সরাতে।

শরীরের আর দোষ কী! একটানা প্রায় তেরোঘন্টা ঘাড় নীচু করে বসে ব্যতিক্রমী চিঠিখানার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন পল। প্রায় নব্বই শতাংশ উদ্ধার করেই ফেলেছেন। সামান্যই বাকি। সেটুকু উদ্ধার করতে পারলেই সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন উঠবে। এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের অংশীদার হবেন তিনি। এরকম এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে কি ঘুম আসে!

আজ রাতের মধ্যেই পুরো চিঠিখানির পাঠোদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছেন পল। তাই নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফির সাহায্যও নিলেন। কিন্তু তেমন ফল হল না। একে তো দু-হাজার বছর আগের চলিত-লাতিন হরফ। তার ওপর টানা স্মল লেটারে লেখা। ক্যাপিটাল লেটারের বালাই নেই, কোনো যতিচিহ্ন নেই। বেশ কয়েক জায়গায় কাটাকুটিও রয়েছে। তা ছাড়া বেশ কিছু জায়গায় কালি উঠে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখা।

এমনটা হওয়ারই কথা। নেহাত চিঠিখানা বার্চগাছের কাঠের নরম অংশ দিয়ে তৈরি পাতের ওপর লেখা। 'লেখা' না-বলে 'খোদাই করা' বলাই ভালো। নরম কাঠের পাতে ধাতব নিব দিয়ে চেপে লেখা হয়েছে। তার ওপর সেকালের বিশেষ ধরনের আঠা মেশানো কালি দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে দাগগুলো।

এ চিঠি ধবংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেলেও যথেষ্ট ভালো ভাবে সংরক্ষিত ছিল; তাই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। সংরক্ষিত থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ধবংসস্তূপটা আসলে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা ভিনড়োল্যান্ডার দুর্গ। যা ছিল সে-যুগে রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার এক বড়োসড়ো ঘাঁটি। পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রবিন চার্লে মাটি খুঁড়ে ওই দুর্গ উদ্ধার করার পর তেমনটাই দাবি করেছেন।

রবিন চার্লের দাবি অমূলক নয়। কেন-না, ধবংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে রোমানদের যুদ্ধাস্ত্র, ব্যালিস্টা গোলা, সামরিক কাজে ব্যবহৃত নানারকম জিনিসপত্র এবং কাঠের বাক্সে রাখা চামড়ায় মোড়া বেশ কিছু কাঠের পাতের চিঠি ও দলিল।

চিঠি ও দলিলের লিপি উদ্ধার করার জন্য ফিলোলজিস্ট পল হ্যারির আমন্ত্রণ পাওয়াটা যথেষ্ট যুক্তিসংগত। কারণ, চেস্টারহোমের ইন্টারন্যাশনাল ফিলোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির অ্যানসিয়েন্ট লাতিন স্ক্রিপ্ট বিভাগের প্রধান হলেন পল হ্যারি। এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যোগ্য ফিলোলজিস্ট আর কে হতে পারে! ইতিমধ্যে তিনি তেতাল্লিশখানা চিঠি ও দলিলের মধ্যে একচল্লিশখানার লিপি উদ্ধার করে ফেলেছেন। মাঝারি সাইজের একখানা চিঠি খুবই অস্পষ্ট, তাই ফেলে রেখেছেন। এখন যে চিঠিখানির লিপি উদ্ধারে উনি ব্যস্ত, সেটি সবচেয়ে ব্যতিক্রমী চিঠি। অন্যগুলির চেয়ে আয়তনে বড়ো। দু-মিলিমিটার পুরু, নয় সেন্টিমিটার চওড়া, প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের পাতে টানা চল্লিশ লাইন লেখা রয়েছে। চিঠির বিষয়ও সম্পূর্ণ আলাদা।

অন্যান্য দলিল বা চিঠিগুলি হল সামরিক নির্দেশ আদান-প্রদান সংক্রান্ত। কিন্তু এ চিঠিতে খোদাই করা রয়েছে এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সংকেত-সূত্র। যে সংকেত-সূত্র বাস্তবে রূপায়িত হলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তথা প্রাণীকুলের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ধ্বংসস্তূপের খনন কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও মাসদুয়েক চলতে পারে। তাই স্তূপের আশপাশে বেশ কয়েকখানা তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেগুলোর একটার মধ্যে পল হ্যারি তাঁর কাজ করে চলেছেন। এই গভীর রাত্রিতে অন্যান্য তাঁবুগুলোর আলো নেভানো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকলে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বার্চ, বলসম, ম্যাপল গাছগুলোও ঘুমোচ্ছে। শুধু কিছুটা দূরে দূরে উঁচু পোস্টের মাথায় সার্চলাইটগুলো প্রখর চোখে জেগে রয়েছে।

পল হ্যারি না-ঘুমোলেও, পেছনে ঘাড় হেলিয়ে, সামনে পা ছড়িয়ে চোখ বুজে চেয়ারে বসে রয়েছেন। টেবিলে ল্যাম্প জ্বলছে। সামনে অদ্ভুত চিঠিখানা। সারাদিনের ক্লান্তিতে পলের একটু ঝিমুনি এসেছিল বোধহয়! অসমান জায়গায় নড়বড়ে চেয়ারে দেহের ভার একদিকে হেলে পড়ায় চেয়ার উলটে পড়ে যাচ্ছিল আর কী! পড়ে যাওয়া রুখতে হাত-পা ছুড়লেন পল। হাঁটুর ধাক্কায় টেবিল নড়ে উঠল। নিজের পতন আটকালেও টেবিলে বসে থাকা ল্যাম্পটার পতন আটকাতে পারলেন না। ল্যাম্প ভেঙে চুরমার। অন্ধকারে ডুবে গেলেন তিনি।

এখন আর কী করা যায়। রবিন চার্লে ও তাঁর সঙ্গীসাথি এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন অন্য তাঁবুতে। এই রাত্রিবেলা ল্যাম্পের জন্য তাঁদেরকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। এমন ভেবে পল হ্যারি এখন তাঁর কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন। তাহলে এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। কাল সকালে উঠে আবার মাথা ঘামানো যাবে। এটাই মনস্থির করে, পল অন্ধকারের মধ্যেই পাশে ক্যাম্বিশ ঘাটে শুয়ে পড়লেন কম্বল-মুড়ি দিয়ে।

কিন্তু ঘুম আসতে চাইছে না। শুয়ে শুয়ে পল ভেবে চলেছেন চিঠিখানির কথা। চিঠির প্রথমদিকটা ও শেষাংশটা বেশ স্পষ্ট। উদ্ধার করতে কষ্ট হয়নি। চিঠিখানি লিখেছেন লুসিয়াস নামের একজন। তিনি একজন সামরিক ডাক্তার। সালপিসিয়া লেপিদিনা নামের কোনো এক মহিলাকে 'স্যালুটেম' সম্বোধন করে এই চিঠি।

চিঠির প্রথমদিকে সৌজন্য প্রকাশ ও দু-একটা মামুলি কথার পরেই মূল বিষয়—'ভেষজ পদ্ধতিতে প্রাণীদেহে এমন এক বৈশিষ্ট্য বা গুণ উৎপন্ন করা সম্ভব ; যাতে প্রাণীরা উদ্ভিদের মতো নিজেদের শরীরের মধ্যেই নিজের খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে।' সম্ভবত সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল জাতীয় কোনও রঞ্জক পদার্থের গুণাবলির কথা বলা হয়েছে।

চিঠির মাঝামাঝি জায়গার লাইনগুলোতে রয়েছে ভেষজ উপাদানগুলির নাম ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি। কিন্তু কয়েকটা লাইন এত অস্পষ্ট যে, ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফিও কাজে আসছে না। কাল সকালে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করবেন। পুরো চিঠিখানির ভাষা উদ্ধার করতেই হবে, এমন সংকল্প করে পল চোখ বন্ধ করলেন।

বোধহয় পল ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু এক খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওঁর। কান ও মন সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু চোখকে কাজে লাগাতে পারছেন না। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়েছে। পল ভাবেন—তাঁবুর ভেতর কেউ ঢুকেছে নাকি। কোনও বন্য প্রাণী ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। কাছেই জঙ্গল। তবে, জঙ্গলে ভয়ংকর প্রাণী নেই। তাই রক্ষে। পল ইচ্ছাকৃত কাশির শব্দ করেন। জন্তু-জানোয়ার হলে পালাবে। কিন্তু খসখস শব্দটা হয়েই চলেছে। তবে কি তাঁবুতে কোনো মানুষ ঢুকেছে! তা হলেও হতে পারে। কোনও মতলবাজ হয়তো ওই মূল্যবান চিঠি চুরি করার জন্য ঢুকেছে। কেন-না, দিনেরবেলায় চিঠিখানি প্রথম দেখে কয়েকলাইন পড়ে পল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। আবেগ সংযত না-করতে পেরে অন্যান্যদের সামনে বলে ফেলেছিলেন চিঠির বিষয়বস্তুর কথা। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ লোভ সামলাতে পারেনি!

পল ভয় ও আশঙ্কায় উঠে বসেন। কান পেতে তাঁবুতে কারও অস্তিত্ব বোঝার চেষ্টা করেন। খসখস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এবার তিনি সাহসে ভর করে খাট থেকে নামেন। অনুমান করে এগোন টেবিলের কাছে। চেয়ারে একবার হোঁচট খেলেও সামলে নেন। টেবিলে হাত বাড়ান।

যাক! টেবিলের জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক আছে। তবে, অবাক হন একটা কথা ভেবে। যদ্দুর মনে পড়ছে শোওয়ার আগে টেবিলটা অগোছালো ছিল। এখন যেন কেউ টেবিলের জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখেছে! তাহলে নিশ্চয় ঘরে কেউ ঢুকেছিল! একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হত। এমন ভেবে তাঁবুর পর্দার কাছে এগোন। পর্দা তুলে দেখতে আগ্রহী হন অন্য কোনো তাঁবুতে আলো জ্বলছে কিনা! পর্দা তুলতেই হাড় হিম করা বাতাস ঢোকে তাঁবুর ভেতর। বাইরে প্রবল বাতাস বইছে। কোনো রাতচরা পাখি বিকট শব্দে ডেকে ওঠে। আচমকা সে শব্দে পল আঁতকে ওঠেন। তাঁবুর ভেতর মুখ ফেরাতেই চমকে ওঠেন। বাইরের ল্যাম্প পোস্ট থেকে আসা আবছা আলোয় দেখা যায় চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে একজন। শব্দ হচ্ছে খসখস খসখস। লম্বা আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন বৃদ্ধ মনে হল। মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি। খুবই শীর্ণকায়।

বাইরের ল্যাম্প পোস্ট থেকে আসা আবছা আলোয় দেখা যায় চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে একজন...

এবার বাস্তবিকই খুব ভয় পেয়ে যান পল। ঝটিতি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে পড়েন। দ্রুতপায়ে একটা সার্চলাইটের তলায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচুর আলো ওঁর মনের ভয়কে আস্তে আস্তে শুষে নেয়। উনি ভাবতে চেষ্টা করেন—দিনেরবেলায় এধরনের কোনো বৃদ্ধকে দেখেছেন কিনা! নাহ! এমন বিদঘুটে চেহারার কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। তবে কি ভুল দেখলেন! কোনো মানুষ হলে নিশ্চয় এতক্ষণ বেরিয়ে পালাত কিংবা আক্রমণ করত। কিন্তু তেমন কিছু তো...! তবে কি...! না ওসব উনি বিশ্বাস করেন না। তাহলে নিশ্চয় মনের ভুল। ঘুমের মধ্যে ওই চিঠির কথা। চিঠির লেখক ও প্রাপকের কথা অবচেতনে ভাবছিলেন বলেই হয় তো...!

এবার পল সাহস সঞ্চয় করে আবার তাঁবুর দিকে এগোন। উঁচু করা পর্দা তুলে ধরেন। ভেতরে আলো ঢোকে। না, আর তো দেখা যাচ্ছে না সেই বৃদ্ধটাকে। চেয়ার খালি। তাঁবুর ভেতর লুকোনোর মতো জায়গাও নেই! তবে কি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে! সেটাও সহজে সম্ভব নয়। তাঁবুর চারিধার শক্তপোক্ত করে আটকানো ; যাতে বন্যপ্রাণী না-ঢুকতে পারে। তা হলে নিশ্চয় চোখের ভুল। এমন ভেবে পল ক্যাম্বিশ খাটের কাছে চলে যান। উত্তেজনা, ভয়, সন্দেহ মিলেমিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি ওঁর মনে। একটু ইতস্তত করে খাটে উঠে আবার শুয়ে পড়েন। খসখস শব্দটা আর নেই। তবুও কান খাড়া করে চোখ বুজে শুয়ে থাকেন পল।

একসময় ভোর হয়। ঘুম ভাঙে প্রকৃতির। তাঁবুর অদূরে বার্চ ও বলসমগাছ দুটো যেন জেগে উঠেছে সকলের আগে। বার্চের ডালে কোথাও একটা রেনপাখি লুকিয়ে বসে আপন খেয়ালে প্রভাতি সংগীত গেয়ে চলেছে। বলসমগাছের পাতার ঝোপে বসে কোনো এক চিকাডিপাখি। তার কালোটুপি-পরা মাথা একটু দুলিয়ে ঠোঁট উঁচু করে টানাটানা সুরে ডেকে চলেছে চি-কা-ডি চি-কা-ডি...। যেন বলছে—ওয়েক আপ প্লিজ—ওয়েক আপ প্লিজ...।

পল উঠে বসেন। ভোরের আলো তাঁবুর ভেতরের অন্ধকারকে হঠিয়ে দিয়েছে। পলের চোখ টেবিলে। যাক সব ঠিকঠাক আছে। ওই যে অদ্ভুত চিঠিখানা। তার পাশে পেনসিল। ইরেজার, শার্পনার, লেন্স অন্যান্য যন্ত্রপাতি। শুধু চেয়ারটা টেবিল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা। যেন টেবিলের সঙ্গে খুনসুটি করে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। চেয়ারখানা দেখে কাল রাতের সেই টাকমাথা দীর্ঘকায় বৃদ্ধর কথা মনে পড়ে। আপন মনেই হেসে ওঠেন পল। তিনি যে এমন ভিতু, তা আগে জানতেন না। পায়ে পায়ে উনি চেয়ারের কাছে যান। চেয়ার সরিয়ে এনে টেবিলের পাশে বসেন। স্বাভাবিকভাবেই চোখ যায় দীর্ঘ চিঠিখানার দিকে। আজ যেভাবেই হোক এ চিঠির মর্মোদ্ধার করতেই হবে। এই ভেবে টেনে নেন চিঠিখানা। চিঠিতে চোখ বুলিয়েই চমকে ওঠেন। আশ্চর্য! চিঠির অস্পষ্ট অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে। নতুন করে কেউ লিখে দিয়েছে যেন! এখন চিঠির মাঝখানের লাইনগুলোও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে—প্ল্যানটোনাইস অ্যামিকাস দাও ওয়াইল্ট মিহি ডোয়েস্ট ডি ভেইন অসট্রিয়া...।

বার্চের ডালে কোথাও একটা রেনপাখি লুকিয়ে বসে আপন খেয়ালে প্রভাতি সংগীত গেয়ে চলেছে...

হতবাক হয়ে যান পল। এ কী করে সম্ভব। দু-হাজার বছর আগে লেখা চিঠি.....। তবে কী কাল রাতের সেই বৃদ্ধটা...! চিঠির শেষে পত্রলেখকের নামটাও কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন সদ্য খোদাই করে কালি লাগানো হয়েছে শব্দ তিনটিতে—ভেল ফ্রেটার! লুসিয়াস।

আশ্চর্য! 'লুসিয়াস' নামটা আগে থেকেই চিঠিতে লেখা ছিল। কিন্তু 'ভেল ফ্রেটার!' অর্থাৎ 'বিদায় ভাই!' একথাটা লেখা ছিল না তো!

পল হতবাক হয়ে চেয়ারে বসে থাকেন। এমন সময় বাইরে অ্যাসপেনগাছটাতে একঝাঁক কোয়েৎজাল পাখি উড়ে এসে বসে। তাদের লম্বা সবুজ পালকে ভোরের আলো চিকচিক করতে থাকে। পেটের দিকের

টুকটুকে লাল রং যেন আরও খোলতাই হয়েছে। পাখিগুলো অকারণে কিচিরমিচির করে কত কথা বলতে থাকে।

সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

একবার স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ভাঙার পর মা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে আর কোনোদিন দু-চাকার গাড়ি চালাব না। তারপর থেকেই আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির খোঁজ করছিলাম। অনেককে বলেও রেখেছিলাম। রবিবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করতাম।

একদিন সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক। নাম বললেন তুষার সামন্ত। জিজ্ঞেস করলেন আমার গাড়ি কেনা হয়ে গেছে কিনা। আমি 'না' বলাতে উনি বললেন, ''আমার গাড়িটা আমি বিক্রি করে দিতে চাই। আপনি একবার আমার গাড়িটা দেখুন।''

ভদ্রলোক অচেনা। তাই আমি ওনার ব্যাপারে প্রথমেই একটু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করে বললাম, ''আমার খবর আপনি কোথার থেকে পেলেন?''

—''ভোম্বল আমার গ্যারাজের মেকানিক। অনেকের মতো ওকেও আমি জানিয়ে রেখেছিলাম আমার প্রয়োজনের কথা।"

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, ''ঠিক আছে, আপনি আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর দিন, একদিন আমি গিয়ে দেখে আসব আপনার গাড়ি।''

—''আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। গাড়িটা আমি চালিয়েই এনেছি। আপনার বাড়ির সামনেই আছে। আপনি বাইরে আসুন, এখনই দেখে নিন।''

আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। গাড়ি বিক্রি করার জন্য কেউ গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে সম্ভাব্য খদ্দেরের বাড়িতে চলে আসে না। তা ছাড়া আমার আরেকটা অসুবিধাও ছিল। ড্রাইভিং স্কুলে আমি গাড়ি চালানো শিখে লাইসেন্স পেলেও চার চাকা চালাতে আমি সেরকম পটু নই, চার চাকার ব্যাপারে সেরকম জ্ঞানগম্যিও নেই। আমার মনে পড়ল পাড়ার বন্ধু অসীমের কথা, গাড়ি সম্পর্কে ওর অসাধারণ জ্ঞান, ভদ্রলোককে চা দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বললাম, অসীমকে ফোন করলাম এবং ভাগ্যগুণে ওকে পেয়েও গেলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে অসীম চলে এল আমাদের বাড়ি।

আমাদের পাঁচিল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা...

অসীমকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম গাড়িটা দেখতে। আমাদের পাঁচিল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। মেটে লাল রং চকচক করছে। গাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখলাম গাড়িটার বডিতে একটা আঁচড়েরও দাগ নেই। ভদ্রলোক অত্যন্ত যত্নে রেখেছেন গাড়িটা। শুধু চারটে চাকার মধ্যে একটা চাকার ক্যাপ নেই। এত যত্নে রাখা নিঁখুত এই গাড়িটার এই একটাই বিসাদৃশ্য। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাস করতে উনি বললেন, "কয়েকদিন আগে ক্যাপটা ঢিলে হয়ে খুলে পড়ে গেছে। একটা সিঙ্গল ক্যাপ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিনতে হলে চারটেই কিনতে হবে। আজ কিনব, কাল কিনব করে কেনা আর হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া ক্যাপেরতো কোনো ফাংশন নেই, ওটা চাকার ডেকরেশন মাত্র। আপনারা আসল জিনিসটা দেখুন। চালিয়ে দেখুন গাড়ির ইঞ্জিনটা কেমন।"

তুষারবাবু অসীমের দিকে গাড়ির চাবিটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি সামনে অসীমের পাশে বসলাম। পিছনে তুষারবাবু। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে অসীম গাড়ির এসিটা চালিয়ে দিল। আমি এতদিনে অসীমের কাছে কিছু কিছু ফান্ডা পেয়েছি। তার একটা হল এসির লোড নিয়ে গাড়িটা কেমন চলে দেখে বোঝা যায় ইঞ্জিনের কন্ডিশন কেমন।

এসিটা সত্যিই আরামদায়ক। বরং আমার একটু শীত শীত করছিল, অসীম তখন ছোটোখাটো গাড্ডায় চাকা ফেলে দেখে নিচ্ছে গাড়ির সাসপেনশন কীরকম। এসির ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গাড়ির পারফিউমের সুন্দর একটা গন্ধ নাকে আসছিল। তার মধ্যে অসীম চালিয়ে দিল গাড়ির মিউজিক সিস্টেমটা। অসীমবাবুর রুচি ভালো। হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বাঁশির মূর্ছনায় স্বর্গীয় হয়ে গেল গাড়ির ভেতরটা। অসীম আমাকে এক ফাঁকে ছোট্ট একটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল গাড়িটার কন্ডিশন দুর্দান্ত।

গাড়িটার ট্রায়াল রান শেষ করে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। অসীম তুষারবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার গাড়ির কন্ডিশন এত ভালো, আপনি গাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছেন কেন?"

—"একদম নিরুপায় হয়ে বিক্রি করছি। আমি ট্রান্সফার হয়ে নিউ ইয়র্ক চলে যাচ্ছি। সামনের সপ্তাহেই আমাকে চলে যেতে হবে। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকি। গাড়িটা রেখে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে।"

অসীম ভদ্রলোকের জরুরি প্রয়োজনটার সুযোগ নিয়ে বলল, "আমরা কিন্তু এক লাখ দিতে পারব।"

ভদ্রলোক এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমি বেঁকা চোখে অসীমের দিকে তাকালাম। এককথায় রাজি হওয়াতে ওর ভুরু দুটোও কুঁচকে আছে। গম্ভীর গলায় বলল, "কোনও গণ্ডগোল নেইতো?"

—"মোটর ভেইকেলসে, পুলিশের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করে নিন। পুরো খোঁজ খবর পেলে তবেই আমাকে টাকা দেবেন।"

ওনার শর্তে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তবে তারপরে আরও একটা অবাক করে দেওয়া প্রস্তাব দিলেন উনি।

—"সব যখন পাকা কথা হয়েই গেল, গাড়িটা আজ থেকে আপনার কাছেই থাক।"

আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠলাম, "না, না, তা হয় না। আগে আপনাকে টাকা দিয়ে ওনারশিপ নিই।"

তুষারবাবু ম্লান হেসে বললেন, "খুব অবাক হচ্ছেন তাই না? সত্যি কথা বলব? গাড়িটা আমার ভীষণ প্রিয়। আমি তো জানি আপনারা খোঁজখবর করে কোনও গণ্ডগোল পাবেন না। আর গাড়িটাও আপনার হয়ে যাবে। একবার যখন মনস্থ করে ফেলেছি যে গাড়িটা আপনাকে বিক্রি করে দেব তখন আর চোখের সামনে গাড়িটা রেখে মন খারাপ বাড়াতে চাই না।"

তুষারবাবুর জোরাজুরিতে রাজি হয়ে গেলাম, আসলে নিজের ভেতরেও ঝাঁ চকচকে গাড়িটা পাওয়ার একটা উত্তেজনাতো ছিলই। অসীম বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। তুষারবাবুকে বাড়িতে নামিয়ে আসার অছিলায় ওর বাড়িতেই নিয়ে গেল আমাকে। বাড়িতে দেখলাম তুষারবাবুর স্ত্রী আর ছোট্ট এক ছেলে আছে। ফেরার সময় তুষারবাবুর পাড়ার এক পানের দোকান থেকে অসীম কায়দা করে খোঁজ নিয়ে নিল, গাড়িটা তুষারবাবুরই। রোজ সকালে উনি গাড়িটা চেপে ছেলেকে স্কুল যাওয়ার বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে অফিস যান আর সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরেন।

বাড়ি ফিরেই আমি চিৎকার করে মাকে বললাম, "মা গাড়ি কেনা হয়ে গেছে, শিগ্গি দেখবে এসো।" এরকম দুম করে সন্ধেবেলায় গাড়ি কেনা হয়ে গেল দেখে মা-বাবাও খুব অবাক হল। অসীম মা-বাবাকে দু-চক্কর গাড়িটায় ঘুরিয়েও দিল, আমার মতো মা-বাবারও খুব পছন্দ হয়ে গেল গাড়িটা। তবে মা বলল, "আগে তুষারবাবুকে পুরো টাকাটা দে, তারপরে মন্দিরে পুজো দিয়ে গাড়িটা চাপবি।"

খুব খুশি খুশি মনে ঘুমোতে গেলাম। উত্তেজনায় রাত্রে প্রথমে ঘুমই আসছিল না। তারপর ঘুমিয়ে পরেই এক সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর চাবি দিয়ে পেছনের ডিকিটা খুললাম। ডিকির মধ্যে 'দ' করে রাখা আছে একটা লাশ। লাশটার চোখটা বন্ধ ছিল। হঠাৎ পট করে খুলে গেল চোখটা। ফ্যাকাসে মুখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে বড়ো বড়ো চোখ করে আমার দিকে চেয়ে থাকল লাশটা।

আমার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোচ্ছিল। পাশের ঘর থেকে ঘুম ভেঙে মা-বাবা উঠে এল। ঝাঁকিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না লজ্জায় আমি কী স্বপ্ন দেখেছি। মা আমাকে জল খেতে বলল। জল খেয়ে লজ্জারও মাথা খেলাম আমি। মাকে বললাম রাত্রে আমার পাশে শুতে।

মা পাশে শোওয়াতে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। তবে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল একটা ভয়। গাড়িটার সব দেখা হলেও ডিকিটাতো দেখা হয়নি। অসীম কি দেখেছে? ও সাধারণত দেখে নেয় স্টেপনির কন্ডিশন কেমন, জ্যাকট্যাক ঠিকঠাক আছে কিনা। ভীষণ ইচ্ছে করছিল অসীমকে একবার ফোন করতে। কিন্তু ঘড়িতে রাত্রি দুটো চল্লিশ দেখে অসীমকে আর ফোন করলাম না। অনেকক্ষণ ঘুম না-এলেও শেষপর্যন্ত ভোরের দিকে ঘুমিয়ে গেলেও আর কোনও দুঃস্বপ্ন দেখলাম না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রথমেই গাড়ির চাবিটা নিয়ে নীচে নেমে এলাম। একটা দমবন্ধ উত্তেজনা নিয়ে গাড়ির ডিকিটা খুললাম। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম, না! ডিকিতে কিচ্ছু নেই। খুব খুঁটিয়ে ডিকির ম্যাটটা দেখলাম। কোনো রক্তের দাগটাগও নেই। বুকের ভেতর থেকে ভারি বোঝাটা নেমে গেল। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে গাড়িটা। সত্যিই আশাতীত কমদামে দুর্দান্ত একটা গাড়ি এসেছে হাতে।

অফিসে এসে সকালের কাজের ধাক্কাটা সামলেই অসীমকে ফোন করলাম, ''মা কিন্তু বারবার বলে দিয়েছে আজ একটা পুজো দিতে। তোকে ছাড়াতো গতি নেই।''

অসীম আমাকে ঠেস দিয়ে বলল, ''তুই ড্রাইভিংটা কীজন্য শিখেছিস বলতো? আগে না-হয় তোর গাড়ি ছিল না, কিন্তু এখনতো........''

—''তোকে ছাড়া গতি নেই। কারণ ড্রাইভিংটা প্র্যাকটিস করতে হলে তোকে দরকার। আর গাড়িটাতো এখনও কেনাই হয়নি। তুই পুলিশের কাছ থেকে খোঁজখবর না-এনে দিলে...''

—''ভালো মনে করিয়ে দিয়েছিস। দাঁড়া আমি এখনই শান্তিদাকে বলছি'' তবে তুইও একটা কাজ কর। ভোম্বলের গ্যারেজ থেকে তুষারবাবু সম্পর্কে একটু খোঁজখবর কর।''

কথাটা শুনে আমার একটু খটকা লাগল। অসীম একথাটা কেন বলল, আমার গলাটা শুনে অসীম বলল, ''না, আসলে অনেক অ্যাক্সিডেন্টের রেকর্ডতো পুলিশের কাছে থাকে না। গাড়ির মেকানিকরা বলতে পারে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল কিনা। দরকার হলে ভোম্বলকে ডেকে একবার গাড়িটা দেখিয়ে নে।''

আমার মনে খচখচানিটা আবার শুরু হয়ে গেল। ফোনটা কেটে দেওয়ার আগে আমি অসীমকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাল রাত্রে তুই কোনো স্বপ্ন দেখেছিস অসীম?''

অসীম গম্ভীর গলায় বলল, ''দেখেছি, তোর নতুন গাড়িটায় চাপিয়ে তুই আমাকে 'আমার বাংলা'-য় খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিস।'' হো হো করে হেসে উঠল অসীম। অসীমের ইয়ার্কিতে কিন্তু আমার মনের খচখচানিটা দূর হল না। অফিস থেকে একটু আগেই বেরিয়ে আমি সোজা চলে গেলাম ভোম্বলের গ্যারাজে।

—''তুষারবাবুর মতো সজ্জন লোক আর দুটো হয় না''। ভোম্বল তুষারবাবুকে দরাজ হাতে সার্টিফিকেট দিয়ে বলল, ''ওনার গাড়িটার মতো গাড়ি হয় নাকি? চারবছর হতে চলল। মনে হবে গেল মাসেই শোরুম থেকে কিনেছেন। শুধু বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি— এর বাইরে কোথাও যেতেন না। কতবার বলেছি একবার লং ড্রাইভে দিঘা ঘুরে আসুন বউদি আর ছেলেকে নিয়ে।''

আমি আবার নতুন করে আশ্বস্ত হলাম। এবার শুধু অসীমের পুলিশের রিপোর্টটা দরকার। উত্তেজনায় অসীমকে ফোন করেই মৃদু ধমক খেলাম।

—''দাঁড়া, এটা কী ট্রেনের টাইমের এনকোয়ারি নাকি? জিজ্ঞেস করলাম আর টুক করে বলে দিল। শান্তিদার শালা দুটো দিন সময় চেয়েছে।''

সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরতে প্রথমেই চোখে পড়ল গাড়িটা। মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস কাজ করছে, এ-গাড়িটার মালিক আমি না-হয়ে আর যাই না। তবে বাড়ি ফিরতেই মা দু-কথার পর তাড়া দিল, ''কীরে গাড়িটা পুজো দেওয়ার ব্যাপারে কী করলি?''

—''অসীমকে বলেছি মা, সবাই মিলে গিয়ে একদিন পুজো দেব।''

পরের দিন রাত্রে আমি কোনো স্বপ্ন না-দেখলেও হঠাৎ একটা আচমকা শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। আজও সেই গভীর রাত্রি। আড়াইটে। আওয়াজটা মনে হল গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। আর সেটা আমাদের বাড়ির কম্পাউন্ডের ড্রাইভ থেকে। তার মানে আওয়াজটা হল আমার হাতে চলে আসা গাড়িটার থেকে? চট করে আমার মনে পড়ে গেল অসীম সাবধান করে দিয়েছিল, গাড়ির মিউজিক সিস্টেমটা খুলে রাখতে। আজকাল চোরের খুব উপদ্রব হয়েছে। মিউজিক সিস্টেমটা ডিট্যাচ করতে বেমালুম ভুলে গেছি। শিরদাঁড়া টান টান করে আমি দোতলার জানলার একপাশে চলে এলাম। এই জানলা দিয়ে দেখা যায় গাড়িটা। চোরেদের যাতে চোখে না-পড়ে যায় তাই জানলার একপাশ চেপে পর্দাটাকে অল্প ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একাট স্রোত নেমে গেল। গাড়ির সামনের চাকায় ঠেস দিয়ে বসে আছে সেই লোকটা, যার লাশটাকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। সেই বড়ো বড়ো চোখগুলো সরাসরি চেয়ে আছে আমার চোখের দিকে।

কোনোরকমে চোখ বন্ধ করে মায়ের ঘরে চলে এলাম। মাকে আর কিছু বললাম না। মাকে ঠেলেঠুলে অল্প জায়গা করে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে উঠে ঠিক করলাম, মায়ের কথা শুনে আজ পুজোটা দিয়েই আসব, বিশ্বাস করি বা না-করি গাড়িটার সঙ্গে একটা অশুভ কিছু ব্যাপার আছে। অফিসে এসে কাজ গুছিয়েই প্রথমে অসীমকে ফোন করলাম। ফোনটা ধরে অসীম প্রথমেই বলল,—''তোকে এক্ষুনি ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শান্তিদা ওনার শালার কাছ থেকে খবর পেয়ে গিয়েছে। তোর গাড়িতে কোনও কেস নেই। একদম ক্লিয়ার।''

অসীমকে দু-রাত্রির অভিজ্ঞতা কিছু বললাম না। ও বিশ্বাস করবে না। আমার পেছনে লাগবে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম, ''ঠিক আছে। আজকে অফিসের পর তুই চলে আয়। তুষারবাবুকে চেকটা দিয়ে সেল ডিডটা সই করিয়ে নেব। তারপর গাড়িটা নিয়ে মন্দিরে পুজো দেব। আর তোর দেখা স্বপ্ন পূরণ করিয়ে দেব। মানে রাত্রে বাইরে একসঙ্গে ডিনার।''

''তথাস্তু!'' অসীম খুশি খুশি মনে ফোনটা ছেড়ে দিল। আমিও ক্রমশ অফিসে সব কাজের চাপে রাতের আতঙ্কটা ভুলে গেলাম। কিন্তু বিকেলবেলায় সব পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে গেল, অসীমের একটা ফোন পেয়ে।

—''সমু, একটা প্রবলেম হয়ে গেছেরে। আমাকে আজ রাত্রের ট্রেনে আমার বসের সঙ্গে ভুবনেশ্বর চলে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ করে ঠিক হয়েছে। সেলসের একটা আর্জেন্ট ব্যাপার আছে। ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছে চার-পাঁচ দিন লেগে যাবে।''

আমি প্রমাদ গুনলাম। তাহলে? অসীম ছাড়াতো গতি নেই। গাড়িটা চালাবে কে? পুজো দেওয়ার কী হবে? মুহূর্তের মধ্যে রাত্রের দেখা সেই দুটো বড়ো বড়ো নিষ্পলক চোখ মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ভয়ংকর চোখদুটো ভুলতে আমি অফিসের চারিদিকের জিনিসপত্তর দেখতে আরম্ভ করলাম। আর মনে মনে ভাবতে থাকলাম কী উপায় করা যায়? তখনই মনে পড়ল ভোম্বলের কথা।

ভোম্বলের মোবাইল নম্বরটা সঙ্গেই ছিল। ভোম্বলকে ফোন করে বললাম, ''ভোম্বল, সন্ধেবেলায় একটা ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিবি?''

ভোম্বল একটু চিন্তা করে বলল, ''ঠিক আছে। একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটার নাম রাজা।''

সন্ধে পেরোতেই বাড়ি ফিরে এলাম। গেট পেরিয়ে ড্রাইভে ঢুকতেই দেখলাম গাড়িটা ল্যাম্পপোস্টের আলোয় চকচক করছে। আর একটা ফেদার ডাস্টার দিয়ে খুব যত্ন করে গাড়িটা পরিষ্কার করছে রোগা মতো একটা ছেলে। আমি এগিয়ে যেতেই ছেলেটা খুব বিনীত গলায় আমাকে বলল, ''ভোম্বলদা আমাকে পাঠিয়েছে।''

আমি ব্যাগ থেকে দশ টাকা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বললাম, ''তুমি একটু চা খেয়ে এসো। আমি গা ধুয়ে পোশাকটা ছেড়েই আসছি।''

বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম বারুইপুর থেকে অঞ্জলি কাকিমা এসেছেন। এই কাকা-কাকিমা প্রায় আসেনই না, তাই বাবা-মাকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দেওয়ার যে পরিকল্পনাটা ছিল সেটা বাতিল করতে হল। তবে মাকে আলাদা করে ডেকে বললাম, ড্রাইভার ডাকা হয়ে গেছে। বাইরে অপেক্ষা করছে। তুষারবাবুকে চেকটা আর পুজোটা দিয়ে আসি, অসীম ফিরে এলে আরেকবার না-হয় সবাই মিলে মন্দিরে যাবে।

তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাজা ড্রাইভ থেকে রাস্তায় গাড়িটা বের করে জানতে চাইল, ''কোথায় যাব স্যার?''

আমি তুষারবাবুর বাড়ির ঠিকানাটা বললাম। রাজা দেখলাম বেশ চৌকস ছেলে। শান্ত চুপচাপ হলে কী হবে, রাস্তার ডাইরেকশন সব জানে। কাউকে জিজ্ঞেস না-করে একদম নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল তুষারবাবুর বাড়ির সামনে। কিন্তু গোল বাঁধল অন্য জায়গায়। তুষারবাবুর দরজায় তালা ঝুলছে। তাড়াহুড়োতে মোবাইলটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। ভদ্রলোক কখন ফিরে আসবেন জানার উপায় নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক করলাম মন্দিরে পুজোটা দিয়ে আসি। ফেরার পথে না-হয় আরেকবার খোঁজ করব তুষারবাবুর। গাড়িতে ফিরে এসে রাজাকে বললাম, ''লেক কালীবাড়ি।''

রাজার কলকাতার রাস্তাঘাট সম্পর্কে জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম। অনায়াসে এগলি-ওগলি করে গল্ফগ্রিনের রাস্তাটা ধরল। কিছুটা এগোতেই রাস্তাটা একদম ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল। আমি দেখলাম এ রাস্তাটা আমার চেনা। সেদিন অসীম এই রাস্তাটাতেই আসতে চেয়েছিল আর তুষারবাবু প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন। আমি রাজাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''এটা দিয়ে কী তাড়াতাড়ি হবে?'' কিন্তু রাজা কোনো উত্তর দিল না।

একদম জনমানবশূন্য রাস্তা। কলকাতার রাস্তা রাত্রি আটটায় এরকম ফাঁকা একটু অস্বাভাবিক। রাস্তার আলোগুলোও টিমটিমে। দিব্যি চলছিল গাড়িটা। হঠাৎ কতকগুলো কুকুর প্রচণ্ড জোরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল গাড়িটার দিকে। স্কুটার চালাতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে। কুকুর তেড়ে এলে স্কুটার থামিয়ে দিয়ে কড়া গলায় ধমকে উঠলে ওরা পিছু হটে যায়। আমি রাজাকে বললাম, ''গাড়িটা একটু থামাও।''

এই প্রথম রাজা দেখলাম আমার কথা শুনল না। উলটে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। কুকুরগুলো দৌড়োতে দৌড়োতে ধাওয়া করেছে আমাদের গাড়িটা। ওদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আমার প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছিল। আমি রাজার ওপর রেগে উঠলাম, ''কী হচ্ছে রাজা? গাড়িটা থামাও না।''

ক্যাঁচ করে রাজা গাড়িটার ব্রেক কষল। তারপরে একটা অপ্রত্যাশিত কাজ করল। গাড়ির স্টার্টটা বন্ধ করে দিয়ে আমার দিকে একবারও না-তাকিয়ে চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করল।

আমি পড়লাম মহাবিপদে। প্রচণ্ড বিরক্ত হলাম ভোম্বলের ওপর। এই খুব ভালোছেলের নমুনা? সঙ্গে মোবাইল নেই, গাড়ি প্রায় চালাতেই জানি না আর ছেলেটা এই জনমানবশূন্য জায়গায় ছেড়ে পালাল!

কুকুরগুলো সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে। প্রায় গোটা গাড়িটা ঘিরে ধরেছে। কোথাও ওদের পাগুলো বনেটের ওপর কোথাও জানলার কাচে আঁচড়াচ্ছে। এটা আরেকটা বিপদ। গাড়ি থেকে নামারও কোনও উপায় নেই। কোনোরকমে আমি ড্রাইভিং সিটে এলাম। ভাবলাম হর্ন বাজালে কুকুরগুলো যদি সরে বা হর্নের আওয়াজ শুনে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু কোনো লাভ হল না। কুকুরগুলো যে চিৎকার করছিল সেই চিৎকারই করতে থাকল। আমি অসহায়ের মতো বসে রইলাম।

হঠাৎ দেখি কুকুরগুলোর ডাকগুলো সব পালটে গেল। সেই হিংস্র ডাকগুলো কেমন কুঁই কুঁই করে ডাক হয়ে গেল। কয়েকটা কুকুর সুর করে কেঁদে উঠল। আর সেই সময়ই আমার চোখে পড়ল লুকিং গ্লাসটায়। বুকের মধ্যে থেকে হৃৎপিণ্ডটা মনে হল বেরিয়ে আসবে। আয়নায় দেখলাম পেছনের সিটে বসে আছে সেই লোকটা। আয়না দিয়ে বড়ো বড়ো নিষ্পলক দৃষ্টিতে সোজা চেয়ে আছে আমার দিকে।

বাইরের কুকুরগুলোর ভয় তুচ্ছ মনে হল। কোনোরকমে গাড়ি থেকে নেমে এলাম আমি। গাড়ির যা হয় হোক। কোনোদিকে না-তাকিয়ে সোজা হাঁটতে থাকলাম আমি। সবে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে জ্বলে উঠল গাড়ির হেড লাইটটা সেই আলোয় আমি দেখলাম রাস্তার ধারে চকচক করছে থালার মতো একটা জিনিস। আমি মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই পেছন থেকে বেজে উঠল হর্নটা। বার দুয়েক এরকম হওয়ার পর আমার মনে হল, আরে এটা গাড়ির চাকার হাফ ক্যাপটা নয়তো? একটা ঝোপের পাশে পড়ে আছে।

খুব ভয় পেয়ে গেলে বোধহয় অদৃশ্য শক্তি পরিচালনা করে। পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলাম। যে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছিল তারা সব দৌড়ে কোথায় যেন পালিয়ে মিলিয়ে গেল। নীচু হয়ে আমি হাফ ক্যাপটা তুলতে যাব হঠাৎ শুনি একটা কেঁউ কেঁউ করে ক্ষীণ আওয়াজ। ঝোপটার মধ্যে দেখলাম একটা ছোট্ট কুকুর ছানা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে।

হোক না কুকুরছানা। একটা প্রাণতো। কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে নিলাম। নরম তুলতুলে গা আর শরীরের ধুকপুকানিটা আমাকে কীরকম যেন একটা সাহস জোগাল। আমার মনে হল, আমি যেন আর ঠিক একা নই। গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার সাহস পেলাম। গাড়িতে ফিরে এসে সিটের ওপর ওকে বসিয়ে মা দুর্গা বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম এবং দেখলাম দিব্যি গাড়িটা চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারলাম।

বাড়িতে ফিরে ড্রাইভে গাড়িটা ঢুকিয়ে কুকুরছানাটাকে কোল থেকে ড্রাইভে নামালাম। এবার খেয়াল করলাম কুকুরছানাটার পেছনের একটা পায়ে চোট আছে। হাঁটতে পারছে না। আমি আবার ওকে কোলে তুলে নিলাম। দরজা খুলে কুকুরছানা কোলে নিয়ে আমাকে দেখে মা খুব বকাবকি আরম্ভ করে দিল, ''তোর কী আক্কেল বুঝি না। মোবাইলটা ফেলে গেছিস। তারওপর দুটো ড্রাইভারকে আসতে বলেছিস। ভোম্বলের গ্যারাজ থেকে রাজা বলে একটা ড্রাইভার এসে এই এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে গেল......''

আমি মাকে বকাঝকা শেষ না-করতে দিয়ে বললাম, ''শিগগির খানিকটা গরম দুধ দাও। বেচারির মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে।''

মা-র অবশ্য রাগতে যতক্ষণ, ঠান্ডা হতেও ততক্ষণ। কুকুরছানাটাকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মা আদর করে নাম দিয়ে দিল ভোলা। আমার খাটের তলায় মা কাঁথা দিয়ে ভোলার বিছানা করে দিল। কুণ্ডলী পাকিয়ে ভোলা দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল বিছানাটায়।

রাত্রি আড়াইটেয় আবার ঘুম ভেঙে গেল। এবার আর কোনো স্বপ্ন দেখে নয় বা গাড়ির দরজার আওয়াজ শুনে নয়। হঠাৎ শুনি ভোলা কুঁই কুঁই করে ডাকছে। বেডল্যাম্পটা জ্বালিয়ে প্রথমেই খাটের তলাটা দেখলাম। ভোলার বিছানাটা ফাঁকা। তারপরেই দেখলাম ভোলা লাফিয়ে লাফিয়ে জানলাটায় ওঠার চেষ্টা করছে। আমার দমটা আবার গলার কাছে আটকে এল। কিছুতেই বাইরে তাকাব না তাকাব না করেও জানলার পর্দাটা অল্প ফাঁক করে বাইরে তাকিয়েই ফেললাম। নীচে চাঁদের আলোয় চকচক করছে গাড়িটা। আর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা। বড়ো বড়ো নিষ্পলক চোখ। তবে আজ যেন চোখের ভাষাটা নরম। মাথার

থেকে টুপিটা খুলে আমাকে অভিবাদন জানাল লোকটা তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বন্ধ গেটটা খুলে অনায়াসে চলে গেল।

কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে নিলাম...

এরপর আমি আর কোনোদিন দেখতে পাইনি লোকটাকে। ভোলাকে পরের দিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার ওর পায়ে ব্যান্ডেজ করে ওষুধ দিয়ে দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ভোলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়ে লাফালাফি করতে আরম্ভ করল।

কয়েকদিন পর একদিন সন্ধেবেলায় তুষারবাবু এলেন। আমি এতদিন অপেক্ষাই করছিলাম তুষারবাবুর জন্য। গাড়ির চেকটা দিতে হবে। আমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু না-বলে দু-এক কথার পর চেকটা আনতে

উঠতে যাব, এমন সময় কুঁই কুঁই করে আমার পায়ের কাছে এল ভোলা। আর ভোলাকে দেখেই ভীষণ চমকে উঠে তুষারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই কুকুরছানাটা কতদিন আছে আপনার বাড়িতে?"

এবার আর চেপে যাওয়ার মানে হয় না। আমি সব খুলে বললাম তুষারবাবুকে। তুষারবাবু সব শুনে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "একদিন বাড়ি ফেরার খুব তাড়া ছিল। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিও পড়ছিল। আমি সচরাচর জোরে গাড়ি চালাই না। সেদিন কবরস্থানের কাছ দিয়ে সর্টকাট রাস্তা নিয়ে একটু জোরেই গাড়িটা চালিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ রাস্তার মধ্যে চলে এল এই কুকুরছানাটা। জোরে ব্রেক কষে ওকে চাকার তলায় যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারলেও, অল্প চোটের হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি। আমার নেমে দেখা উচিত ছিল, হয়ত কুকুরছানা বলে দেখিনি। জোরে ব্রেক করার ঝাঁকুনিতে কোনওভাবে চাকার হাফ ক্যাপটা পড়ে গিয়েছিল। দেখলাম রাস্তার পাস থেকে একটা লোক উদয় হয়ে আমার হাফ ক্যাপটা নিয়ে আমাকে জ্বলন্ত চোখে কিছু বলতে চাইছে। আমি আরও ঘাবড়ে গিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপরে ওই লোকটাকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম। কুকুরছানাটাকে কোলে নিয়ে জ্বলন্ত চোখে আমাকে কী যেন বলতে চাইছে। আর গাড়িটা নিয়ে আমি বেরলেই কিছু-না-কিছু বিপত্তি হত। তাই গাড়িটা বিক্রি করে দেব ঠিক করলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি বহুকাল আগে ওই রাস্তাটায় এক ভবঘুরে থাকত। লোকটা কুকুরদের খুব ভালোবাসত। নিজে খেতে পাক বা না-পাক, রোজ রাস্তার কুকুরদের বিস্কুট খাওয়াত। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে সে মারা যায়। ভূতে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবুও ...... স্যরি, গাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার আসল কারণটা আপনাকে বলা উচিত ছিল......।"

আমি ভোলাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, "আমার মনে হয় আর কেউ আপনার স্বপ্নে আসবে না আর আপনার গাড়িটাও আমার হাতে খুব ভালো থাকবে। বসুন আপনি। আপনার চেকটা নিয়ে আসি।"

এহসানের বাপ

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

রাতে শুতে যাবার সময় অপু বলেছিল, শিয়রের কাছে জানালাটা রাতে আর খুলিস না ধীরেন। পর্দাটাও সরাস না। তারপর কেমন একটু অপ্রস্তুত মুখ করে ব্যাখ্যাটাও দিয়েছিল—ওদিকটাতে খোলা মাঠ আছে। চোর-ছ্যাঁচোড় কখন উঁকি মারে! এখানটা এখনো তো বেশ ফাঁকা ফাঁকাই আছে।

কথাটা অবশ্য ঠিকই। ইউনিভার্সিটিটা চালু হয়ে গেছে আজ বছর তিন হল, তথাপি লোকজন এখনো বিশেষ বাড়েনি এখানে। দিনেরবেলা ছাত্রছাত্রীর ভিড় থাকে বটে, কিন্তু সূর্য ডুবলে এখনও শুনশান।

বছর দশেক আগেও যখন এদিক দিয়ে কখনো বাসেটাসে করে গেছে, দেখত শুধু হা হা করছে রুক্ষ, উঁচুনীচু মাঠ। প্রায় দিগন্তের কাছে আকাশসীমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত জেলখানাটা। কুখ্যাত হারিয়া জেল। ব্রিটিশ আমলে একে বিহারের সেলুলার জেল বলা হত। গোটা এলাকার সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের ঠিকানা হত এইখানে। তা ছাড়াও স্বদেশিদের মধ্যে যাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হত, তাদের আন্দামানে পাঠাবার সুবিধে না-থাকলে এই হারিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারত সরকার।

তারপর, কিছুকাল পর একবার অপুর কাছে ঘুরতে এসে হঠাৎ দেখে, যেন ভোজবাজির মতোই ভোল পালটাতে শুরু করে দিয়েছে জায়গাটা। ফাঁকা, শুনশান মাঠের মধ্যে ইট-পাথরের স্তূপ, ট্রাক, সিমেন্ট মিক্সার আর রোড রোলারের ঘন ঘন আনাগোনা। দুপুরবেলা তার পাশ দিয়ে আসতে আসতে গাড়ি থামিয়ে সেই দিকে দেখিয়ে অপু বলেছিল, 'ওই দ্যাখ। আমাদের ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যামপাস তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। আর বড়োজোর এক বছর, বুঝলি? তারপর আর ওই শহরের মধ্যে ঘিঞ্জি বাড়িটাতে রোজরোজ ক্লাস করতে যেতে হবে না। এইখানে, ফাঁকায় ফাঁকায় বেস তপোবন স্টাইলে...'

...তারপর, অপু যেমনটা করে, গাড়ি থেকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে, খাড়া রোদে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দৌড় করিয়ে করিয়ে দেখানো শুরু করেছিল, 'এখানটায় আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট... এইখানটাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, এইখানটিতে বসবে আমাদের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স...'

এর প্রায় বছর তিনেক বাদে এইবার ফের অপুর কাছে আসা। জায়গাটা বদলে গেছে পুরো। বড়ো বড়ো বাড়ি উঠে গেছে চারদিকে। লাল পাথুরে মাটির প্রান্তর জুড়ে অজস্র গাছ আর ফুলের কেয়ারি। ক্যামপাসের একেবারে পশ্চিম প্রান্তের কাছে অপুদের স্টাফ কোয়ার্টার। দুটো চারতলা টাওয়ারে আট আট-ষোলোটা ফ্ল্যাট। এটা টাইপ সিক্স। সেটা অপুদের জন্য। অন্যটা টাইপ ফোর, তাতে ইউনিভার্সিটির নন টিচিং স্টাফের থাকবার কথা। টাইপ সিক্স টাওয়ারের একতলার একটা ফ্ল্যাটে অপুর আড্ডা। উপস্থিত সেখানেই ধীরেনের ঠিকানা হয়েছে। বাকি গোটা টাওয়ারটাই আনঅকুপায়েড। এ বিষয়ে অপুর একটা থিওরি আছে। সেটা হল এই যে, লোকজন মুখে যতই প্রকৃতি প্রকৃতি বলে চেঁচাক, আসলে তারা শহরের ধুলো ধোঁয়ায় মুখ গুঁজরে পড়ে থাকতেই ভালোবাসে বেশি। এ ছাড়া তার মতে এই সুন্দর হাউজিংটা এভাবে খালি পড়ে থাকবার কোনো কারণ নাকি নেই। অন্য টাওয়ারটাতে গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ফ্ল্যাটে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক হরেন ধর এসে বাসা বেঁধেছেন। সেটারও বাকিটা এখনও বেবাক ফাঁকা। ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে। অপু জানিয়েছে, বড়ো সংসারের চাপে ভাড়া দিয়ে শহরে থাকার মতো পয়সা নেই, তাই এসে কোয়ার্টারে উঠেছেন। নইলে নাকি তিনিও এ মুখো হতেন না।

বাসিন্দার অভাবে অপুদের টাইপ সিক্স টাওয়ারে ওর কোয়ার্টারের মুখোমুখি ফ্ল্যাটটাতে ইউনিভার্সিটির পোস্ট অফিসটাকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোস্ট মাস্টারমশাই লোকটা ভালোমানুষ। রোজ সাইকেল চালিয়ে

শহর থেকে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে কাজে আসেন। কথায় কথায় ধীরেন একবার জিজ্ঞেস করেছিল, অ্যাদ্দূর কষ্ট করে গরমের মধ্যে আসেন, তার বদলে এখানেই একটা ঘর নিয়ে নেন-না কেন মাস্টারমশাই? সব তো ফাঁকা পড়ে আছে।

ভদ্রলোক চোখ দু-খানা কপালে তুলে বলেছিলেন, 'ওরে বাবা, এই কবরস্থানে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকবার হিম্মত আমার নেই ধীরেনবাবু। অপূর্বস্যারের মতো ঝাড়া হাত-পা লোক তো আর নই, তার ওপর উনি তো আবার বিজ্ঞানী মানুষ...'

ওঁর কথাটা শেষ হবার আগেই অপু কোত্থেকে এসে বলে, 'ওই শুরু হল। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনি নতুন লোক পেলেই গুল মারতে শুরু করবেন এটা কেমন কথা! তার চেয়ে নিজের কাজ করুন গে যান। আমার একটা বুক পোস্ট আসবাব কথা ছিল কলকাতা থেকে। সেটা পৌঁছেছে?'

নিতান্তই স্বাভাবিক কথাবার্তা। তবু ধীরনের কেমন যেন মনে হয়েছিল, অপু কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি সে। ডালহৌসি পাড়ায় কলম কারখানার আপিসে উদয়াস্ত ঘাম ঝরাতে হয় সপ্তাহে ছ-দিন। ওরই মধ্যে সাহিত্যটাহিত্য চর্চা করে মাঝেমধ্যে। বাড়িতে থাকলে হয় না, তাই বড়োসড়ো কোনো লেখা মাথায় এলে, কলকাতা ছেড়ে এই নির্জন শহরটাতে এসে দু-চারদিন কাটিয়ে লেখাটা তুলে নিয়ে ফিরে যায়। দু-দিনের মেহমান, অতসব ভেতরের কথায় তার দরকার কী?

এবারে অপুর কাছে এসে তার ভারি সুবিধে হয়েছে। ওর আগের কোয়ার্টারটা ছিল শহরের একেবারে পেটের ভেতর একটা এঁদো গলির মধ্যে। তার তুলনায় এ জায়গাটাতো স্বর্গ। চারপাশে যতদূর চোখ চলে ফাঁকা মাঠের ভেতর এখানে-ওখানে দুটো-একটা গাছ। তার মধ্যে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো জেগে আছে নতুন ক্যাম্পাসটা। সকাল বিকেল সবসময় হাওয়ার শনশন শব্দ শোনা যায়। দক্ষিণদিকটা অবশ্য পুরো ফাঁকা নয়। কয়েক একর পতিত জমি ছাড়িয়ে তারপর ক্যামপাসের সীমানাজ্ঞাপক তারকাঁটার বেড়া। তাঁর ওধারে জেলখানাটা দাঁড়িয়ে থাকে ভূতুড়ে বাড়ির মতো। জমিটাতে নাকি একসময় ওই জেলখানায় মারা যাওয়া কয়েদিদের মৃতদেহ পুঁতে ফেলা হত। সাহেবি আমল শেষ হবার পরে প্রথাটাতে কিছু বদল এসেছিল। তখন বডিগুলো যার যার ধর্ম অনুযায়ী পোড়ানো বা কবর দেওয়া হত বটে, তবে সে-ও এই মাঠেরই ওপরে। জায়গাটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতর ঢুকে যাবার পর সেটা এখন বন্ধ হয়েছে বটে তবে খালি পায়ে ওদিকের মাঠটাতে অন্ধকারে হাঁটা এখনো রিস্কি। হাড়ের টুকরোটাকরা পায়ে বিঁধে যাবার ভয় থাকে।

অপুর কাছে এলে রাতটা অন্তত একা একা থাকাটা ধীরেনের একটা শখ। টানা লিখে যাওয়া যায়। অপুও ওর ইচ্ছেটার মূল্য দেয়। ছোটোবেলার বন্ধু তো! ওর ব্যাপারটা বোঝে ভালো। ধীরেন এলে তাই অপু চিরকালই নিজের ঘর ওকে ছেড়ে দিয়ে আর কারো বাড়ি গিয়ে রাতে শুয়েছে। এবারেও এসে চানটান করে মেঝেতে খেতে বসে দুপুরবেলা ধীরেন তাই জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ যাত্রা কোন বাড়িতে শুতে যাবি অপু? এখানে তো আর তোর সেই পুরোনো পাড়ার দাশবাবু নেই!' অপু একটু ইতস্তত করেই বলেছিল, 'রাতে শোবার জায়গার অভাব হবে না, কিন্তু একেবারে ফাঁকা শুনশান জায়গা, রাতবিরেতে কখন কী সুবিধে অসুবিধে হয়—তাই ভাবছিলাম, এবারে রাতগুলোও তোর সঙ্গেই থেকে যাই।'

ধীরেন রাজি হয়নি। তিনটে মাত্র রাত হাতে আছে। হাতের কাজটা প্রায় দশ হাজার শব্দের মতো দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। তার ভাবনাচিন্তা আছে, তাকে সাজিয়ে তোলা, লেখা কাটা, ফের লেখা, তার ঘষামাজা, সবই সারতে হবে ওই তিন রাতের ভেতর। অতএব কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর অপু হরেন ধরের বাড়িতে রাতে শোবার বন্দোবস্ত করেছে। এ ঘরের উত্তরের জানালা দিয়ে ধরবাবুর ঘরের জানালাটার একটুখানি দেখা যায়।

রাতে শুতে যাবার আগে জানালাগুলো সব ভালো করে দেখেটেখে নিয়ে অপু বলে গিয়েছিল, কোনো অসুবিধে হলে উত্তরের এই জানালাটা খুলে ধরবাবুর বাড়ির দিকে মুখ করে চিৎকার করিস, আমি চলে আসব। কিন্তু দক্ষিণ দিকের জানালাটা—

তার কথাটা শেষ করতে না-দিয়ে ধীরেন পাদপূরণ করে দিয়েছিল—খুলব না, তাইতো?—হ্যাঁ। খুলবি না। এমনকী পর্দাটাও খোলার চেষ্টা করবি না।

অপু চলে যাবার পর ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ধীরেন দেখে ছিটকিনিটা লাগছে না। অপুটা এত অগোছালো যে বলার নয়। এদিকে চোর-ছ্যাঁচোড়ের ভয়ে জানালা বন্ধ করে শোবে, ওদিকে দরজার ছিটকিনি নেই। এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে তাকের ওপর একটা তালাচাবি পাওয়া গেল। দরজায় সেটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে একবার টেনে দেখে নিল ধীরেন। এবারে নিশ্চিন্ত।

লেখাটা সবে জমে এসেছে এমন সময় আলো চলে গেল। এসব অঞ্চলে এটাই দস্তুর। এতক্ষণ যে ছিল সেটাই মহাআশ্চর্যের ব্যাপার। ধীরেনের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে তাতে এখন ঘন্টা দুয়েকের মতো মোটামুটি নিশ্চিন্ত। তার আগে কারেন্ট ফিরছে না। কলমটার খাপ বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর পাশে রাখা কিটব্যাগ খুলে মোমবাতি আর মশার ধূপের একটা কয়েল বার করে জ্বালাতে বসল। ভাঁজ করা হাতপাখাও একটা দিয়ে দিয়েছিল পর্ণা, কিন্তু এখন এই অন্ধকারে ব্যাগ হাঁটকে সেটা বার করবার মতো ধৈর্য ধীরনের নেই।

এবারে এখানে গরম পড়েছে খুব। এখানকার স্ট্যান্ডার্ডেও বেশ চড়া। হরেন ধর এসে বলছিল দুপুরবেলায়। এতটা রাত হল তবু তার তেজ কমেনি। এতক্ষণ তবু তাও একটা ফ্যান ঘুরছিল মাথার ওপর টিক টিক করে। তাতে হাওয়া বেশি না-থাকলেও মানসিক সান্ত্বনা একটা থাকে যে ফ্যানটা তো যাহোক আছে! এবারে সেটাও গেল। অস্থির লাগছিল ধীরেনের। উত্তরের জানালার বাইরে খানিক দূরে একটা মহুয়াগাছের সরু সরু ডালগুলো অল্প অল্প নড়ছে দেখা যাচ্ছিল। হাওয়া ছেড়েছে। ধীরেন উঠে গিয়ে ওদিকের জানালাটা খুলে দিল। লাভ হল না অবশ্য। একে তো দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া আসছে। তার ওপর দু-দিকের জানালা খুলে ক্রস ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা না-করলে হাওয়া খেলবে কী করে?

একফালি হলদেটে আলো এসে মেঝের ওপর পড়ছিল খোলা জানালা দিয়ে। আলোটা অনুসরণ করে ধীরেন দেখল, ধরবাবুর বাড়ির সিঁড়ির আলো। তার মানে কারেন্ট আছে। তবে কি এদিকের ফিউজ গেল? তাহলেই তো চিত্তির। কোথায় ফিউজ আছে কে জানে। তার মানে সকালের আগে পাখা আর ঘুরছে না। ধীরেন সতৃষ্ণ চোখে দক্ষিণের জানলাটার দিকে একবার চাইল। অপু ব্যাটার চোরের নিকুচি করেছে। উঁকি দেওয়া কেন, সাক্ষাৎ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেও আর তার পরোয়া নেই। উপস্থিত এই ভয়ানক গরমের হাত থেকে বাঁচা দরকার।

পর্দাটার কাছে যেতে একটা অদ্ভুত গন্ধ এসে লাগল নাকে। অচেনা ভেষজ গন্ধ। মৃদু, মিষ্টি সুবাস তার। পর্দাটার গায়ে কিছু একটা মাখানো রয়েছে। অবশ্য সেদিকে মন দেবার অবস্থা তখন আর তার নেই। ঘামের নোনতা ফোঁটাগুলো চোখের মধ্যে ঢুকে এসে চোখ জ্বলছিল। ছিটকিনি খুলে জানালার কাচের পাল্লাদুটো দু-পাশে সরিয়ে দিল ধীরেন। তারপর পর্দাটা ধরে টান দিতে সেটা খুলে পড়ে গেল বাইরে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল উলটোপালটা হাওয়ার ধাক্কায় পাক খেতে খেতে সেটা গিয়ে খানিক দূরে একটা গাছের গায়ে ঠেকেছে। অপুর কাজ তো! কোনোকিছুই ঠিকঠাক ভাবে করতে পারে না। যাক গে, সকালে উঠে আবার খুঁজে এনে লাগিয়ে দেয়া যাবে'খন।

হাওয়াটা গায়ে লাগতে ভারি আরাম বোধ হল ধীরনের। আঃ কী মিষ্টি! হাওয়ার ঠেলায় মোমবাতি নিভে গেছে। ধূপের জলন্ত মাথাটা অন্ধকার ঘরের এককোণে একটা লাল চোখের মতো জ্বলছিল। একটা আলস্য এসে ঘিরে ধরছিল ওকে। লেখাপড়া আজ আর হবে না। সিগারেটের লেজটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ও এসে মেঝের বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরেই পায়ের কাছটা ধরে কে যেন আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশেষে ঘুম ভাঙতে ধীরেন চোখ খুলে দেখল, চারপাশে একটু একটু ফর্সা হয়ে এসেছে। তারপরেই চমক ভেঙে খেয়াল হল, ভোরের আলো নয়, শেষরাতের চাঁদ উঠেছে। তারই আলো এসে পড়ছে তার সারা শরীরে। পায়ের কাছে যে লোকটা

বসেছিল তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেই আলোয়। সাদামাটা চেহারা। একটা খাকি ট্রাউজার আর বুশশার্ট পরে আছে। ধীরেন চোখ খুলে তাকাতে লোকটা তার পা ছেড়ে দিয়ে একগাল হাসল। তারপর বলল, বাড়ি চল এহসান...

ধীরেনের অবশ্য তখন ঘুমটুম সব উড়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসেছে একেবারে। চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে রয়েছে তার চারপাশের বিস্তীর্ণ মাঠটাতে। কিছুদূরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা জেলখানাটা বাদে আর কোনো ঘরবাড়ির চিহ্নও নেই কোথাও। নিতান্তই অভ্যেসবশে মাথাটা ডানদিকে ঘুরে গিয়েছিল তার, লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের আলোগুলো যদি দেখতে পায় সেই আশায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে বেশ খানিকটা দূরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা একটা চিতা চোখে পড়ল শুধু। একা-একাই জ্বলে চলেছে চিতাটা। আশেপাশে কোনো মানুষজনের দেখা নেই।

লোকটা আবার তার পা ধরে নাড়াল। এবার যেন সেই ঝাঁকুনিতে একটা বিরক্তিরই স্পর্শ। ধীরেন চোখ পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি—মানে—এখানে—

লোকটা বলল, আমিও সেই কথাটাই ভাবছিলাম রে বেটা। এই জায়গাটা জুড়ে রোজ রাতে সেই বদমাশ লোকটা শুয়ে থাকে। আজ সে নেই. সেই বিশ্রি গন্ধটাও নেই।

—তার মানে?

—তোকে খুঁজতে খুঁজতেই একদিন এখানে এসে পড়েছিলাম। আমি ঠিক জানতাম এখানেই পাব তোকে।

—আমি—এহসান নই...

লোকটা যেন চমকে উঠল একবার। তারপর সেই মৃদু চাঁদের আলোয় ধীরেনের মুখের খুব কাছাকাছি তার মুখটা নিয়ে এল। একটা গা বমি বমি করা মিষ্টি পচা পচা গন্ধ উঠছিল তার গা থেকে। তার সঙ্গে মিশে ছিল মৃদু, সোঁদা মাটির গন্ধ...

ধীরেন চোখ খুলে তাকাতে লোকটা তার পা ছেড়ে দিয়ে একগাল হাসল...

কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে আবার ধীরেনকে ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে বসল সে। তারপর কেমন দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, না! তুমি তো সে নও!

...এহসান ...কে?

...আমার ছেলে স্যার। একমাত্র ছেলে। নবাবজাদার মতো চেহারা ছিল। নেশা-ভাং কিচ্ছু করত না। শুধু লেখাপড়ার কাজ করত বাড়িতে বসে। গান্ধীবাবার পুজো করত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ইস্কুল করাত। সেবারে যখন যুদ্ধ বাধল, একদিন পুলিশ এসে আর চারজন ছেলের সঙ্গে ওকেও ধরে নিয়ে গেল গ্রাম থেকে। তারপর ছেলে আমার আর ফেরেনি। থানেদারের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলাম, ছেলের খবরের জন্য। সে আমার দশা দেখে খোঁজটোজ নিয়ে বলল, হারিয়া জেলে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে ওদের।

পূর্ণিয়া থেকে কম দূরের রাস্তা নয়। তবু খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছেওছিলাম ঠিক। কিন্তু ছেলেটাকে আর পেলাম না। এই যে এখানটাতে আপনি শুয়ে আছেন, এইখানটাতে ও-ও শুয়ে আছে। সেই খবরটুকু জোগাড় করে উঠতে পেরেছিলাম জেলের জমাদারদের কাছে খোঁজ করে। তারপর একদিন রাতের বেলা চুপিচুপি এখানটাতে এসে, একটা গাঁইতি নিয়ে... কিন্তু ...তারপরে কী যে একটা হল, ভয়ানক একটা কিছু — উঃ— ঠিক মনে করতে পারছি না। কখনই মনে করতে পারি না, জানেন! তখনকার খানিকটা সময়ের কোনো হিসেব নেই আমার কাছে। সেই সময়টার শেষে যখন আবার চেতনা ফিরে এল, দেখলাম এইখানে ঘোরাঘুরি করছি। এই মাঠটাতে। আমার এহসানের একদম কাছে। ঠিক এইখানটাতে শুয়ে ছিল সে! তার পায়ে নাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলাম... এহসান...

লোকটা ধড়মড় করে উঠে বসতে খেয়াল করে দেখি সে আমার এহসান নয়। মুশকো, কালো চেহারার একটা লোক! আমায় দেখেই সে ভয়ানক চিৎকার করে উঠল। তারপর কেমন যেন পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল আর বারবারই যেন কোন অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়তে লাগল ভেতরের দিকে। যেন তার চারপাশে কোনো ঘরের চারটে দেয়াল খাড়া হয়ে রয়েছে! চোখে দেখা যাচ্ছে না, এই যা। দু-তিনবার ধাক্কা খেয়েই অজ্ঞান হয়ে আছড়ে গিয়ে পড়ল গিয়ে একপাশে। আর তারপর—তারপর, আবার সেই ঘটনাটা—হ্যাঁ, এইবারে মনে পড়েছে—ওরা তিনজন!! টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছিল এদিকে! আমায় হাত তুলতে বলল, ওদের হাতে বন্দুক ছিল... আমি হাতের গাঁইতিটা দিয়ে ...তারপর ...উঃ...

এক বছর পরে, আবার সেই দিনটাতে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসেছিলাম। কিন্তু এ জায়গাটাতে এসেই দেখি সেই লোকটা শুয়ে আছে। ওকে দেখেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, গাঁইতির এক ঘায়ে খুলিটা দু-ফাঁক করে দিয়ে এহসানকে ডেকে নিয়ে পালাব, ওই বন্দুকওয়ালারা আসবার আগেই কিন্তু তার কাছে এগোতে পারিনি সেদিন। জানালার গায়ে একটা কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছিল লোকটা। একটা ভয়ানক পচা গন্ধ ঘিরে কাপড়টার চারপাশে। আমার সহ্য হয়নি। মাথা ঘুরে উঠেছিল। কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করতে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলাম দূরে।

পালিয়ে গেছিলাম স্যার। ভেবেছিলাম গন্ধটার ভয়ে আর কোনোদিন বোধ হয় এদিকে পা বাড়াতে পারব না। কিন্তু আজ আবার কেমন করে জানি না, দেখি ঠিক ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছেছি। গন্ধমাখা কাপড়টা নেই। বদমাশ লোকটাও নেই। আপনি একটু সরে বসুন স্যার। আমার এহসানকে বার করে আনি। তারপর চিরকালের মতো এখান থেকে চলে যাব স্যার। অনেক দূরে। আর কোনোদিন আসব না। ভগবানের নামে কথা দিচ্ছি স্যার!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো একপাশে সরে বসল ধীরেন। ঠিক যেখানটাতে ও শুয়েছিল একটুক্ষণ আগে, লোকটা গাঁইতি নিয়ে সেখানটাতে কোপের পর কোপ মারতে শুরু করল। শক্ত মাটিতে ঠংঠং শব্দ উঠছিল।

হঠাৎ মাটি কোপানো বন্ধ করে লোকটা ধীরেনের পেছনে জেলখানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, এ যাত্রাও আর হল না। ওরা আসছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাথা ঘুরিয়ে সে দেখে, প্রায় একশো হাত পেছনে তিনটে টর্চের আলো জ্বলে উঠেছে। শক্তিশালী রশ্মিগুলো বারবার ওদের কাছাকাছি দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ আলোটা এসে স্থির হল লোকটার গায়। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গভীর গলা ভেসে এল— হল্ট— হ্যান্ডস আপ।

লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাতে গিয়ে কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠে লোকটার একদম কাছে এসে পড়ল ধীরেন। গরাদ দেওয়া একটা জানালার মতো লেগেছিল ছোঁয়াটা। হাতড়ে হাতড়ে আবার সেইখানটাতে গিয়ে হাওয়ার গায়ে হাত বুলিয়ে নিশ্চিত হল সে। এখানে একটা জানালা আছে। অপুও ঠিক এমনি করে ধাক্কা খেয়েছিল দেয়ালের গায়ে। লোকটা একটু আগেই তাহলে কালো মুশকো লোকটা মানে অপুর কথাই বলেছে!!! আর মানে ঘরটা আছে! এইখানেই! তার চারপাশেই। শুধু, সেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আলোগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছিল কাছে। পালানো সম্ভব নয় আর। অদৃশ্য একটা দরজাকে সে খুঁজে পাবে কেমন করে? আর পায়ও যদি বা, দরজায় তো তালা দেওয়া। সে নিজেই মেরেছে ঘন্টাকয়েক আগে। নিজের নিরাপত্তার জন্য!

নিরাপত্তা!! হাঃ!! এত বিপদের মধ্যেও হাসি পাচ্ছিল ধীরেনের। এইজন্যেই তবে ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগায় না অপু!!

লোক তিনটেকে এবারে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দুজনের গায়ে পুলিশের উর্দি। তিন নম্বর লোকটা সাধারণ প্যান্টজামা পরে আছে। কাছাকাছি পৌঁছেই সামনের উর্দিধারী লোকটা তার টর্চটা বাঁ-হাতে নিয়ে বেল্টের খাপ থেকে একটা রিভলবার বার করে উঁচিয়ে ধরেছে সামনে। তারপর, ধীরেনের প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে লোকটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা তিনজন। ধীরেনকে যেন দেখতেই পায়নি। ওদের ঠান্ডা ক্রুর চোখগুলো স্থির হয়ে আছে, টর্চের আলোর ফলায় বিদ্ধ সেই লোকটার গায়ে।

ওদের ঠান্ডা ক্রুর চোখগুলো স্থির হয়ে আছে, টর্চের আলোর ফলায় বিদ্ধ সেই লোকটার গায়ে...

সবার পেছনের উর্দিছাড়া লোকটাই প্রথম মুখ খুলল—খবর একদম পাক্কা ছিল স্যার। ব্যাটা লাশচোর ক-দিন ধরেই রাতের দিকে এই মাঠে ঘোরাফেরা করছে। এইবারে একেবারে হাতেনাতে ধরেছি।

লোকটা সেদিকে না-তাকিয়ে পাগলের মতো গাঁইতি চালাচ্ছিল মাটির গায়ে। আস্তে আস্তে গর্তটা বড়ো হচ্ছে। পচা মাংসের একটা তীব্র দুর্গন্ধ উঠে আসছিল সেখান থেকে।

সামনের পুলিশটা ততক্ষণে পোজিশান নিয়ে হাতের রিভলভারটার নিশানা স্থির করে ধরেছে লোকটার ওপর। গম্ভীর গলায় বলছে, দিস ইজ দা লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ার্নিং— ইউ মাস্ট স্টপ অর--

—এহসান রে—বাপ আমার—

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লোকটা বসে পড়ল গর্তটার পাশে। গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পচা গলা একটা হাতকে দু-হাতে চেপে ধরে টান লাগাচ্ছিল সে। মাংস গলে খসে পড়ছে মৃত হাতটার থেকে—এখানে-ওখানে সাদা সাদা হাড় বার হয়ে এসেছে—

কানফাটানো শব্দের সঙ্গে আগুনের তীব্র একটা ঝলক ছুটে এল লোকটার দেহ লক্ষ করে।

তারপর, পরপর কয়েকটা গুলি—পুলিশটা পাগলের মতো রিভলবারের ম্যাগাজিন পুরো খালি করে দিচ্ছে লোকটার গায়ে—আর, তার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণের শব্দগুলোকে ছাপিয়ে হিংস্র একটা চিৎকার উঠে আসছিল—গো টু হেল, ইউ মনস্টার, ইউ গ্রেভ স্ন্যাচার সান অফ আ ডেভিল—

নিঃশব্দে, যেন স্লো মোশানে চলা ছবির মতো লোকটা একবার একটু ছিটকে উঠেই মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। সেই গর্তটার মধ্যে। পচাগলা মৃতদেহটার সারাশরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার বাপের দেহ থেকে বার হয়ে আসা ফিনকি দেওয়া লাল রক্তের ধারা...

...তারপর সব চুপচাপ। অস্তগামী চাঁদের আলোয় সেই গর্তটার মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে রইল দুটো লাশ! বন্দুকওয়ালা পুলিশটা চুপচাপ একটা সিগার ধরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। অন্য দুজন মানুষ তখন উবু হয়ে বসে মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে গভীর সেই কবরটাকে—তারপর আমারও আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরেছিল অপুর ঠেলাঠেলিতে আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা খেয়ে। চেয়ে দেখি ফটফট করছে দিনের আলো। বেলা প্রায় দশটা মতো হবে তখন। অপুর পেছনে হরেনবাবুর বাড়ির লোকজনও ভিড় করে কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে ছিল। ধরবাবুর মুখেই শুনলাম, সকালে আমায় ঘুম থেকে না-উঠতে দেখে অপু প্রথমে বলেছিল অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করেছি বলে দেরি হচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু বেলা সাড়ে ন-টা অব্দি কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে শেষে এ ঘরের খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে সে দেখে আমি মেঝেতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছি। শেষমেষ পাতলা কাঠের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আমার জ্ঞান ফেরানো হয়েছে।

ঘন্টাখানেক বাদে স্নানটান করে একটু সুস্থির হয়ে অপুকে ধরে বসলাম গিয়ে। প্রথমে খানিক তা-না-না-না করে শেষপর্যন্ত আমার চাপে একরকম বাধ্য হয়েই সে বলল, 'দ্যাখ ধীরেন, কোনো একটা রহস্যময় অস্তিত্ব এখানে ঘুরে বেড়ায় সেটা আমি জানি। আমি তাকে দেখেওছি একবার। রাত্রিবেলা আমায় ধরেছিল এসে। সে এক কাণ্ড। উঠে ঘরটার কিছুই দেখতে পাই না, শুধু পালাতে গেলেই ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়ি। তুই শুধুমুধু ভয় পাবি তাই রাতে কিছু ভেঙে বলিনি। তবে, সেইজন্যেই তোকে বলেছিলাম জানলাটা না-খুলতে। যেদিন আমার এই অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল তার পরদিন সব শুনে হরেনদা কোত্থেকে ওই ওষুধমাখা কাপড়টা এনে দিয়েছিল। ওটা ওদিকের জানালায় পর্দার মতো করে ঝুলিয়ে রাখতাম। তারপর আর কোনোদিন কোনো সমস্যাই হয়নি। তুই কেন মধ্যে থেকে পর্দাটা...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'না অপু। সবটা তুই জানিস না। জানলে এত নিশ্চিন্তে এই ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে এতগুলো রাত শুয়ে ঘুমোতে পারতিস না। তুই পুরো ঘটনাটা দেখার আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলি। আমি সবটা দেখেছি।'

অপু অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার ধীরেনকে দেখল। তারপর বলল, 'আমি যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম সে-কথা তুই কী করে জানলি?'

হরেনবাবুও আর তাঁর মেয়েরাও ততক্ষণে কৌতূহলী হয়ে ধীরেনের দিকে এগিয়ে এসেছেন। তাদের দিকে চোখ ফেলে সে বলল, 'আমি জেনেছি। আর সেইসঙ্গে, গল্পের যে অংশটা তোরা জানতে পারিসনি সেটাও বলি শোন—'

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সকলে। ধীরনের গল্প শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বাইরে চৈত্রের দুপুরের গরম হাওয়া শাঁ শাঁ করে গুমরে মরছে শুধু।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল অপু। তারপর বলল, 'হরেনদা, আপনার ঘরে গাঁইতি আছে না? নিয়ে আসুন। এ ঘরের মেঝেটা একবার খুঁড়ে দেখতে হবে।'

নিঃশব্দ সেই দুপুরবেলায় গাঁইতির কয়েকটা ঘায়েই খসে এল মেঝের সিমেন্টের পাতলা আস্তর। তারপর হাত তিনেক গর্ত খুঁড়তে উঠে এসেছিল জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা দুটো কংকাল। তাদের দুটোরই হাড়ে বেস কয়েকটা করে বুলেটের ক্ষত।

সেটা ছিল শুক্রবারের দুপুর। ইউনিভার্সিটি ভর্তি লোকজন। কথাটা বাইরে চাউর হয়ে যেতে দেরি হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিলপিল করে লোক এসে ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেল জায়গাটা। একটা কংকালের পাশে উর্দুতে লেখা একটা জীর্ণ কোরান দেখে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল, লোকদুটো মুসলমান। ধীরেন পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে হরেন ধরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাছাকাছি কোনো মৌলবি-টৌলবি থাকলে খবর দিন হরেনদা। এদের একটু প্রপারলি নিয়মকানুন মেনে গোর দেওয়া দরকার। শান্তি পাক বেচারারা।

কাজটাজ সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে সেদিন রাতেই জ্বর এসে গিয়েছিল অপুর। এতদিন ধরে দুটো অপঘাতে মরা লোকের কংকালের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে থেকেছে সেটা জানতে পেরে ঠিক হজম হচ্ছিল না ওর। বিকারে ঘোরে শুধু ভুল বকছে, ওই এল—আমাকেও গর্তে ফেলবে—

এখন একে সামলায় কে! ধীরেনের গল্প লেখা তখন মাথায় উঠেছে। শেষমেষ ট্রেনের দুটো টিকিট কেটে ওকে একেবারে সঙ্গে করে এনে চুঁচড়োর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তি। তবে অপুটা যা ভিতু! সেরে ওঠবার পরেও ওখানে আর ফিরলে হয়!

তেরাখোলে এক রাত

দীপান্বিতা রায়

এমন ঘোর বর্ষায় গোয়া বেড়াতে যাওয়া। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যেই শুনেছে আঁতকে উঠেছে। কিন্তু রণিত আর দীপকের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। অনেক চেষ্টায় দুজনে যখন একসঙ্গে ছুটি পেয়েছে তখন যাবেই। আর ওসব বর্ষা-টর্ষা তাদের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। দুজনেরই মতে দেখার যদি চোখ থাকে আর মনে যদি ফুর্তি থাকে তাহলে প্রকৃতিদেবী সঙ্গে থাকবেনই।

আসলে দীপক-রণিত এক কথায় অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ভবানীপুরে মুক্তদলের কাছে একই গলিতে বাড়ি। পড়াশোনা, খেলাধুলো সবই একসঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রণিত এখন একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। দীপক ডক্টরেট করছে। গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য লেখালেখিও করে। পড়াশোনা কিংবা কাজের ফাঁকে পিঠে রুকস্যাক নিয়ে বছরে দু-একবার একসঙ্গে বেড়িয়ে পড়াটা অনেকদিনের অভ্যাস। কিন্তু গত একবছর ধরে কিছুতেই আর সুযোগ হচ্ছিল না। রণিতের নতুন চাকরি। ছুটি পাওয়া মুশকিল। দীপকের বাড়িতে নানা ঝামেলা চলছিল। তাই এতদিন পরে যখন দুজনের সময় মিলেছে তখন আর অপেক্ষা নয়। পাহাড় অনেক হয়েছে। এবার সমুদ্র। বর্ষায় গোয়া।

তবে দীপক আর রণিতের বেড়াতে যাওয়াটা ঠিক আম-ট্যুরিস্টের মতো নয়। নাম-ডাকওলা কোনো একটা জায়গায় তারা বেড়াতে যায় ঠিকই, কিন্তু তারপর খোঁজ চলে তার আশপাশের নাম-না-জানা কোনো সুন্দরীকে খুঁজে বের করার। এরকমভাবেই দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ওরা খুঁজে পেয়েছিল চটকপুর। শিলং পাহাড়ের কাছে বড়াপানি।

এবারের বেড়ানোটাও যে আলাদা কিছু হবে না তেমন কথাবার্তা হয়ে গেছিল আগেই। খাণ্ডবী নদীর ধারে গোয়ার রাজধানী প্যানাজিস বা পানাজিতে হোটেল বুক করা ছিল। প্রথম দিনটা সেখানে উঠে ঘোরাঘুরির ফাঁকে চলছিল অচেনা জায়গার সন্ধান। খোঁজ মিলল দ্বিতীয় দিনেই। হোটেলের মালিকই খবর দিলেন কুলু নদীর মোহনায় আছে তেরাখোল দুর্গ। পানাজি থেকে গাড়িতে গেলে লাগবে ঘন্টা তিনেক। ছোটো ছোটো গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটিও চমৎকার। মাঝে দু-একটা ছোটো নদী পড়বে। সব জায়গাতেই বার্জে চড়ে পেরোনর ব্যবস্থা। তবে মুশকিল একটাই। পোর্তুগিজদের তৈরি তেরাখোল দুর্গ এখন একটা হোটেল। ওটি ছাড়া ওখানে আর কোনো থাকার জায়গা নেই। তবে এখন বর্ষাকাল। তাই ট্যুরিস্ট কম। থাকার জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর থাকতে যদি পাওয়া যায়, তাহলে পাহাড়, নদী, সমুদ্র, জঙ্গল সব মিলিয়ে তেরাখোল একেবারে জমজমাট।

শুনে থেকে তো দুই বন্ধুর আর তর সইছে না। হোটেলের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা হল একটা মোটর সাইকেলের। দুজনেই দিব্যি বাইক চালাতে পারে। রাস্তাও যথেষ্ট ভালো। তাই ব্যাগ ঘাড়ে সকাল সকাল বেরিয়ে দুপুরে আগেই দুজনে পৌঁছে গেল তেরাখোল।

গোয়া আর মহারাষ্ট্রের সীমানার খুব কাছেই তেরাখোল। কুলু নামের একটা ছোট্ট নদী এসে মিলেছে আরব সাগরে। সেই মোহনার পাশেই পাহাড়ের মাথায় দুর্গটা। সমুদ্রের ধার থেকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। আরব সাগরের ঢেউ যেন বারবার ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইছে ওকে। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে সাদা ফেনায়। পাহাড়ের মাথায় ঠিক রাজার মুকুটের মতো বসে আছে তেরাখোল। কুলু নদীর ধারে বার্জের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দূর থেকে দুর্গটিকে দেখে দারুণ পছন্দ হয়ে গেল রণিত আর দুজনেরই।

ভাগ্য ভালো। হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে শোনা গেল একটিমাত্র ঘর খালি আছে। তবে সেটা সমুদ্রের দিকে নয়। পিছনের দিকে, মানে জঙ্গলের দিকে। তাই সই। চটপট সইসাবুদ সেরে দুজনে চলল ঘরের দিকে।

হোটেলের ভিতরটা ভারি অন্যরকম। দুর্গের স্বাভাবিক গঠন যতখানি সম্ভব না বদলে ব্যবস্থা হয়েছে অতিথিদের থাকার। তাই সরু সরু গলি, বাঁক, খাড়া সিঁড়ি, সবই আছে। আবার আধুনিক সুযোগ-সুবিধারও কোনো অভাব নেই। সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চকরভাব। ঘর দেখেও দিব্যি পছন্দ হল। সমুদ্র দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু জানলা খুললেই চোখে পড়ে দুর্গ প্রাচীর, তার ওপাশে ঘন জঙ্গল। জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল যে ছেলেটি, সে অবশ্য বলল জঙ্গল গভীর হলেও হিংস্র জন্তুজানোয়ার কিছু নেই। ওপাশে মারাঠী গ্রাম আছে। সেখানকার লোকজন এই জঙ্গলের পথ দিয়েই যাতায়াত করে।

হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আকাশভেঙে নামল বৃষ্টি। একটা বেলা পুরো মাটি। বিকেল নাগাদ বৃষ্টি থামলে বেরোল দুজনে। পায়ে হেঁটে একটু ঘুরে আসার ইচ্ছে। বিশেষ করে সমুদ্রের ধারটা। পাহাড়ী পথের বাঁক বেয়ে কিছুদূর নামতেই দেখে পাথরের ওপর বসে আছে এক বুড়ো। পরনে তাপ্পিমারা জামা আর ঢোলা প্যান্ট। মাথায় টুপি। তাদের দুজনকে দেখেই সে মাথার টুপি নামিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'আমাকে যদি পাঁচটা টাকা দাও, তাহলে আমি তোমাদের একটি সুন্দর গোয়ান কবিতা শোনাতে পারি।' 'আমরা কবিতা শুনতে ভালবাসি না', গম্ভীর গলায় বলল রণিত। 'দশ টাকা দিলে আমি একটা চমৎকার গোয়ান গান শোনাতে পারি।' 'আমাদের এখন গান শুনতে ইচ্ছে করছে না,' ফের বলল রণিত। 'কুড়িটা টাকা দিলে, আমি এই তেরাখোল ফোর্টের গল্পটা তোমাদের বলতে পারি। সেটা কিন্তু এখানকার খুব কম লোকই জানে।' রণিত ফের কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দীপকের ততক্ষণে মজা লেগেছে। সে হেসে ফেলে বলল, 'ঠিক আছে গল্পটা আমরা শুনবো, কুড়িটা টাকাও দেবো। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনতে হবে কী?' 'না না তা কেন?' গম্ভীরভাবে বললে বুড়ো, 'আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসতে পারি। সেখানে বসেই গল্প বলব।'

...পাথরের ওপর বসে আছে এক বুড়ো...

বুড়োর পিছন পিছন নামতে নামতে রণিত বলল, 'কী যে করিস না তুই। এখন বসে বসে বুড়োর গাঁজাখুরি গল্প শুনতে হবে। কুড়িটা টাকাও গচ্চা।' আর গল্প তো গল্পই।

'শুনতে দোষ কী আছে? আর যে কোনো জায়গারই এইসব লোকমুখে চালু গল্পে অনেক রকম ইন্টারেস্টিং ব্যাপার থাকে।' হাসতে হাসতে চলল দীপক।

সমুদ্রের ধারের বালিতে গিয়ে বসল তিনজন। মাথা থেকে টুপিটা খুলে পাশে রেখে বুড়ো শুরু করল, 'সে অনেক বছর আগের কথা। গোয়াতে তখন পোর্তুগিজদের রাজত্ব। এই দুর্গের কেল্লাদারও ছিলেন একজদন পোর্তুগিজ। নাম রোবার্তো গঞ্জালেস। কেল্লাদারের চেহারা যেমন বিশাল, মানুষটিও তেমনি নিখুঁত, দুর্গের চাকর-বাকর, সিপাই-শান্ত্রী। সবাই তাকে যমের মতো ভয় করত। কথায় কথায় চড়-থাপ্পর মারতে, চাবুক চালাতে তার জুড়ি ছিল না। কেল্লাদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না আশপাশের গ্রামের লোকজনও। সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রাম লুট করা ছিল তার কাছে খুবই আমোদের ব্যাপার।

এই কেল্লাতেই থাকত দামিনিক রোবার্তো। ফর্সা ছিপছিপে মানুষটির মনটি ছিল ভারি ভালো। কেল্লার চাকর-বাকর থেকে শুরু করে সিপাই-শান্ত্রী—সবাই ভালোবাসতো তাকে। আর সেজন্যই গঞ্জালেস দু-চক্ষে দেখতে পারতো না রোবার্তোকে। কিন্তু কিছু বলতেও সাহস পেতো না। কারণ রোবার্তো ছিল চিকিৎসক। নানারকম ওষুধ-বিষুধ জানতো সে। তখনকার দিনে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। তাই কাটা-ছেঁড়া হতই। তা ছাড়া জঙ্গুলে জায়গা। অসুখ-বিসুখও হত নানারকম। কেল্লায় একজন ডক্তার থাকাটা জরুরি ছিল। তাই অপছন্দ করলেও রোবার্তোকে কেল্লা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারত না গঞ্জালেস।

রোবার্তো মাঝে মাঝেই জঙ্গল পেরিয়ে আশপাশের মারাঠী গ্রামেও ঘুরতে যেত। কাছেই কুণ্ডা নামের গ্রামে থাকত এক বুড়ো কবিরাজ। তার সঙ্গে দিব্যি ভাব ছিল রোবার্তোর। বুড়ো তাকে গাছ-গাছড়া থেকে নানারকম ওষুধ তৈরি করতে শেখায়। সেই কুণ্ডা গ্রামেরই ছেলে শিবাও ছিল রোবার্তোর খুব বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে বেড়াত। তরোয়াল খেলত, লাঠি খেলত। শিবার বোন কুঙ্কু রোবার্তোর জন্য চমৎকার একখানা পাগড়ি বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা পরে রোবার্তো যেদিন কেল্লায় ফিরল, সেদিন অন্যরা হাসি-তামাশা করলেও গঞ্জালেস কিন্তু রেগেছিল খুব। দেশি মানুষদের সঙ্গে এরকম ভাব-সাব গঞ্জালেস একটুও পছন্দ করত না। বিশেষত শিবা তো ছিল তার দু-চক্ষের বিষ।

তখন থেকেই সুযোগ খুঁজছিল গঞ্জালেস। একদিন রোবার্তো শহরে গেছে। ফিরতে তার রাত হবে। সেই সুযোগে নিজের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গঞ্জালেস গিয়ে হানা দিল কুন্ডা গ্রামে। তাদের লুটপাট চালাতে দেখে তরোয়াল নিয়ে তেড়ে এল শিবা। গঞ্জালেসের সঙ্গীরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। তাই খুব সহজেই তারা শিবাকে বন্দি করে নিয়ে এল কেল্লায়। গঞ্জালেস জানিয়ে দিল পরদিন সকালে ফাঁসি হবে শিবার। সন্ধ্যায় কেল্লায় ফিরে সবকথা শুনে চমকে উঠলো রোবার্তো। গঞ্জালেসের কাছে গিয়ে শিবাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয়ও করলো। কিন্তু গঞ্জালেস সাফ জানিয়ে দিল শিবাকে ফাঁসি সে দেবেই।

রাত বাড়ছে। নিজের ঘরে ছটফট করছে রোবার্তো। কী করে বন্ধুকে বাঁচাবে সে...।

গল্পের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গেছিল দুই বন্ধু; যে কখন একটা হাতির পালের মতো বিশাল মেঘের দল ঠিক মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে বুঝতেই পারেনি। বুড়ো কিন্তু ঠিক খেয়াল করেছে। টুক করে টুপিটা মাথায় পরে লাফ দিয়ে উঠে বললো, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হোটেলে ফেরো। নইলে এক্ষুনি ভিজে চুপ্পুড় হয়ে যাবে।' 'কিন্তু গল্পের শেষটা শোনা হল না তো?' অবাক হয়ে বলল রণিত। ততক্ষণে পা চালিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে বুড়ো। থেমে পড়ে কীরকম একটু অদ্ভুত হেসে বললে, 'তোমরাও তো দুই বন্ধুই আছ। আজ রাতে নিজেদের মত করে শেষটা ভাব। কাল সকালে আমি বরং শুনে দেখব গল্পের সঙ্গে মেলে কীনা।'

প্রায় ছুটতে ছুটতে হোটেলে ফিরতে না-ফিরতেই বৃষ্টি নামল মুষলধারে। বৃষ্টির মধ্যেই আস্তে আস্তে নিভে এল দিনের আলো। আর অন্ধকার একটু গাঢ় হতে বন্ধ হয়ে গেল বিদ্যুৎ সরবরাহ। হোটেলের অবশ্য নিজস্ব জেনারেটর আছে। সেটি চালু হতে কিছু কিছু আলো জ্বলল। তবে একটু পরেই ঘরে ঘরে হোটেলের বেয়ারারা গিয়ে বলে এল 'এরকম বৃষ্টি-বাদলায় কারেন্ট চলে গেলে সাধারণত আর মাঝরাতে ফেরে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আর সারারাত জেনারেটর চালু রাখা যাবে না। তাই রাতের খাওয়া সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি। সবাই খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলে জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

হোটেলের ডাইনিং হলে সব অতিথিদের ডিনার হয়ে গেল রাত দশটার মধ্যেই। ঘরে ফিরে জুত করে বসল দীপক আর রণিত। জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার। মস্ত খোলা জানলার ওপাশে আরও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জঙ্গল। তবে গরম নেই মোটেই। বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় কেমন একটা শীতশীত ভাব। হঠাৎ দীপক বলে উঠল, 'আশ-পাশটা দেখে কেমন মনে হচ্ছে না, আমরা সেই গঞ্জালেস আর রোবার্তোর সময়ে ফিরে গেছি।' 'যা বলেছিস', 'হাসতে হাসতে বললে রণিত,' মনে হচ্ছে যেন ওই জঙ্গলের ওপাশেই কুন্ডা গ্রাম। কুপি জ্বলছে। শিবা আর কুঙ্কু শোবার আয়োজন করছে। বুড়ো কিন্তু গল্প বলে ভালো।' 'আমার কিন্তু একটু অদ্ভুত লাগছিল। বুড়োর কথাবার্তায় কেমন যেন একটা রহস্যের ভাব আছে। যেন সব বলছে না। কিছু কথা চেপে রাখছে।' দীন্যকর কথা শুনে রণিত বলল, 'ওটা তো টাকা নেওয়ার কৌশল। কাল দেখবি শেষটা বলার জন্য আবার টাকা চাইবে। আর টাকা যখন দিতেই হবে তখন আমরা আর কষ্ট করে কেন ভাবব। তার থেকে চল এখন শুয়ে পড়ি। কাল ভোরে উঠে বেরোব।'

...আংটা থেকে সাবধানে খুলে নিল একটি বড়ো চাবি...

রাত তখন কটা জানা নেই। ঘুম ভেঙে গেল দীপকের। অভ্যাসমতো সময় দেখতে বালিশের পাশে মোবাইল হাতড়ে দেখে মোবাইল নেই। চমকে উঠে বসে দীপক। একী ঘরটা এরকম অন্যরকম হয়ে গেল কী করে? দুটো খাটের বদলে এখন একটা খাট। ঝালর লাগানো মশারি। কিন্তু রণিত কোথায় গেল? খাট থেকে তাড়াতাড়ি নামতেই সামনের আয়নায় চোখ পড়ল। একজন ছিপছিপে চেহারা পোর্তুগিজ যুবক। ফর্সা মুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ। পরনে ফ্রিল দেওয়া জামা আর পাতলুন। কিন্তু রণিত কোথায়? নিঃশব্দে দরজা

খুলে বেরিয়ে এল যুবক। দুর্গের সংকীর্ণ গলিপথ ধরে এসেছে। একটা ঘর থেকে প্রবল নাকা ডাকার আওয়াজ আসছে। হালকা হাতে সেই ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল যুবক। খাটের ওপর একজন কেউ ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে একটু চোখ সইয়ে নিয়ে যুবক দেওয়ালে ঝোলানো আংটা থেকে সাবধানে খুলে নিল একটি বড়ো চাবি। ঘর থেকে বেরিয়ে গলি পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে বেশ কয়েকটা বাঁক পেরিয়ে তারপর নামতে লাগল নীচে। সিঁড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে লোহার দরজা। চাবি দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠল রণিত, 'রোবার্তো? তুমি কী করে এলে?' 'চুপ কথা বোলো না। রক্ষীরা সব ঘুমোচ্ছে। এই সুযোগে তোমাকে পিছনের দরজা দিয়ে বার করে দেব।' "কিন্তু তুমি? তোমার কী হবে? গঞ্জালেস ঠিক বুঝতে পারবে তুমিই আমাকে ছেড়ে দিয়েছো। তুমিও আমার সঙ্গে চল।' 'তা হয় না শিবা। এরা আমার জাতভাই। আমাকে এদের সঙ্গেই থাকতে হবে। কিন্তু তুমি আর দেরি কোরো না। কেউ জেগে গেলে তোমাকে আর বাঁচাতে পারব না।' শিবা একটু ভাবলে, তারপর বললে, 'তুমি শুধু ভোর হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থেকো। সকাল হতেই আমি সব গ্রামের ছেলেদের নিয়ে আসব দুর্গ আক্রমণ করতে।' দুজনে নিঃশব্দে উঠে এল ওপরে। খুব সাবধানে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে রোবার্তো শিবাকে নিয়ে এল জঙ্গলের দিকে দুর্গের খিড়কির দরজায়। কিন্তু দরজা খোলার সময় হাত ফসকে পড়ে গেল লোহার খিল। মুহূর্তে জেগে উঠল রক্ষীরা। 'পালাও শিবা পালাও' কোনোরকমে শিবাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে রোবার্তো। বিদ্যুৎগতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শিবা। রক্ষীরা ছুটে এসে ধরে ফেলল রোবার্তোকে। খবর গেল গঞ্জালেসের কাছে।

'কেন ছেড়ে দিয়েছ তুমি বন্দীকে?' ক্রুর হেসে জানতে চাইল গঞ্জালেস। তার নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে রোবার্তো বলল, 'ও আমার বন্ধু। তুমি ওকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছিলে।' 'কেল্লাদারের আদেশ অমান্য করেছ তুমি। তোমার শাস্তি মৃত্যু। কাল সকালের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে রোবার্তোকে। হুকুম দিয়ে চলে গেল বিশালদেহী গঞ্জালেস।

ফাঁসিকাঠ তৈরি। হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে রোবার্তোকে। পূবের আকাশ আস্তে আস্তে লাল হচ্ছে। আর বেশিক্ষণ নয় বুঝতে পারছে দীপক। সূর্য উঠলেই গঞ্জালেসের হুকুম তামিল হবে। কিন্তু দুর্গের বাইরে কীসের অত গণ্ডগোল? কারা ভেঙে ফেলতে চাইছে মূল ফটক? রক্ষীরা দৌড়াদৌড়ি করছে কেন?

ধড়মড় করে উঠে বসল দীপক। সকাল হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। জানলার বাইরে বৃষ্টি ভেজা সবুজ বন। পাশের খাটে বসে কীরকম যেন অস্বাভাবিকভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে রণিত? 'তুই কি কোনো স্বপ্ন দেখলি?' ভাঙা গলায় জানতে চাইল দীপক। 'হ্যাঁ' একটু চুপ করে থেকে কেমন যেন নিশ্চিত গলায় রণিত ফের বলল 'একই স্বপ্ন।'

বেলা বেড়েছে। আজই পানাজিতে ফিরছে দীপক আর রণিত। হোটেলের বিল চুকিয়ে বেড়িয়ে পড়ল দুজনে। রণিত বাইক চালাচ্ছে, পিছনে দীপক। বাঁক ঘুরতেই পাথরে বসা টুপি মাথায় বুড়ো। একটুও স্পিড না কমিয়ে বেরিয়ে গেল রণিত। টুপিটা মাথা থেকে খুলে বুড়ো শুধু একটু অদ্ভুত হাসলে।

ভূতের সঙ্গে মোকাবিলা

রাজেশ বসু

কলমিপুরের মাঠে ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছিল নন্তু আর চিকু। মন খারাপ দুজনেরই। টিম হেরে গিয়েছে। তাও দু-দশ রানে না। একচল্লিশ রানে। চিকুরা এসেছিল অতিথি খেলোয়াড় হিসেবে। কাছাকাছি দু-পাঁচটা গায়ে অলরাউন্ডার বলে নাম আছে ওদের। দস্তুরমতো খাতির করেই এনেছিল কলমিপুর ক্রিকেট ক্লাব। টিমকে জেতাতে পারলে নতুন ব্যাট তো আছেই সঙ্গে ফেলুদাসমগ্র কিনে দেওয়ারও কথা। এপ্রিল মাস পড়েছে। এ গরমে ক্রিকেট কে খেলে এখন। পারিতোষিকের লোভেই আসা।

কিন্তু, কপাল কাকে বলে! কী যে হল আজ, চূড়ান্ত বাজে খেলল দুজনেই। বোলিং ব্যাটিং দুটোতেই ভয়ংকর ভরাডুবি! বল করে উইকেট তো একটিও জোটেনি, উলটে ছ-টি ওভারে দুজনে মিলে রান দিয়েছে সত্তর। ব্যাটেও একই অবস্থা। দুজনের মিলিত অবদান মাত্র আটটি রান। নন্তু পাঁচ, চিকু তিন।

কলমিপুরের ছেলেরা তো বেজায় খাপ্পা। এই নিয়ে পরপর তিনবার তারা হারল মাখনপল্লির কাছে। মাথা গরম সকলের। এবং যত দোষ চিকুদের ওপর। কী দরকার ছিল নিজেদের ছেলে না-খেলিয়ে সবুজগড় থেকে প্লেয়ার আনার। চিকুদের সামনেই অনেকে উষ্মা প্রকাশ করেছে। এমনকী ওদেরকে যে সাইকেল করে আবার সবুজগড়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, সে-ব্যাপারটা নিয়েও কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অগত্যা দুজনকে পায়ে হেঁটেই বাড়ির পথ ধরতে হয়েছে। রাস্তা নেহাত কম না। সাইকেলেই জোর প্যাডেলে লাগে পৌনেঘন্টার কাছাকাছি। হাঁটলে ঘন্টা দুয়েকেরও বেশি লেগে যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা এসব ক্ষেত্রে গল্পে যেমন হয়, তেমনি আর কী? মানে দুর্গম পথ। বাঁশঝাড়ে ভরা জঙ্গল, ভূতপ্রেত অধ্যুষিত শ্মশান, শতাব্দীপ্রাচীন হানাবাড়ি, ইত্যাদি সবই পড়ে এই শ্মশানখালির জঙ্গুলে রাস্তায়। অবশ্য অন্য পথও আছে। একটু ঘুরপথে গিয়ে গাড়িচলা পিচরাস্তা দিয়ে যাওয়া। এসেছিলও ওই পথে। কিন্তু সে তো কলমিপুরের ছেলেদের সাইকেলে চেপে। হুস করে চলে এসেছিল। সে পথে এখন পায়ে হাঁটলে অন্তত আরও ঘন্টাখানেকের দেরি। সন্ধে গড়িয়ে রাত হবে। একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে হবে। বই নিয়ে বসা আছে। আগামীকাল অঙ্ক পরীক্ষা। করালীস্যার কঠিনকঠিন সব অঙ্ক করতে দেন। না-পারলেই যাচ্ছেতাই শাস্তি। নীচু ক্লাসে গিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে গোটা একটি পিরিয়ড। কী লজ্জা, কী লজ্জা! এক বলে বোল্ডআউট হয়ে যাওয়াও কিছু না এর কাছে। সুতরাং যতই বিপজ্জনক পথ হোক, উপায় নেই কোনো।

নন্তু একটু ভীতু প্রকৃতির। ছাতিমতলার মোড়ে এসে বলল, "কাজটা ঠিক হচ্ছে না রে চিকু। বড়ো রাস্তা ধরেই যাই। এখনি যা ঘুম পাচ্ছে বাড়ি ফিরে কতটুকুই বা পড়তে পারব। শাস্তি আছেই কপালে।"

"তার চেয়ে বল না বাবা ভয় পাচ্ছিস।" বলল চিকু, "কী দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে সেটা ভাবছিস না কেন। ভুতুমপাগলার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

"ওরে বাবা।" আঁতকে উঠেছে নন্তু। কারণও আছে। ভুতুমপাগলা ওদের গাঁয়েরই লোক। পাগল বললেও ঠিক যেন পাগল না। ভ্যাগাবন্ডগোছের। বয়সের গাছপাথর নেই। ভবঘুরে হয়ে দিনরাত টোটো করছে। কাজকর্ম কিছু করে না। খাবার জুটলে খেল, না-জুটলে খেল না। আক্ষেপ নেই কিছুতেই। রোগা লিকলিকে চেহারা। দাঁড়কাকের মতো গায়ের রং। অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে ভূত বলেই মনে হয়। অনেকে তাই ভুতুম বলে ডাকে। আসল নাম কী ছিল, বা আদৌ কিছু ছিল কিনা কেউ জানে না। সে নিজেও হয়তো জানে না। যা হোক, এই ভুতুমপাগলা হঠাৎই মাসখানেক ধরে নিখোঁজ। জানা গেল অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার। গ্রামের খগেনমুদি সংবাদটি আনেন। জেরান্ডসাহেবের ভাঙাকুঠির সামনে চোখ উলটে মরে পড়েছিল সে।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়েছিল। তবে লাশ পাওয়া যায়নি। তদন্তও হয়নি আর। পথের মানুষ পথেই মরেছে, কে আর অত খোঁজ-তালাশ করে!

তা ছাড়া ভূতেও লাশ গায়েব করে থাকতে পারে। এমন কথাই অনেকে ভেবেছিল। আসলে জেরাল্ডসাহেবের ওই বাড়িটির সুনাম নেই এ অঞ্চলে। দেড়শো-দুশো বছর বয়স। কোনো এককালে সাহেব নিজেই থাকতেন। নীলের ব্যবসা ছিল তার। কত গরিব চাষিদের যে সর্বস্বান্ত করেছেন হিসেব নেই কোনো। শেষটায় অবশ্য তাদের হাতেই মারা যান। সেই থেকে বাড়িটি ওভাবে পড়ে আছে। এখন তো দস্তুরমতো একটি হানাবাড়ি। রাতবিরেতে বাঁশি বেজে ওঠে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কত রকমের সব অশরীরীরা নাকি আসর বসায় সেখানে। স্বয়ং জেরাল্ডসাহেবকেও লম্বাঝুল কোট, চোঙাদার প্যান্ট আর হাঁটু অবধি চামড়ার বুটজুতো পরে ঘুরতে দেখা যায় হামেশাই। তবে এসব কিনা মাঝরাতের ব্যাপার। দিনের আলোয় কেউ কখনও ভয় পায়নি এ পথে। বেচারি ভুতুম। পাগল মানুষ। অসময়ে গিয়ে হয়তো হাজির হয়েছিল। অপদেবতারা ঘাড় মটকে মেরেছে তাকে।

"ভাগ্যিস বললি। ভুতুমপাগলের কথাটা ভুলেই গেছিলাম। চল ফিরে বড়ো রাস্তা ধরি। গাড়িও পেয়ে যেতে পারি একটা।" বলল নন্তু।

"গাড়ি পেয়ে যেতে পারি একটা।" নন্তুর কথাটা রিপিট করল চিকু। "কী করে গাড়ি চড়বি? পকেটে এনেছি কিছু। আসল কথাটা বল ভয় পাচ্ছিস।"

কথাটা ঠিক। একদম খালি পকেটে এসেছে ওরা। আসলে কলমিপুরের ছেলেরা যেভাবে খাতির-টাতির করে নিয়ে এসেছিল, টাকাপয়সার কথা মনেই আসেনি একদম। এমনকী নিজেদের ক্রিকেট ব্যাটটিও সঙ্গে নেয়নি। অভ্যস্ত ব্যাটে খেললে ব্যাটিংটা অন্তত একটু ভালো করা যেত। তবে বন্ধুর কাছে ভীতু হতে রাজি না নন্তু।

"ধুস। ভয় পাব কেন?" বলল ও, "আসলে আজকের দিনটা কেমন অপয়া দেখছিস না।— তা ছাড়া আকাশের অবস্থাটা দ্যাখ, বড়োরাস্তা ধরে গেলে বৃষ্টির মধ্যে কোথাও একটা মাথা বাঁচাবার জায়গা অন্তত পাব।"

এ কথাটা ঠিক। চিকু তাকাল আকাশের দিকে। খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়াতে ঘড়ির সময়ে ঢের বিকেল এখন। কিন্তু, হঠাৎই কোত্থেকে কুচকুচে কালো মেঘের পাল এসে আদিগন্ত একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। ভর বিকেলেই হঠাৎ সন্ধের অন্ধকার। হাওয়াও দিচ্ছে বেশ। ঝড়টড় উঠতে পারে। দুটি লোক বোধ হয় জঙ্গুলে রাস্তা ধরেই ফিরল। কাঁধে সবজির ঝুড়ি। হাত নেড়ে তারাও বারণ করল। "বাবারা, ঝড় আসছে। গতিক সুবিধে না। বাড়ি যাও শিগগির।"

ব্যস। সতর্কবাণী শুনেই নন্তু আবার দোনোমোনো। বলল, "চল চিকু, এখনও টাইম আছে, ফিরে গিয়ে বড়ো রাস্তা ধরি।"

"ছাড় তো। এমন অ্যাডভেঞ্চারটা মিস করে কেউ!" বলল চিকু। ওর আসলে বেশ লাগছে। অনেকদিনের ইচ্ছে পায়ে হাঁটে এই রাস্তায়। ওর ছোটোকাকা সাইকেল চেপে নতুনবাজরে কম্পিউটার শিখতে যায়। কলমিপুর পেরিয়ে নতুনবাজার। শর্টকাটে এই শ্মশানখালির পথেই যাওয়া-আসা করে ছোটোকাকা। চিকুকেও বারকয়েক সঙ্গে নিয়েছে। মাটির সরু রাস্তায় বিছিয়ে থাকে গাছগাছালির শুকনো পাতা। সাইকেলের চাকা পড়লেই চুড়মুড় করে শব্দ ওঠে। এদিক-ওদিক থেকে পাখি ডাকে কত। আর সবকিছুরই সঙ্গে মিশে থাকে বুনো-বুনো কেমন একটা গন্ধ। দারুণ লাগে ওর। তবে জেরাল্ডসাহেবের নীলকুঠি বা শ্মশান কোনোটাই দেখেনি ও। সেটা আসলে একটু অন্যদিকে। শালতোড় নদীর দিকে। শ্মশানটাও সেদিকে। যদিও শ্মশান-টশানের কোনো চিহ্ন এখন আর নেই। কোনকালেই উঠে গিয়েছে সব। আর জঙ্গল হলেও বুনো জন্তু-টন্তুও নেই একটিও। বহুকাল আগেই তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং ভয় পাওয়ারও কিছু নেই এখন। সে-কথাই নন্তুকে বোঝাল ও। আর বৃষ্টি যদি নামেই, তাতে তো আরও ভালো। কতদিন বৃষ্টিতে ভেজেনি। মনের

সুখে ভিজতে পারবে। বাড়ি ফিরে অবশ্য বকুনি খেতে হবে। তা আর কী করা যাবে। চটপট পড়তে বসে গেলেই হল।

কিন্তু নন্তুর কথাই ঠিক যেন। সত্যিই বড়ো বেগতিকের দিন আজ। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই শনশন শব্দে ঝড় উঠে গেল। গাছগাছালির বিষম উতালপাথাল অবস্থা। এইবুঝি ভেঙে পড়ে আর কী। আর আকাশ এমনই কালো হল, সন্ধে পেরিয়ে রাত-ই নামল যেন। ঠিকপথে যাচ্ছে কিনা সেটা ঠাহর করাই দায়। বৃষ্টিও শুরু হয়েছে বড়োবড়ো ফোঁটায়। থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে আকাশে।

বিশাল একটা অশ্বত্থগাছের নীচে দাঁড়াল ওরা। নন্তু বলল, ''দেখলি চিকু, তখনই বললাম ফিরে চল।''

''আমার কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে।'' চিকু বলল। ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই সামনের আকাশে চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ ঝলক এবং পরমুহূর্তেই বাজপড়ার প্রচণ্ড কানফাটানো আওয়াজ। এরকম সময়ে গাছের নীচে দাঁড়াতে নেই একদম। বাজ নাকি গাছের মাথাতেই পড়ে। ছুটতে শুরু করল দুই বন্ধু। এমন ভাগ্য, এবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টিও নেমে পড়ল মুষলধারে। সঙ্গে তুমুল ঝড় তো আছেই। নজর পুরো ঝাপসা। গাছের ডালও ভাঙছে পটাপট। কোনদিকে পালাবে ওরা বুঝতে পারছে না ঠিক। যা হোক, এমনি করে মিনিটখানেক ছুটতে মনে হল সামনে নদী বইছে। শালতোড় নদী।

নন্তু চিৎকার করে বলল, ''থাম চিকু। আমরা শ্মশানের দিকে চলে এসেছি রে।'' দাঁড়িয়ে পড়েছে ও।

চিকুরও তাই মনে হচ্ছে। সেও দাঁড়িয়েছে। কিছুটা দূরে একটি বাড়ির আভাসও দেখা যাচ্ছে। বাড়ি না-বলে বাড়ির ভগ্নাবশেষই বলা ভালো। ওটিই কী তবে জেরাল্ডসাহেবের নীলকুঠি! চিকুর বুকটা ধক করে উঠল। যাবে কি ওখানে। বৃষ্টির হাত থেকে তো বাঁচা যাবে আপাতত।

এমন সময় কে যেন ইংরেজিতে 'হেল্প, প্লিজ হেল্প মি' বলে উঠল খুব কাছ থেকেই।

চমকে উঠেছে দুই বন্ধুই। নেহাত পরক্ষণেই বিজলির আলোতে শব্দের উৎসটি দেখতে পেল ওরা। কয়েক পা তফাতে মাটির ওপরে উবু হয়ে বসে আছে একটি মানুষ। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলোতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, মানুষটি বিদেশি। সাদামানুষ।

লোকটি এবার ভাঙাভাঙা বাংলাতেই বলল, ''প্লিজ একটু হেল্প করো আমাকে। পা-টা মচকেছে মনে হচ্ছে।''

লোকটির কথার ধরনে চিকু সাহস পেল। জেরাল্ডসাহেবের ভূত নয়। ভূতেরা স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারে না। নাকিসুরে কথা বলে তারা। তা ছাড়া লোকটি গোলগলা টিশার্ট আর ঢাউস একটা বারমুডা পরে আছে। জেরাল্ডসাহেবকে নিয়ে যেসব গল্প শুনেছে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। সাহসে ভর করে এগোতে গেল ও।

কয়েক পা তফাতে মাটির ওপরে উবু হয়ে বসে আছে একটি মানুষ...

"কী করছিস তুই?" হাত টেনে ধরেছে নন্তু, "ভূতটুত না তো !"

"ধুস, দেখছিস না। দিব্যি জলজ্যান্ত মানুষ। পা পিছলে পড়ে গেছে। আমাদের হেল্প চাইছেন।"

লোকটি মনে হয় ওদের কথা শুনে ফেলেছেন। বললেন, "আমাকে ভয় কোরো না। আই অ্যাম টমি লি। ছবি আঁকি। পেন্টার। তোমাদের মতোই বিপদে পড়ে গেছি। একটু হেল্প করলে উঠে দাঁড়াতে পারি।"

"সিওর আঙ্কল।" বলল চিকু। গ্রামের বাংলা মিডিয়ামে পড়লে কী হবে। দু-চার শব্দ ইংরেজি সে-ও বলতে পারে। নন্তুর হাত ছাড়িয়ে টমিসাহেবের হাত ধরল ও। দিব্যি উষ্ণ স্পর্শ। ভূত হলে বরফের মতো ঠান্ডা হত। নিশ্চিন্ত বোধ করল ও।

"থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয়।" বললেন টমিসাহেব। চিকুর কাঁধে বাঁ-হাতটি রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিদ্যুতের আলোতে বোঝা যাচ্ছে চিকুর অনুমান ঠিক। বয়স হয়েছে তার। মুখের চামড়ায় হাতের চেটোর মতো অজস্র আঁকিবুকি। শীর্ণ মুখটিতে অতিকায় একটি নাক। কুতকুতে চোখ। মাথায় একটি গোল বেতের টুপি। তার

চারিধার দিয়ে জল পড়ছে গড়িয়ে। ডান পা-টি একটু তুলে রেখেছেন। মাটিতে ফেলতে পারছেন না। ভালোরকমই লেগেছে। ভরসা পেয়ে নন্তুও এগিয়ে এসেছে এবার।

''লেটস গো মাই বয়েজ। ওই বাড়িটায় শেলটার নিই আমরা। এভাবে ভিজলে ধুমজ্বরে পড়ব।''

নন্তুর বুকটা ধড়াস করে উঠেছে। ওই বাড়িটায় যাবে মানে! ওই বাড়িটাই তো জেরান্ডসাহেবের কুঠি। ভূতবাংলোও বলা যেতে পারে। কিন্তু চিকুকে বারণ করার অবসর পেল না সে। ইতিমধ্যেই 'আয় রে নন্তু' বলে হাঁটা লাগিয়েছে ও বাড়িটার দিকে। নন্তু কী করে। সে-ও চলল পিছনে। ভরসার অবশ্য আর একটি কারণ ঘটেছে, লোকটির জুতোসুদ্ধ পা ঠিক ঠিক পড়ছে। মানে ভূতেদের মতো উলটোদিকে না। তবু ওর মনের মধ্যে জোঁকের কামড়ের মতো ভয়টা থেকেই গেল।

দু-তলা বাড়ি। এককালে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায়-জায়গায় ইটের স্তম্ভের মতো জেগে আছে। কঙ্কালসার দেয়ালের ফাটলে-ফোঁকরে বট-অশ্বত্থের ছড়াছড়ি। সাপের মতো শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে তারা। বাড়ির সামনেটাতেও এত ঝোপঝাড়ের জঙ্গল ভিতরে যাওয়ার পথটাই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তবে সামনের গাড়িবারান্দার ছাদটি অটুট এখনও। ঝোপঝাড় কোনোমতে অতিক্রম করে ওরা তিনজন এসে দাঁড়াল সেখানে। ভিজে চুপ্পুস সকলেই। ঝোড়ো হাওয়াতে শীত করছে রীতিমতো। বৈশাখ মাসেও দাঁতে ঠকঠকানির মতো অবস্থা। সামনেই কয়েকধাপ সিঁড়ি। শেষ হয়েছে বাড়ির সদর দরজায়। যার একটি পাল্লাই অবশিষ্ট এখন। ঝড়ের ঝাপটায় সেটি দমাদ্দম বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। সব মিলিয়ে কেমন একটা গা ছমছমে ভুতুড়ে পরিবেশ। এর মধ্যেই টমিসাহেব হঠাৎ বললেন, ''লেটস এন্টার দিজ হন্টেড হাউজ।''

কথাটা দু-বন্ধুরই কানে কেমন শোনাল। নন্তুর মনে হল জোঁক না, একটা বোলতাই বুঝি হুল ফোটাল কুটুস করে।

''নাথিং টু ফিয়ার অ্যাবাউট। ওদের ভয়চকিত ভাবটি দেখেই বুঝি বলে উঠলেন টমিসাহেব, তার পায়ের ব্যথাটা কমেছে মনে হয়। চিকুর হাত ছেড়ে দিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলি পেরিয়ে গেলেন। বাড়ি খাওয়া পাল্লাটি একহাতে চেপে ধরে ডাকলেন ওদের, ''আরে এসো, এসো, যা কন্ডিশন হয়েছে বাড়িটার, হন্টেড বললাম তাই। ঢুকে পড়ো। বাইরে সাপটাপ থাকতে পারে।''

কথাটা ঠিক। চিকুও সেই ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কিচকিচ-খচরমচর-কটকট গা শিরশিরানি সব আওয়াজ আসছে কানে। তবে পোড়োবাড়ির ভিতরে যে এইসব সরীসৃপ বা পোকামাকড় থাকবে না এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। হাওয়া দিচ্ছে এমন জলের ছাঁটেই নাকানি-চোবানি অবস্থা প্রায়। সিঁড়ি বেয়ে টমিসাহেবের পাশে দাঁড়াল ওরা। তারপর তাকে সামনে রেখে ভিতরে ঢুকল একে একে।

নজর চলে না মোটেই। চাপচাপ জমাট অন্ধকার। কেবল বিদ্যুৎ চমকের হঠাৎ-হঠাৎ যেটুকু আলো ভাঙা জানালা-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে, ঘরটি যথেষ্ট বড়ো। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁসে ফুলকারি ডিজাইনের লোহার রেলিংওলা একটি কাঠের সিঁড়িও উঠেছে মনে হল। তবে সেই সিড়ি বেয়ে দু-তলায় যাওয়ার উপায় নেই। কারণ নীচের দিকে তিনচারটি ধাপ ছাড়া উপরের দিকে একটি ধাপও আস্ত নেই মনে হল। তা ছাড়া লোহার রেলিংয়ে কতগুলি প্রাণীও ঝুলছে মাথা নীচু করে। ওগুলি যে বাদুড়ের দল বলার অপেক্ষা রাখে না।

নন্তু ফিসফিস করে বলল, ''অ্যাই লোকটা কোথায় গেল রে?''

সত্যি তো। টমিসাহেব এই অন্ধকারে গেলেন কোথায় হঠাৎ। এই তো ছিলেন। এদিক চাইল চিকু। নিকষ অন্ধকারটা চোখে সয়েছে কিছুটা। সিঁড়ির রেলিংয়ে মাকড়সার বিশাল বিশাল জালগুলিও নজরে পড়ছে। বিজলির রোশনিতে চিকচিক করে উঠছে সেগুলি। কিন্তু টমি লি সাহেব নেই কোথাও।

নন্তু বলল, ''চিকু চল পালাই এইবেলা। ভুতুমপাগলার কী দশা হয়েছিল মনে আছে তো! আমার কিন্তু টমিসাহেবকে মোটেই ভালো লাগছে না।''

ভয় চিকুরও করছে। খগেনকাকার কথাটা ওর মনের মধ্যেও উগড়ে উঠেছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ভয় পেলে চলে না। তা ছাড়া ভূতপ্রেতের ব্যাপারটা মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারে নাও ও। তবে এই বিচ্ছিরি পোড়োবাড়িটাতে থাকতে মোটেই ভালো লাগছে না। তার ওপর কী বদখত বোটকা গন্ধ ঘর জুড়ে!

এমন সময় কাঠের সিঁড়ির পিছন থেকে আয়তাকার হলুদ আলো এসে পড়ল এ ঘরে। ওদিকটাতে যে আর একটি ঘর আছে, বোঝা গেল এখন। পরক্ষণেই ওদেরকে চমকে দিয়ে টমিসাহেবের ভারি গলা, "কাম অন মাই বয়েজ। আলো জ্বালিয়েছি আমি।"

বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক এ বাড়িতে আগেও এসেছেন। কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলেছেন। গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

"দেখলি তো, কেমন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলি।" বলল চিকু। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওর। ভয়ের একটা বরফঠান্ডা অনুভূতি ওর মনেও ঢুকেছিল। এখন সেটা একদম নেই। ভূতেরা আর যাই করুক, নিজে হাতে আগুন জ্বালাবে না!

সিঁড়িটার পাশ দিয়ে এ ঘরে ঢুকল ওরা।

মাঝারি ঘর। আগেরটির মতো আসবাবশূন্য নয়। বাঁ-দিকের দেয়াল ঘেঁসে একটি ছোটোখাটো লোহার খাট। সামনে একটি লেখার টেবিল। তার আবার একটি পায়া ভাঙা। পরপর ইট সাজিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে কোনোমতে। ল্যাম্পটা রয়েছে সেই টেবিলের ওপরেই। ফাটলওলা একটি কাচের চিমনি থাকলেও হাওয়ায় দমকে শিখাটা মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে। টেবিলের সামনে একটা কাঠের চেয়ার। যার দুটি হাতলের একটি ভাঙা। অন্যটিতে নিজের বামহাতটি রেখে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন টমিসাহেব।

"সিট ডাউন। সিট ডাউন।" ওদেরকে ঢুকতে দেখেই বলে উঠেছেন তিনি।

লোহারখাটটাতে বসল ওরা। কবেকার খাট কে জানে। বসতেই ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে শব্দ উঠল। শতছিন্ন একটা গদিও পাতা আছে খাটের ওপর। এটিরও বয়সের ঠিক-ঠিকানা নেই। গন্ধ বেরচ্ছে বিচ্ছিরি। নীচু খাট। পা দোলাতে ঠং করে কী একটা গড়িয়ে পড়ল নীচে। মাথা ঝুঁকিয়ে নীচু হয়ে দেখল চিকু। দু-চারটে বাসনটাসন। হাড়ি থালা গ্লাস বাটি, সবই অ্যালুমিনিয়ামের মনে হল। টেবিলের নীচে একটি মাটির উনুনও দেখা যাচ্ছে। কেউ থাকে এখানে। টমিসাহেবই নয়তো! চিকু সেটাই জিজ্ঞেস করল তাকে।

কথাটা শুনলেন না যেন টমিসাহেব। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। টেবিলের পিছনে একটি কপাটহীন জানালা। পেরেক-টেরেক পুঁতে একশো ফুটোর একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটি। হাওয়া বইছে এমন নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে চাদরটি। সেদিকটাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

নন্তু হঠাৎ বলল, "তুমি বলছিলে ছবি আঁকো, রংতুলি প্যালেট কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পাতলা ঠোঁটদুটি এবার সামান্য বেঁকিয়ে হাসলেন টমিসাহেব। কুতকুতে চোখের নীলচে মণিদুটি এই অপ্রতুল আলোতেও জ্বলে উঠল যেন।

"আঁকি তো। পোট্রেট। কিন্তু ক-দিন ধরে আঁকছি না। একই লোকেদের ছবি আঁকতে কত ভালো লাগে! আর রংতুলির কথা বলছ। সব আছে। ওপরের ঘরে। ওখানেই আমার স্টুডিয়ো।"

"কিন্তু ওপরের ঘরে ওঠার সিঁড়ি তো ভাঙা!" কথাটা না-বলে পারল না চিকু। লোকটাকে সুস্থ মাথার মনে হচ্ছে না ঠিক। পাগল হবে নির্ঘাৎ। নয়তো বিদেশ-বিভুঁইয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, এরকম পোড়োবাড়িতে সংসার সাজিয়ে থাকে!

"আমার তো সিঁড়ির দরকার পড়ে না।" ঠোঁটদুটি বেঁকিয়ে আবার হাসলেন টমিসাহেব।

চিকুর এখন কোনো সন্দেহ নেই। ভূত নয়, পাগলের খপ্পরে পড়েছে। এখানে আর একটি মুহূর্তও থাকবে না ওরা। ভিজে জামাপ্যান্টে শীত করছেও খুব। হঠাৎ খেয়াল হল, আশ্চর্য, টমিসাহেব তো সেই গোলগলা গেঞ্জি আর ঢাউস হাফপ্যান্টটাই পরে আছেন। টুপিটাই কোথায় কে জানে। কিন্তু তার পোশাক যে একদম

শুকনো। এত তাড়াতাড়ি জামাকাপড় শুকোলেন কী করে। বুকটা ধক করে উঠল ওর। ব্যাপারটা একেবারেই সুবিধের নয়। নন্তুর হাত ধরে উঠে পড়ল ও।

"কী হল, উঠছ যে তোমরা?" ভুরু কুঁচকে বললেন টমিসাহেব।

নন্তু বলে বসল, "আমাদের ভয় করছে। বাড়ি যাব এখন।"

হো হো করে অট্টহাসি দিয়ে উঠলেন টমিসাহেব। কী ভয়ংকর সে হাসি! ভয়ে হাত-পাগুলো সব পেটের মধ্যে ঢুকে গেল যেন ওদের। আরও কাণ্ড, সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝোলা বাদুড়গুলি এই বিকট হাসি শুনেই যেন হঠাৎ এ ঘরে উড়তে শুরু করে দিল বিচ্ছিরিভাবে।

"যাবে তো তাড়া কী। আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করবে না। আমি যাদের ছবি আঁকি। পিছন ঘুরে দ্যাখো, একজন তো এসেই পড়ল।" কুতকুতে সাপের মতো চোখদুটি নাচিয়ে বললেন টমিসাহেব।

সত্যিই তো। পিছনে তাকাতে অবাক হল ওরা।

দরজার সামনে একটি মানুষ দাঁড়িয়েছে কখন। কী অদ্ভুত দেখতে তাকে। চিকু আর নন্তু দুজনেই ক্লাস সেভেনে পড়ে। পাঁচফিট মতো লম্বা। এই লোকটি ওদের থেকে বড়োজোর-দু-তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে। তবে চওড়ায় অনেক বেশি। গড়নও বেশ। শক্তপোক্ত। বেশিবহুল চেহারা। পরনে কেবল একটি কাপড়মাত্র। কোমরে জড়ানো। কাপড় না-হয়ে গাছের ছালও হতে পারে। দু-হাতে দুটি পাথরের খণ্ড। খুব চকচকে। ল্যাম্পের আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে একটি আদিম মানুষ উঠে এসেছে। লোকটি কিন্তু একটা আওয়াজ করে লোহারখাটে গিয়ে পা তুলে বসল। হাতের পাথরদুটি ঠুকুস-ঠুকুস একমনে। আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুচ্ছে প্রতি ঠোক্করে।

"খুব অবাক হয়েছ তো।" বললেন টমিসাহেব। "তা হওয়ারই কথা। নিজেদের পূর্বপুরুষকে হঠাৎ দেখলে অবাক তো হবেই। ও হল বাসাঙ্গোডিউকা। আটচল্লিশ হাজার সাতশো ত্রিশ দিন বয়স ওর। লেট প্লিস্টোসিন যুগের অধিবাসী। তোমরা তো স্রেফ নিয়ানডার্থাল ম্যান বলেই খালাস। একটি সাপের কামড়ে মরতে হয়েছিল ওকে। ঠিক এ জায়গাটিতেই। মায়া ছাড়তে পারেনি বেচারি। আমার ছবির মডেল হয় মাঝে-মাঝে।"

এ কেমন অসম্ভব কথা। চিকু বুঝল না ঠিক। টমিসাহেব লোকটি যে বাড়াবাড়ি রকমের গোলমেলে তাতে সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু, আদিম মানুষের ভেক ধরে এই লোকটির আবির্ভাব হল কোত্থেকে!

এমন সময় আবার সুর করে বাঁশি বেজে উঠল হঠাৎ। দরজার ওপার থেকে এল যেন শব্দটা। তাকাতে আবার একপ্রস্থ অবাক হওয়ার অবস্থা।

এঘরের আলো চতুষ্কোণ হয়ে বাইরের ঘরে পড়েছে কিছুটা। সেই আলো-আঁধারিতেই দেখা যাচ্ছে ছোটোখাটো একটি লোক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। ইনি অবশ্য আদুর গায়ে নন। জোব্বামতো কিছু একটা পরে আছেন। মুখে সরু নলের মতো যন্ত্রটি বাঁশিই হবে। পিঁইই সুরে আওয়াজটা ওটা থেকেই আসছে মনে হচ্ছে। বেশ দুলে দুলে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন তিনি। কী করে নামছেন, সেটিই মহাআশ্চর্য! শেষের তিনটি ছাড়া একটি ধাপও যে ওই সিঁড়িটিতে অবশিষ্ট নেই।

লোকটি এবার এসে ঢুকল এই ঘরে। বাঁশি থামিয়ে টমিসাহেবের দিকে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে সোজা গিয়ে বসল আদিম মানুষটির পাশে। এবার বোঝা যাচ্ছে সে একজন চিনা মানুষ। মুখের গড়ন এবং পোশাকের ধরনে তাই মনে হয় অন্তত। জোব্বামতো পোশাকটি আসলে একটি চাইনিজ রোব। ড্রাগনের ছবিটবি আঁকা রয়েছে তাতে। লম্বা একটি ঝুলো গোঁফও আছে লোকটির।

টমিসাহেব বললেন, "ইনি তাংচি জিয়ান। ফা হিয়েনের আমলের লোক। ওঁর সঙ্গেই এসেছিলেন। ভারতভ্রমণে নয়, এসেছিলেন ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু এখানকার কুখ্যাত মশার কামড়ে প্রাণটি যায় তার। কী তাংচি ঠিক বলছি তো?"

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল তাংচি। তারপর আবার বাঁশিতে ফুঁ দিল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে অতিকায় একটি লালঠোঁটো সারস এসে ঢুকল ঘরে। পাখিটি সোজা এসে আক্রমণ করল চিনা লোকটিকে।

সে লাফ দিয়ে পড়ল টেবিলে। ইটের পায়া গেল সরে টেবিল পড়ল উলটে। সঙ্গে সঙ্গে লম্ফটিও পপাত ধরণিতলে। চিমনিও ফাটল। আলোটিও নিবল। ঘরজুড়ে বিষম হুলুস্থুল কাণ্ড। সারসের বিকট ডাক। টমিসাহেবের 'কিল ইট কিল ইট' চিৎকার। আদিমমানুষটির আবার এই দৃশ্য দেখে আমোদ জেগেছে মনে। মুলোর মতো দাঁত বের করে হাসছে খুব। লোহার খাটটিও ধাতব ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে তাল মেলাচ্ছে সেই হাসির সঙ্গে। এর মধ্যেই হঠাৎ আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। জানালার চাদর পেরেক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে পড়েছে কোথায়। বৃষ্টি কখন থেমে গিয়ে বাইরের আকাশে আবছা চাঁদের আলো। সেই আলোতে দেখা গেল একটি বিশাল ঘোড়া এসে থামল জানালার সামনে। তার গলায় লাগাম। পিঠে মখমলি জিন। ঘোড়া থেকে নামলেন এক ব্যক্তি। মোগল যুগের মতো পোশাক তার গায়ে। মাথায় পাগড়ি। হাতে উদ্যত তরোয়াল। ক্ষীণ আলোতেও ঝকঝক করছে তার ইস্পাতের ফলা।

''শিগগির আসুন খাঁ-সাহেব।'' টমিসাহেবের গলা শোনা গেল। ''বদমাইশ পাখি গোলমাল শুরু করেছে আবার।''

''কোই বাত নেহি।'' খাঁ-সাহেব জানালা ঠপকে টপকে ঘরে ঢুকলেন। এক্ষুনি গর্দান নেবেন পাখিটির। কিন্তু কিছু করার আগেই সাঁই করে পালিয়ে গেল সারসটি। লালঠোঁটে তাংচির মুখের বাঁশি। বাচ্চাদের মতো হাত-পা ছুড়তে শুরু করেছেন তিনি। ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদেও দিলেন ভ্যাঁ করে। কী যে অদ্ভুতুড়ে সব কাণ্ডকলাপ ঘটছে!

''কুল কুল। নো মোর নয়েজ।'' বলে উঠলেন টমিসাহেব। ''ভালোই হয়েছে আপদ গেছে। কে বলেছিল ওর হাড় দিয়ে বাঁশি বানাতে? পাখি মেরেছে, মাংস খেয়েছ, তাতেও হয়নি। ওর হাড় দিয়ে আবার বাঁশি। চারিদিকে এত বাঁশ, দেখতে পাওনা নাকি! তাও আবার বাজানো চাই যখন-তখন। বাজালেই যখন সে বিরক্ত হয়! যাকগে, আর কথা না, চুপটি করে বোসো এখন।''

তাংচি জিয়ান চুপ করলেন না। দুর্বোধ্য কীসব শব্দ-টব্দ বলে জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে পড়লেন। পাখিটার খোঁজেই গেলেন বোধহয়। বাঁশিটি উদ্ধার করবেন আবার। বাসাঙ্গোডিউকো অবশ্য লক্ষ্মী খুব। সে আবার তার জায়গায় গিয়ে বসেছে। চকমকি পাথরদুটো ঘষছে ঠুকুর-ঠুকুর। আলোর ফুলকি বেরচ্ছে মাঝেমাঝে।

''আপনিও বসুন খাঁ-সাহেব।''

''জি।'' বললেন নতুন আগন্তুক, ''লেকিন এই ছোঁকরা দুজন কে আছেন?''

''ওরা আমার মডেল হতে এসেছে।''

''বহুত খুব বহুত খুব। লেকিন গন্ধ শুঁকে লাগছে এনারা এখনও জিন্দা আছেন!'' বললেন খাঁ-সাহেব। তরোয়ালটি দোলাচ্ছেন অনবরত। পাখি না-মারতে পেরে হাত সুড়সুড় করছে খুব। জানালার পাশটিতে দাঁড়ালেন ঠেস দিয়ে।

টমিসাহেব এবার চিকুদের দিকে ঘুরলেন। এই হট্টগোলে কিছু সংবিত এসেছিল ওদের। কিন্তু পালাতে পারেনি। বাদুড়গুলোর জন্য। বিচ্ছিরি প্রাণীগুলো ঠিক দরজাটা জুড়ে উড়ছিল ভয়ানকভাবে।

''শোনো তোমরা। পরিষ্কার স্পষ্ট কথা বলি এবার। জ্যান্ত মানুষের ছবি আঁকি না আমি। আমার মডেল যখন হতে চেয়েছ মরতে হবেই তখন।''

যেটুকু বা মাথায় বুদ্ধি খেলছিল চিকুর এমন সাংঘাতিক কথা শুনে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তবু মিথ্যে কথাটা মানতে পারল না ও।

''আমরা কখন তোমার মডেল হতে চাইলাম?'' কোনোমতে বলল সে।

টমিসাহেব ওর প্রশ্নটি এড়িয়ে বললেন, ''কীভাবে মরবে, সেটা না-হয় বেছে নিতে পারো। এটুকু ফেভার করতে পারি তোমাদের। বাসাঙ্গোডিউকাকে যে সাপটি কামড়েছিল সেটি এখন তোমাদের পায়ের সামনে। আমার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।''

সত্যি, কথা শেষ না-হতেই হিসহিসানির আওয়াজ পায়ের কাছে। পাঁচ-ছ হাত লম্বা একটি কালো ফণা মেলে দুলছে। নন্তু আর পারল না। অনেক তাণ্ডব সহ্য করেছে সে। এবার মাথা ঘুরে এলিয়ে পড়ল চিকুর ঘাড়ে। চিকু কোনোমতে ওকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর অবস্থাও সঙ্গিন। যে কোনো মুহূর্তে ওরও নন্তুর দশা হল বলে!

টমিসাহেব খুব মজা পেয়েছেন যেন। ধনুকের মতো ল্যাগবেগে শরীরটা নিয়ে নেচে নিলেন একপাক। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই পায়ের যন্ত্রণায় দাঁড়াতেই পারছিলেন না। বললেন, ''অবশ্য খাঁ-সাহেবের তরবারির ফলাটিও পছন্দ করতে পারো। খোদ সুলতান শেরশাহের খাস সৈন্যদলে ছিলেন। তরোয়ালের একটি কোপে একটি আস্ত শালগাছ কাটতে পারেন। হুমায়ুনের গুপ্তচরের হাতে ঠিক এই জায়গাটিতেই নিহত হন। না-হলে উনিই আজ দিল্লির মসনদে বসতেন।''

ধনুকের মতো ল্যাগবেগে শরীরটা নিয়ে নেচে নিলেন একপাক...

চিকু কী বলবে! বলার আছেটাই বা কী! কোন কুক্ষণে যে এ পথে পা বাড়িয়েছিল। কলমিপুর ক্রিকেট ক্লাবের ছেলেগুলির ওপর খুব রাগ হচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হল, এমন নয়তো, ওরাই সেজেগুজে এমন ভয় দেখাচ্ছে চিকুদের। কিন্তু, কেবল অভিনয় করলেই তো হবে না। দুর্দান্ত ম্যাজিকও জানতে হবে। যেভাবে একটির পর একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে। ... নাঃ ভূতের কবলেই পড়েছে ওরা। একটি-আধটি নয়। চার-চারটি জলজ্যান্ত ভূত। এ অঞ্চলেই অপঘাতে মরেছিল। মুক্তি পায়নি হয়ত। তাই এখনও এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দল ভারি করতে ওদেরকেও মারবে এখন। এই টমিসাহেবটি হলেন এদের পান্ডা। কিন্তু সেই নীলকর জেরাল্ডসাহেব কোথায় গেলেন! অবশ্য বাইরের ঘর থেকে খচমচ আওয়াজ আসছে। আবার কোনো প্রাচীন মানুষ এলেন বুঝি। ফোঁসফোঁস করে ক-বার নাকও টানলেন যেন। ভূতেদের কি সর্দি হয়? কে জানে। অনেক কিছুই তো ভুল জানত। ভূতদেরে শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়। আগুন দেখে পালায়। খোনা গলায় কথা বলে। কত কী ! সব ভুল। এবার বুঝি স্বয়ং জেরাল্ডসাহেব-ই আসছেন। ভুতুমপাগলাও আসতে পারে। সে-ও তো মরেছে সম্প্রতি। ভুতুম আসলে অবশ্য ভালো হয়। সে চিকুদের চেনে। কতবার তপনদার তেলেভেজার দোকান থেকে আলুরচপ কিনে খাইয়েছে ভুতুমকে।

''কী হল? অত ভাবনার কী আছে?'' তাড়া দিলেন টমিসাহেব। তারপর ইঙ্গিত করলেন খাঁ-সাহেবের দিকে। বিকট একটি অট্টহাসি দিলেন খাঁ-সাহেব। তরোয়াল হাতে এগিয়ে এলেন চিকুর দিকে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল চিকু। কিন্তু কোনো আওয়াজই বেরল না মুখ দিয়ে। বুকের মধ্যে এত জোরে হাতুড়ি পিটছে, মরেই যাবে বুঝি। এতটুকু শক্তিও নেই শরীরে যে পালাতে পারে। সুযোগ বুঝে বাদুড়গুলি এখন জ্বলন্ত চোখে ওর মাথার ওপর উড়তে শুরু করে দিয়েছে। সাপটিও ফণা মেলে দু-হাতের মধ্যে। আর খাঁ-সাহেব তো আছেনই। তরোয়াল দোলাচ্ছেন ওর নাকের কাছটায়। বাসাঙ্গোডিউকারও যথারীতি ভারি মজা। লোহার খাটে বসে বসেই নাচছে সে। হাসছে বিকট সুরে। কেবল তাই না, জানালাতেও আরও কত মুখ ভেসে উঠেছে। মুখ তো না, এক-একটি কার্টুন যেন। কিম্ভুত কদাকার। যেখানে যত ভূতপ্রেত ছিল মজা দেখতে হাজির হয়েছে যেন।

''নো মোর ফান। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন খাঁ-সাহেব।'' টমিসাহেবের গলা শোনা গেল, একটু যেন অন্যরকম। তার ভরাট কণ্ঠস্বর এই প্রথম একটু কেঁপে উঠল মনে হল। কারণটি কী বোঝার আগেই বিষম একটি কাণ্ড ঘটল হঠাৎ।

চিকুর পিছন থেকে 'তবে রে' বলে কে যেন লাফিয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে। আর চিকুর মনে হল এবার সেও নন্তুর মতোই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আগন্তুক আর কেউ নন, স্বয়ং ভুতুমপাগলা। মেঘ কেটে চাঁদ উঠে পড়েছে ভালোরকম। সামনে পূর্ণিমা হতে পারে। প্রায় গোল চাঁদ। ফুটফুটে আলো। সে আলোতে নজর ভালোই চলে। এবং তাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, একমুখ দাড়িবিশিষ্ট কঙ্কালসার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটি হল ওদের গ্রামের ভুতুমপাগলা। খগেনমুদি যাকে নিজের চোখে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন মাসখানেক আগে!

ভুতুম ঘরে এসেই জোর চেল্লামেল্লি শুরু করেছে।

''সব ভাগো এখান থেকে। এক্ষুনি। ঘরটার কী অবস্থা করেছে অ্যাঁ! লম্ফ ফেলেছে? বিছানা নষ্ট করেছে। টেবিল উলটেছে।''

চিকু এখন ঘরের স্যাঁতসেঁতে ফাটা মেঝেতে বসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে থাকার মতো জোর নেই পায়ে। নন্তুকেও কোনোমতে নামিয়ে দিয়েছে মেঝেতে। তার বোধহয় হঠাৎ জ্ঞান এসেছে। গোঁ গোঁ শব্দ আসছে ওর মুখ থেকে। না-আসাই আশ্চর্যজনক। চিকুর নিজের স্বরযন্ত্রটি নির্ঘাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে, নয়তো সে-ও এমন ভূতে পাওয়া আওয়াজ করত। এবং এখনও অবধি যে জ্ঞান হারায়নি সেটিও বোধ হয় অলৌকিক কোনো উপসর্গ।

ভুতুমের লাফালাফি আর চিৎকারে খাঁ-সাহেব হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেলেন। তরোয়াল খসে পড়ল তার হাত থেকে। তারপর, ...কী অসম্ভব দৃশ্য, তিনি নিজেও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেলেন অন্ধকারে। কেবল খাঁ-সাহেবই না, চিকু দেখল ওর পায়ের কাছের সাপটিও উধাও হয়েছে কখন। বাসাঙ্গোডিউকো তো বটেই, এমনকী স্বয়ং টমিসাহেবও। সকলেই প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত মুখে খাঁ-সহেবের মতোই গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপরে যে বাদুড়গুলি ভয়ানকভাবে উড়ছিল, সেগুলিও কোথায় যেন অদৃশ্য হল। জানলার বাইরেও ভীষণদর্শন মুখ নেই কোনো। একা ভুতুমের ভয়ে সব ভূত পালিয়েছে।

"আরে বড়োভাই, তোমায় চেনা ঠেকছে যে, আমাদের চিকু না?" ভুতুম বলল। সে হাঁটুগেড়ে বসেছে চিকুর সামনে।

চিকুর গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু মন বলছে ভুতুম ভূত হলেও ভালো ভূত। টমিসাহেবের মতো খারাপ ভূত না।

"এখানে কী করছিলে বড়োভাই?" জিজ্ঞেস করল সে, "আর ওটি, চিনতে পারছি না ঠিক। পরানদার ছেলে মনে হচ্ছে, কী যেন নামটা?—ব্যাটারা আমার লম্ফটাও ভেঙে দিয়েছে। কত কষ্টে জোগাড় করেছিলাম।"

চিকুর বুকের ধড়পড়ানিটা একটু কমে আসছে যেন। শরীরের বলটাও ফিরছে একটু একটু করে। কোনোমতে বলল, "নন্তু।"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। আহা বড়ো ভালো ছক্কা মারে। দিশি কুমড়োর ছক্কাও হার মানে। এমনকী পাখির হাড়ের বাঁশিও।"

এই রে, আবোল-তাবোল বকছে ভুতুম। মরে গেলেও পাগলামিটা রয়ে গিয়েছে। ভাবল চিকু। তবে এখন ওরা পালাতে পারে এখান থেকে। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, নন্তুকে নিয়ে। সে মনে হচ্ছে অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছে আবার। একটু আগেই যেরকম গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। একটু জল পেলে ভালো হত। সাহস করে উঠে দাঁড়াল চিকু।

তক্ষুনি একটা কাণ্ড ঘটল। ভুতুম হঠাৎ ওর পা জড়িয়ে ধরে প্রায় শুয়েই পড়ল। "আমার কথা কাউকে বোলোনি বড়োভাই। আমি এখানে বড়ো সুখে আছি। সব্বাই জানে ভুতুমব্যাটা মরেছে গিয়ে। মরব কেন? দিব্যি আছি। এদিক-ওদিক ঘুরছি। বনের ফলপাকড় খাচ্ছি। পাখিটাখি দেখছি। আর রাতে এখানে এসে চার-পা তুলে ঘুম দিচ্ছি।"

"মানে?....খগেনকাকু যে বলল ...." পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল চিকু।

"আমি মরে গেছি!" কথা কেড়ে নিয়ে বলল ভুতুম, "সে তো আমি ওকে ভয় দেখিয়েছিলাম। হাড়কেপ্পনটা ইদিকে এসেছিল কেন কে জানে। মনে হয় বড়ো বাইরে-টাইরে পেয়েছিল হঠাৎ। ব্যাটাকে দূর থেকে আসতে দেখেই চোখ উলটে মড়া সেজে পড়ে রইলাম। কী বলব। একদিন যা দুঃখ দিয়েছিল আমায়। সারাদিন খাওয়া জোটেনি। দোকানে গিয়ে বললাম অন্তত একটা হজমিগুলি দাও। অনেক করে চাইতে তা সে দিল বটে, তবে গোটাটি না, আধখানা ভেঙে আবার বোয়ামে পুরে রাখল। ভাব দেখি, পাগল কেমন। আমাকে দেখে সেদিন এমনি পালাল, কী বলব, চালের বস্তাটা যে সাইকেল থেকে খসে গেল খেয়ালই করল না। সে চাল এখনও ফুটিয়ে খাচ্ছি।"

"কিন্তু..."

"বুঝেছি।" বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল ভুতুম, "তেনাদের কথা বলছ তো। না বড়োভাই। ওদের নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। দুটো ধমক দিলেই পালায়। আসলে ভূত তো সব। শরীর-ই নেই, করবেটা কী! বেশ ভোল পালটে সঙ সেজে ভয় দেখায় খালি। ভয় না-পেলেই হল। দেখলে না দাবড়ানি দিলাম কেমন। তোমরা নেহাত পাগল তাই এমন অনাছিষ্টিটা করল।"

চিকুর মনে হল সত্যিই তাই। আসল পাগল ওরাই। আর ভুতুমপাগলা হলেও সত্যি পাগল না। বলল, "একটু জল পাওয়া যাবে?"

"জল আছে। ফল আছে। মনে কত বল আছে।" বলে একলাফে লোহার খাটের নীচ থেকে একটা মাটির কুঁজো টেনে বের করলে সে। সেই ঠান্ডা জল মুখে পড়তে নন্তুর জ্ঞান এল তৎক্ষণাৎ। পরক্ষণেই অবশ্য ভুতুমকে দেখে ভিরমি খাচ্ছিল সে। কোনোমতে ব্যাপারটা বোঝাল ওকে চিকু। ভুতুমকেও বলল কীভাবে এখানে এসে পড়েছিল তারা।

সব শুনে ভুতুম বলল, "তোমাদের একটু এগিয়ে দিচ্ছি। তবে জেরার মুখে আমার ডেরার কথাটা বলে বোসো না যেন।"

শেষমেষ বাড়ি যখন ফিরল ওরা তখন রাতের খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে প্রায়। অবশ্য বকুনি খুব একটা হল না। ছেলেরা যে ওই খারাপ পথ অতিক্রম করে ভালোয়-ভালোয় বাড়ি ফিরেছে, এটাই ভাগ্যি অনেক। চিকুর মা শুধু বললেন, "কাল সকালে একটু তাড়াতাড়ি উঠো। অঙ্কগুলো একটু দেখে যেও। সারাটা দিন তো টইটই করেই কাটিয়ে দিলে।"

তা সে তো চিকু দেখবেই। করালীস্যার টমিসাহেবের থেকে কিছু কম ভয়ংকর নন। আপাতত দরকার একটি লম্বা ঘুমের। যা কাণ্ড হল ! ভুতুম না-থাকলে কী যে হত। কিন্তু একটা খটকা মনে রয়ে গিয়েছে এখনও।

শুতে যাওয়ার আগে দাদুর ঘরে এল সে। দাদু এই বয়সেও অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। আজ মাথাটা একটু ধরেছিল। শুয়ে পড়বেন ভাবছিলেন। চিকুকে ঘরে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবে দাদুভাই?"

"তুমি জানো দাদু। নীলকর জেরাল্ডসাহেবের পুরো নাম কী ছিল?"

দাদু একটুক্ষণ চাইলেন ওর দিকে। তারপর বললেন, "টমি লি জেরাল্ড! টাকার নেশা ছাড়াও ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসতেন। আর্টিস্ট হওয়ার শখ ছিল। আঁকতেনও নাকি ভালো। বাড়ির চাপে নীলের ব্যবসায় নামেন। মাথাটা তখনই বিগড়ে ছিল বোধহয়।—কিন্তু তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন দাদুভাই? আগে তো করনি কখনও। শুনলাম শ্মশানখালির জঙ্গলে রাস্তা হারিয়েছিলে। ভয়টয় পাওনি তো? তবে দাদুভাই বলে রাখি, ওসব ভয় করলেই ভয়। নয়তো সব ফক্কা।"

"জানি আমি" হেসে বলল ও। বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল বটে, তবে সেটা কিছু নয়।

ডবল রোল

উল্লাস মল্লিক

নাড়ু ওঝার সময়টা এখন বেশ যাচ্ছে। মানে, পসার একেবারে জমজমাট। রুগীর ঠেলায় নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। হারু ওঝা মরে গিয়ে তর্ক এই চলছে। ক'দিন আগেও একরত্তি কদর ছিল না তার। যা কিছু নামডাক তখন ওই হারু ওঝার। ভূতে ধরা কেস মানেই হারু ওঝা। এমনও না কি হয়েছে, কল পেয়ে গিয়ে হারু দেখে রুগী ফিট। মানে, হারুকে কল দেওয়া হয়েছে শুনেই ভূত পগার পার। ভূতের ভয় পেলে লোকে তখন 'রাম-রাম' না বলে 'হারু-হারু' বলত। তাতে কাজও হত বেশি।

এই যখন অবস্থা, লোকে আসবে কেন নাড়ুর কাছে। আসতও না বড় একটা। শুধু যে কেসগুলো হারু রেফার করত, সেগুলো পেত নাড়ু। হারু হয়ত বলল "আজ আর আমি পেরে উঠব না বাপু, দুটো ব্রহ্মদত্তি আর মামদোর কেস আছে; তোমরা যা বলছ লক্ষণ শুনে তো মনে হচ্ছে মেছো-পেত্নি ধরেছে—সামান্য ব্যাপার—তোমরা বরং নাড়ুর কাছে যাও, গিয়ে বলো, আমি পাঠিয়েছি, ওই যা করার করে দেবে।"

সে এক দিন গেছে নাড়ুর। না খেতে পেয়ে নিজেই মরে ভূত হবার অবস্থা। মাঝে-মাঝে মনে হত, ওঝাগিরি ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রফেশনে চলে যাবে; দুটো খেয়ে-পরে বাঁচবে যা হোক।

ঠিক তখনই ভাগ্যের চাকাটা তাঁর বাঁই করে ঘুরে গেল হঠাৎ। দেহ রাখলেন হারু ওঝা। মানুষজন বলাকওয়া করল, "এবার ভূতেদের জ্বালায় না দেশান্তরি হতে হয়; বাঁচাবার মতো কেউ তো আর রইল না আমাদের; নাড়ু ওঝার কি আর ক্যালি আছে !"

একদিন হল কী, মিত্তিরদের বড় বউটাকে ধরল ভূতে। মিত্তিররা বড়লোক মানুষ, তারা খরচ-খরচা করে ভিন গা থেকে বাঘা-বাঘা সব ওঝা আনা করাল। কিন্তু হলে কী হবে—সবকটা ফেল। বউটার একেবারে যায় যায় দশা। শেষে কে একজন যুক্তি দিল, নাড়ুকে ডাকা করানো যাক একবার। হাজার হোক, ঘরের লোক; হারুর সঙ্গে একই গাঁয়ে এতদিনের বাস; বলা যায় না, দু'একটা বিদ্যে-শিখেও থাকতে পারে; ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করলে ফেল করা ছেলেরও কিছু উন্নতি হয়।

এখানে আমি বড় অশান্তিতে আছি গো...

ডাক পেলেন নাড়ু ওঝা। গিয়ে লক্ষণ দেখে বুঝলেন, আশ-শ্যাওড়া গাছের পেত্নি ধরেছে। দাওয়াইটা জানা ছিল তাঁর। সরষে আর শুকনো লঙ্কা বেলকাঠে পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলেন খুব কষে; তারপর কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে কিছুটা আওড়াতেই পেত্নি হাওয়া।

ব্যস; তারপর থেকে আর রুগির অভাব হয়নি নাড়ুর। সুনাম সুখ্যাতি একেবারে হইহই করে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছিলেন নাড়ু। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে। শ্যামপুরে একটা কেস ছিল আজ। জটিল কেস। নচ্ছার একটা স্কন্ধকাটা ধরেছিল বাড়ির কর্তাকে। স্কন্ধকাটা ধরলে বেশ চিন্তার ব্যাপার। স্কন্ধকাটা ভূতের মুণ্ডু থাকে না বলে, নাক-কানের বালাই নেই। তাই লঙ্কা পোড়া সর্ষে পোড়ার গন্ধ দিয়ে লাভ হয় না। রামায়ণ পাঠ করেও ফল মেলে না। কানই নেই তো শুনবে কোথা দিয়ে। এখানে চাই বিছুটি দাওয়াই। মড়ার খুলিতে মন্ত্রপূত গঙ্গাজল নিয়ে রামতুলসী গাছের পাতা দিয়ে ছেটাতেই কাজ হল।

দক্ষিণা মিলেছে ভালই। হুঁকো টানতে-টানতে নাড়ু ভাবছিলেন, এবার বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিল তুলতে হবে। চোরের উৎপাত বড় বাড়ছে। নাড়ু ওঝা ভূতের যম হলে কী হবে, চোর জব্দ করার মন্ত্র তাঁর জানা নেই।

হঠাৎ জানলার কাছে একটু খুটখাট শব্দ হল যে। নাড়ু সচকিত হলে। চোর-টোর মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরেই গন্ধটা পেলেন। সেই চেনা গন্ধ। মনে একটু সন্দেহ তাঁর। এখানে তো এ গন্ধ পাবার কথা নয়। ভাল করে আর একবার নাকটা টানলেন তিনি। হ্যাঁ, নির্ঘাত মনে হচ্ছে। তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা ভুল হবার নয়। হাতের হুঁকোটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন নাড়ু। তিনি হলেন গিয়ে ভূতের জল্লাদ, আর তাঁর ঘরেই কি না ভূত! ব্যাটাকে ধরে কষে শিক্ষা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ থেকে করোটি মালাটা বের করতে গেলেন। কিন্তু আগেই অন্ধকার কোণ থেকে খুব মৃদু গলায় কে যেন বলে উঠল, "থাক, থাক, শোনো কথা আছে।"

নাড়ু হুঙ্কার দিলেন, "কে তুই?"

"আরে আমি গো,...।"

"আমিটা কে?"

"আমি যে হারু ওঝা, গন্ধু শুকে তো তোমার বোঝা উচিত ছিল, কিছু মনে কোরো না বাপু, তোমার শিক্ষে দিক্ষের এখনও কিছু খামতি আছে...ভূতের শুধু গন্ধ পেলেই হবে না, কে ভূত তাও ধরে ফেলতে হবে। তুমি বাপু ভূতেশ নন্দীর লেখা 'গুহ্যক শাস্ত্রের' 7ম খণ্ডটা একবার ঝালিয়ে নিও, সব দেওয়া আছে ওখানে।"

মনে মনে একটু লজ্জা পান নাড়ু। বলেন, "আসলে অনেকদিন আগে পড়া তো...সব ঠিকঠাক স্মরণে নেই। তা, আপনি হঠাৎ করে আমার কাছে...?"

"খুব দরকার ছিল বাপু।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।" একটু ব্যস্ত গলায় নাড়ু বলে ওঠেন, "কী করতে হবে আপনার জন্যে?"

"এখানে আমি বড় অশান্তিতে আছি গো।"

"কেন কেন; অশান্তি কেন!"

"মনুষ্য জন্মের কর্মফল।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারু বলে, "তুমি তো ভালই জানো, মানুষ থাকতে বিস্তর ভূতকে জব্দ করেছি আমি, এই গোটা তল্লাটে একেবারে ভূতের মহামারি লাগিয়ে দিয়েছিলুম, এখন সেই রাগে সব ব্যাটা আমার ওপর শোধ তুলছে, একেবারে তিষ্ঠোতে দিচ্ছেনা আমায়...।"

খুব অবাক হয়ে নাড়ু বলেন, "সে আবার কেমন কথা।"

"তবে আর বলছি কী।" হারু বলে, "ঘুরতে ফিরতে অত্যেচার। কেউ হয়তো খুলিতে খটাং করে একটা গাট্টা মেরে গেল, কেউ হয়তো হাঁটু থেকে একটা ঠ্যাঙ খুলে নিয়ে দিল ছুট, এই তো দ্যাখো না, আজ সন্ধেবেলা, তালগাছে বসে একা-একা হাওয়া খাচ্ছিলুম, অমনি একদল চ্যাঙড়া ভূত পেছন থেকে আমার মুণ্ডুটা হ্যাঁচকা টানে খুলে নিয়ে ফুটবল খেলতে লাগল। দ্যাখো, খুলিতে ক'জায়গায় চিড় খেয়ে গেছে...দ্যাখো, দ্যাখো, হাত বুলিয়ে দ্যাখো...।"

নাড়ু বলেন, "থাক, থাক, বুঝতে পেরেছি।"

"ছোকরা গুলোর বাপ-মা'র কাছে নালিশ করলুম, কোনও লাভ হল না; বরং হিহি করে হাসতে লাগল; বুঝলুম তাদের আস্কারাতেই করছে এসব...। এখন তুমি বাপু আমাকে একটু আশ্রয় দাও...।"

"আমি!" খুব অবাক গলায় বলেন নাড়ু।

"হ্যাঁ; তোমার এখন বেশ নামডাক; তোমার নামে আমাদের ওখানে বেশ ভয়ও পায় সবাই; তোমার কাছে থাকলে কেউ আর জ্বালাতনের সাহস পাবে না। এই দ্যাখো না, আসছি যখন, একদল ফেউয়ের মতো

পেছনে লেগেছিল; কিন্তু যেই তোমার বাড়ির দিকে এলুম, অমনি সবার সে কী দৌড়...। আমি বাপু তোমার এখানেই থাকব, তুমি না কোরো না, তোমার কাজ কম্মও করে দেব'খন।''

নাড়ু বলেন, ''কাজ কম্মটা কথা নয়; আপনি হলেন গিয়ে গুরুদেব মানুষ, মানে, ইয়ে আর কী গুরুদেব ভূত আপনি থাকবেন—এ তো ভাগ্যের কথা; থাকুন যতদিন খুশি।''

হারু বলে, ''আশীর্বাদ করি বাবা, অনেক বড় হও, আমাকেও ছাপিয়ে যাও; তোমার নামে আমার জাতভাইদের যেন দাঁতকপাটি যায়।''

অভাবের দরুণ বয়েস কালে সংসার-ধর্ম করা হয়নি নাড়ুর। যখন সুদিন ফিরেছে তখন বয়েস গড়িয়ে গেছে অনেকটা। তাই বিয়ে-শাদির চিন্তা আর মাথায় আনেননি। একাই থাকেন। তা একা একলা মানুষের সংসার যেমন হয়, তাঁরটাও তেমন। একটু ছিরি-ছাঁদের অভাব। বাড়ির চারপাশে আগাছার জঙ্গল, ঘরের মেঝেতে একপুরু ধুলো, বিছানা লণ্ডভণ্ড, মশারি হয়ত টাঙানোই আছে সারাদিন। কয়েকদিন পর দেখা গেল, বাড়ির শ্রী ফিরেছে যেন। আগাছা সাফ, টানটান বিছানা, তকতক করছে ঘরের মেঝে, সিলিং-এ এতটুকু ঝুলময়লা নেই।

কী করে এলেন ওঝা মশাই; আমরা তো আপনার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলুম...

আরও অবাক-অবাক কাণ্ড ঘটলে তারপর। নাড়ু জাবদাপোতায় দত্তদের বাড়ি গেছেন কলে। গিয়ে দেখেন, ব্যাগটাই আনা হয়নি। অথচ ব্যাগেই আছে ভূত তাড়ানোর সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, জড়িবুটি। কী হবে এখন? আবার তাহলে বাড়ি যেতে হয় নাড়ুকে। সে তো অনেকটা পথ। এদিকে দত্তদের ছোটো মেয়ে, যাকে ভূতে ধরেছে, তার খুব করুণ দশা। কী যেন একটু চিন্তা করলেন নাড়ু। তারপর একা একা দত্তবাড়ির ছাদে উঠে গেলেন। নেমে এলেন একটু পরেই; হাতে সেই ব্যাগ।

আর একদিন টগরপুরে চাটুজ্জেবাড়ি যাচ্ছেন কলে। পথে মস্ত কালা-নদী। বর্ষার দিন, টইটুম্বুর জল। একমাত্র বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে আগের দিন রাতে। হঠাৎ দেখা গেল, নাড়ু হাজির। জামাকাপড় একেবারে খটখটে শুকনো। সবার প্রশ্ন, "কী করে এলেন ওঝা মশাই; আমরা তো আপনার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলুম...।"

কিছু বললেন না...নাড়ু। মুচকি হাসলেন শুধু।

এসব কাহিনি যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তত নাম যশ বাড়লে নাড়ু ওঝার। কিন্তু দিনে দিনে তাঁরও বয়েস হল। এখন কলে যাবার মতো শরীরে তাগত নেই। রুগি এলে মাফ চেয়ে ফিরিয়ে দেন।

একদিন হঠাৎ হারু ওঝার ভূত বলল, "এটা কি ঠিক কাজ হচ্ছে?"

নাড়ু অবাক হয়ে বললেন, "কীসের কী কাজ?"

"এই যে, লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিচ্ছ; ভূতে ধরা মানুষ হল গিয়ে তোমার লক্ষ্মী।"

নাড়ু বলেন, "তা শরীরে আর না কুলোলে কী করি বলুন...?"

"যদি কিছু মনে না করো, তো একটা কথা বলি।"

"বলুন, বলুন, কী কথা!"

"বলি কী, ভূত তাড়ানোর প্যাঁচ-পয়জার সবই তো আমার জানা; মন্ত্রটন্ত্রও দিব্যি স্মরণে আছে এখনও; তাই বলি কী, তোমার চেহারা ধারণ করে কাজটা তো আমিই করে দিতে পারি। তোমার দুটো পয়সা হয়, আর পাঁচটা লোকের উপকারও হয়।"

একটু ভেবে নাড়ু বলেন, "তা বলছেন যখন, আর আপত্তি করি কেন!"

তারপর থেকে দেখা গেল, নাড়ু ওঝা আর কাউকে ফেরাচ্ছেন না। ডাক দিলেই হাজির কিছুক্ষণের মধ্যে। আর বুড়ো বয়েসে কাজকম্মের ওস্তাদি যেন আরও বেড়েছে। মানুষটা ঝড়ের গতিতে হাজির হয়, চোখের পলকে কাজ সাঙ্গ করে ফেলে। কেমন যেন পলকা-পলকা ছায়া-ছায়া ভাব শরীরে।

লোকে বলাবলি করে, "ভূত ঘেঁটে-ঘেঁটে মানুষটাও যেন ভূত হয়ে গেছে।" বলে, আর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ঠুকে নেয় একটা।

অঘোরবাবুর ট্যাঁকঘড়ি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওয়ান, টোয়েন্টি থাউজেন্ড টু... টোয়েন্টি থাউজেন্ড থ্রি...—'ফর্টি থাউজেন্ড!' কিছুটা জেদের বসেই এবার দ্বিগুণ দর হেঁকে বসলেন অঘোর সান্যাল। তাঁর দর হাঁকা শুনে এবার একেবারে হাঁ হয়ে গেল উলটো দিকে যে দর দিচ্ছিল সেই যুবক। অঘোরবাবু লক্ষ করলেন বিস্ময়ে ছেলেটার চোয়াল ঝুলে পড়েছে!

নিলামঅলা তার হাতুড়ি ঠুকে আবার দর হাঁকতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ছেলেটা হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে আর ডাক দেবে না। নিলাম শেষ হয়ে গেল। ছেলেটা অঘোরবাবুর পরিচিত। নাম, অর্জুন লাখোটিয়া। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। ওর বাবা গণেশ লাখোটিয়াও অঘোর সান্যালের বিশেষ পরিচিত। অঘোরবাবুর মতো গণেশ লাখোটিয়ারও ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে।

নিলাম শেষ হবার পর আশেপাশের ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু বিস্মিত অর্জুন তখনও তাকিয়ে আছে অঘোরবাবুর দিকে। সে যে প্রচণ্ড আশাহত তা বুঝতে অসুবিধা হল না অঘোরবাবুর। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'ডোন্ট আপসেট মাই বয়। নিলামের নিয়মই হল, কেউ জেতে কেউ হারে। এই যেমন গত মাসে তুমি আমাকে নিলামে হারিয়ে মিং আমলের ফ্লাওয়ার ভাসটা জিতে নিলে। ও রকম একটা ফুলদানির শখ আমার বহুদিনের ছিল। কী আর করা যাবে? নেক্সট টাইম হয়তো আবার তুমি জিতবে।''

ছেলেটা অঘোরবাবুর কথার কোনো জবাব দিল না। নিলামঅলার টেবিলে রাখা যে জিনিসটার নিলাম হচ্ছিল সেটার দিকে একবার তাকিয়ে কাঁধ থেকে অঘোরবাবুর হাতটা সরিয়ে ধীর পায়ে নিলামঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যাবার পর পরিচিত বৃদ্ধ নিলামদার মন্তব্য করলেন, 'অল্পবয়সি ছেলেতো। ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারল না।' তার কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে অঘোরবাবু এবার তাকালেন টেবিলে রাখা তার জিতে নেওয়া জিনিসটার দিকে। সেটা একটা চেনঅলা সোনার পকেট ওয়াচ। আগেকার দিনে যাকে লোকে বলত 'ট্যাঁকঘড়ি'। খুব সুন্দর দেখতে খাঁটি বিলেতি জিনিস। নকশাতোলা বেশ বড়ো একটা চেরিকাঠের বাক্সর ভিতরে নীল মখমলের মধ্যে রাখা। ঘড়িটা আপাতত বন্ধ থাকলেও এখনও চলে। নিলামঅলার বক্তব্য অনুযায়ী ঘড়িটার বয়স নাকি প্রায় দুশো বছর। আর বাক্সটারও তাই।

পকেট থেকে চেক বই বের করে চেক লিখতে শুরু করলেন আঘোরবাবু। নিলামঅলা বাক্সটা বন্ধ করে দিয়ে সেটা ব্রাউন পেপারে মোড়াতে মোড়াতে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে ঘড়িটা চালু করে নেবেন। একবার দম দিলে ঘড়িটা আটচল্লিশ ঘন্টা চলে। একদম খাঁটি বিলেতি ঘড়ি। এক বুড়ো 'অ্যাংলো' পয়সার অভাবে বেচে দিয়ে গেল। ঘড়িটা নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুদিন আগেই লন্ডন থেকে ওর হাতে এসেছে।'

চেক কেটে সেটা নিলামদারের হাতে ধরিয়ে বাক্সটা নিয়ে নিলেন অঘোরবাবু। তারপর তিনি যখন দোকানের বাইরে এগোতে যাচ্ছেন তখন জিনিসপত্রে ঠাসা আধো অন্ধকার নিলামঘরের মধ্যে কিছু দূরে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলেন তিনি। একটা পুরোনো পিতলের মূর্তির পায়ের কাছে শুয়ে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিরাট বড়ো একটা কালোরঙের অ্যালসেসিয়ান কুকুর! মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন অঘোরবাবু। তবে তা ভয়ে নয়। এ জাতীয় একটা কুকুর তার নিজের বাড়িতেও আছে। তিনি ভাবলেন নিলামদারকে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, 'কার কুকুর ওটা?' এর পরক্ষণেই তার মনে হল,

ওটা হয়তো নিলামদারের কোনো খদ্দেরের হবে। তিনি নিজেও তো বেশ কয়েকবার তাঁর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে এই নিলামঘরে এসেছেন। তেমনই হবে হয়তো। এ কথা চিন্তা করে কাজেই আর নিলামদারকে কিছু না-বলে সামনে এগিয়ে কাচের দরজার পাল্লা ঠেলে পার্ক স্ট্রিটের ব্যস্ত রাস্তায় নেমে পড়লেন অঘোরবাবু। কিছু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ছিল তার ফিয়েট গাড়িটা। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসলেন তিনি। তাঁর রিস্টওয়াচে বেলা একটা বাজে। ক্যামাক স্ট্রিটে একটা কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে তিনি যখন তার বাড়ির সামনে এসে ফটক খোলার জন্য হর্ন দিলেন তখন বেলা দুটো বেজে গেছে।

শহরের বাইরে বরানগরে গঙ্গারধারে প্রাচীর ঘেরা সাবেক আমলের দোতলা পৈত্রিক বাড়িতে পুরোনো কাজের লোক শিউসরণকে আর তার অ্যালসেসিয়ান টাইগারকে নিয়ে থাকেন ষাটোর্ধ্ব অঘোরবাবু। তিনি বিয়ে-থা করেননি।

হর্ন শুনে শিউসরণ দরজা খুলে দিল। গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে পোর্টিকোতে ঘড়ির বাক্সটা হাতে নিয়ে নামতেই তাকে দেখে অন্য দিনের মতোই টাইগার ছুটে এল। অঘোরবাবুর একটু তফাতে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরটা। সন্দিগ্ধভাবে সে একবার তাকাল অঘোরবাবু হাতে ধরা বাক্সটার দিকে, তারপর গজরাতে শুরু করল। অঘোরবাবু তাকে ডাকলেন, কিন্তু সে কাছে এল না। তাই দেখে তিনি শিউসরণকে বললেন, 'টাইগারের মেজাজটা আজ খারাপ বলে মনে হচ্ছে?' শিউসরন জবাব দিল, 'এতক্ষণতো ও ঠিকই ছিল। ওর মেজাজ কখন যে কী হয় বোঝা মুশকিল!'

অঘোরবাবু আর কথা বাড়ালেন না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার শোবার ঘরে উঠে পোশাক পালটাতে শুরু করলেন। শিউসরণ খাবার দিয়ে গেল। দুপুরের খাওয়া সেরে ঘড়ির বাক্সটা বিছানায় রেখে শুয়ে পড়লেন অঘোরবাবু।

অঘোরবাবুর যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সাতটা বাজে। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। বিছানাতে উঠে বসে বেড সুইচ জ্বালাতেই তাঁর চোখে পড়ল ঘড়ির বাক্সটার ওপর। কাগজের মোড়কটা খুলে বাক্স থেকে ঘড়িটা বার করে খুঁটিয়ে খুটিয়ে ঘড়িটা দেখতে লাগলেন তিনি। জিনিসটা যে অনেক পুরোনো তাতে সন্দেহ নেই। সোনার ডায়াল আর কাঁটাগুলো বাতির আলোতে ঝলমল করছে। ভালোভাবে নজর করতে ডায়ালের ঠিক মাঝখানে আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল তাঁর। খুব সূক্ষ্মভাবে তিনটে জিনিসের ছবি খোদাই করা আছে সেখানে। একটা টুপি, একটা ছড়ি, আর একটা কুকুরের ছবি। ভালো করে খেয়াল না-করলে ঠিক ছবিগুলো বোঝা যায় না। নিলামদার বলেছিল ঘড়িটাতে একবার দম দিলে আটচল্লিশ ঘন্টা চলে। ঘড়িটা ভালো করে দেখে কাঁটা মিলিয়ে দম দেবার পর সুন্দর মৃদু টিকটিক ছন্দে ঘড়িটা যখন চলতে শুরু করল তখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটা বাজে। ঠিক সেই সময় অঘোরবাবুর মনে পড়ল, আজ রাত আটটাতে পার্ক স্ট্রিটের একটা বড়ো হোটেলে একটা পার্টি আছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এ ধরনের পার্টিতে তাঁকে মাঝেমাঝে যেতে হয়। ব্যবসায়ীরা আসে সেখানে। ব্যবসা সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা হয়। কাজেই আর সময় নষ্ট না-করে সেখানে যাবার জন্য তৈরি হতে উঠে পড়লেন তিনি। পোশাক পরার পর হঠাৎ তার মনে হল, 'পকেট ঘড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই!' এই ভেবে তিনি ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে তার জহরকোটের নীচে পাঞ্জাবির বুকে পকেটে ভরে নিলেন সেটা।

অঘোরবাবু যখন পার্ক স্ট্রিটের সেই হোটেলে পৌঁছোলেন তখন একে একে অন্য অতিথিরাও সেখানে আসতে শুরু করেছেন। মিত্তির, চ্যাটার্জি, ঝুনঝুনঅলা, লাখোটিয়া, সিংঘানিয়া আরও অনেকে। এঁরা সবাই কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বিরাট ঝাড়বাতি লাগানো আলোকোজ্জ্বল হোটেলের বলরুম ক্রমশ লোকজনের কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় মুখরিত হয়ে উঠল। চ্যাটার্জির সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাজের কথা সারার পর হঠাৎ গণেশ লাখোটিয়ার মুখোমুখি হয়ে গেলেন অঘোরবাবু। তাকে দেখেই লাখোটিয়া বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা পার্সোনাল কথা আছে মিস্টার সান্যাল।'

অঘোরবাবু বললেন, 'বলুন?'

...গাড়িতে উঠলেন ছড়ি হাতে কালো পোশাক আর টুপি পরা একটা লোক...

লাখোটিয়া একটু চাপাস্বরে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আজকে পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘরে বিডিং-এর ব্যাপারটা আমি শুনেছি। ঘড়িটা না-পেয়ে অর্জুন খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। ও আমার একমাত্র ছেলে। কোনো কিছু চেয়ে তা পায়নি এমন হয়নি। আমি আপনাকে ওই ঘড়ির দামের ওপর বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। ও ঘড়িটা আমার চাই।'

লাখোটিয়া তার শেষের কথাটা এমন ঢঙে বললেন তা ঠিক পছন্দ হল না অঘোরবাবুর। তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে আমি ভাবব আপনার কথা।' লাখোটিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, ভাবুন।'

লাখোটিয়াকে পাশ কাটাবার জন্য এরপর তার থেকে বিদায় নিয়ে তিনি এগোলেন সামনের দিকে। অঘোরবাবু বলরুমের ঠিক মাঝখানে বড়ো ঝাড়বাতিটার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই তাকে দেখে এগিয়ে এসে

মিত্তির বললেন, 'কী মশাই, ভরদুপুরে আজ কুকুর নিয়ে কোথায় বেরিয়েছিলেন? আর সঙ্গের লোকটা কে ছিল?'

তার কথা শুনে অঘোরবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, 'দুপুরে আমি বাড়ির বাইরে কিছুটা সময় ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে তো কেউ ছিল না।'

মিত্তির বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'সে কী মশাই! আজ দুপুরবেলায় হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে আপনি আপনার গাড়িতে উঠলেন। আর আপনার গাড়ির পিছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলেন ছড়ি হাতে কালো পোশাক আর টুপি পরা একটা লোক। সঙ্গে অ্যালসেসিয়ানটা। কয়েক হাত দূর থেকে আমি তো স্পষ্ট দেখলাম! আপনাকে ডাকার আগেই আপনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।' মিত্তিরের কথায় 'কিন্তু, কিন্তু', বলে অঘোরবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর যেন মনে হল, তার বুক পকেটে রাখা ঘড়িটা যেন খুব জোরে টিকটিক শব্দে বাজতে শুরু করেছে। আর তারপরই কীসের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় মিত্তিরকে নিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লেন অঘোরবাবু। সঙ্গে সঙ্গে একটা কানফাটানো আওয়াজ আর ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল ঘর! চিৎকার চেঁচামেচিতে ভরে উঠল বলরুম।

কয়েক মুহূর্তে পর লোকজন যখন অঘোরবাবুকে টেনে তুলল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন আসল ব্যাপারটা। চারপাশে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ভাঙা কাচের ঠুকরো! অঘোরবাবুর মাথার ওপরের বিশাল ঝাড়বাতিটা ভেঙে পড়েছে! ভাগ্য ভালো একজন ওয়েটার ব্যাপারটা শেষমুহূর্তে দেখতে পেয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় অঘোরবাবুকে। নইলে অতবড়ো ঝাড়বাতি মাথায় পড়লে আর দেখতে হত না। চোট অবশ্য তাঁর খুব একটা লাগেনি। সামান্য একটু হাতে লেগেছে। সবাই তাকে বলল, 'খুব বেঁচে গেছেন মশাই!'

এরপর মিত্তিরের সাথে আর কোনো কথা হল না অঘোরবাবুর। দুর্ঘটনার কারণে পার্টিটাও তেমন জমল না। রাত দশটার আগেই সে-দিন বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি।

পরদিন বেশ ভোরেই ঘুম ভাঙল অঘোরবাবুর। রাতে ঘুমটা যেন কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া হয়েছে তাঁর। সারারাত ঘুমের মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত একটা টিকটিক শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুমের ঘোরে বার দু-এক বিছানাতে উঠেও বসেছিলেন তিনি। অঘোরবাবু ঘুম থেকে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যে শিউসরণ চা নিয়ে এল। অন্যদিন এ সময় তার পিছন পিছন টাইগারও ওপরে উঠে আসে। বাঁধা নিয়ম। অঘোরবাবুর হাত থেকে দুটো বিস্কিট রোজ তার প্রাপ্য। আজ শিউসরণের সাথে টাইগার নেই। তাকে না-দেখে অঘোরবাবু বললেন, 'কীরে টাইগার এল না?'

শিউসরণ জবাব দিল, 'ওর মনে হয় শরীরটা খারাপ। কাল দুপরে আপনি বাড়িতে ফেরার পর সেই যে ও নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, তারপর আর বাইরে আসেনি। রাতের খাবারও পড়ে আছে দেখলাম। সারারাত কুকুরটা গরগর করেছে।'

অঘোরবাবু শুনে বললেন, 'দেখ, আজ ও ভালো হয় কিনা? নইলে কাল ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাস।'

আর এর পরমুহূর্তেই তিনি দেখলেন অর্জুন তার পকেট থেকে বার করল একটা রিভলবার...

চা পান শেষ হবার পর স্নানে গেলেন অঘোরবাবু। তারপর টিফিন সেরে পোশাক পরে নিলেন। পাঞ্জাবিটা গায়ে গলাবার সময় তিনি অনুভব করলেন ঘড়ির অস্তিত্বটা। একবার ঘড়িটা বার করে দেখলেন তিনি। খোলা জানলা দিয়ে আসা দিনের আলোতে ঝলমল করে উঠল ঘড়িটা। একদম নির্ভুল সময় দিচ্ছে সেটা। ঘড়িটা পকেটে নিয়েই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সারাদিন ব্যবসা সংক্রান্ত নানা কাজের চাপ ছিল। কাজের চাপে বুক পকেটে রাখা ঘড়িটার অস্তিত্ব ভুলেই গেলেন তিনি। দুপুরে বাড়ি ফেরা হল না তার। সন্ধ্যায় ব্যবসা সংক্রান্ত একটা বৈঠক ছিল। সেটা সেরে অঘোরবাবু ক্লান্ত শরীরে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন রাত ন-টা বাজে। ওপরে শোবার ঘরে উঠে তিনি যখন পোশাক খুলতে যাচ্ছেন ঠিক তখন শিউসরণ এসে বলল, 'বাবু, আপনার সাথে একজন অল্পবয়সি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।' এত রাতে আবার কে এল?' আর নীচে নামতে ইচ্ছা করল না অঘোরবাবুর। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, লোকটাকে ওপরে পাঠিয়ে দে।' মিনিট দু-একের মধ্যেই সিঁড়িতে

পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর তার পরই যে ঘরে প্রবেশ করল তাকে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেলেন অঘোরবাবু। অর্জুন লাখোটিয়া! তার পরনে লাল গেঞ্জি আর চোঙা প্যান্ট। চোখেমুখে প্রচণ্ড উত্তেজনার ভাব। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে কয়েক পা ভিতরে আসা অর্জুনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এত রাতে?' অর্জুন জবাব দিল, 'আঙ্কল, আমি ওই ঘড়িটা নিতে এসেছি। কাল সন্ধ্যায় বাবার সাথে আপনার তো কথা হয়েছে। টাকাটা নিয়ে এসেছি আমি।' এই বলে সে পকেটে হাত দিল সম্ভবত টাকা বার করার জন্য।

তার কথা শুনে অঘোর সান্যাল মৃদু অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, 'তোমার বাবা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু আমি বলেছি, ভেবে দেখব। দেবতো বলিনি! এ ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। তেমন হলে জানাব।'

অর্জুন লাখোটিয়া বলল, 'কিন্তু ঘড়িটা আমি নিয়ে যেতে চাই।'

অঘোরবাবু বললেন, 'আমি তো তোমাকে বললাম, তেমন হলে তোমাকে জানাব।'

'ঘড়িটা আমার আজই চাই এবং এখনই চাই। ওটা আমাকে দিন। আমি চেয়ে পাইনি, এমন কখনও হয়নি।'—এবার বেশ উদ্ধত রুক্ষ স্বরে কথাগুলো বলল অর্জুন।

তার কথা বলার ঢং দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল অঘোরবাবুর। তিনিও একটু রুক্ষ ভাবে বললেন, 'তোমাকে যা বলবার তো বললাম। এখন তুমি যাও। অনেক রাত হয়েছে।'

অর্জুন গলার স্বর চড়িয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ঘড়িটা এখনই দেবেন। নইলে....'

'নইলে কী?' অঘোরবাবুও চিৎকার করে বলে উঠলেন। আর এর পরমুহূর্তেই তিনি দেখলেন অর্জুন তার পকেট থেকে বার করল একটা রিভলবার! তার নল সোজা তাক করা তাঁর দিকে।

হতভম্ব হয়ে গেলেন অঘোরবাবু। আর তার পরমুহূর্তেই অঘোরবাবুর যেন মনে হল তার বুক পকেটে রাখা ঘড়িটা বেশ জোরে টিকটিক শব্দে বাজতে শুরু করেছে! ঘাবড়ে গেলেও অঘোরবাবু মনে শক্তি সঞ্চয় করে বললেন, 'তুমি কী আমায় ভয় দেখাচ্ছ? চালাও গুলি। ও ঘড়ি তোমাকে আমি দেব না।'

অঘোরবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মুখটা যেন কেমন পালটে গেল। কাঁপতে লাগল তার হাত। আর কাঁপাকাঁপা হাতেই পরমুহূর্তে সে চালিয়ে দিল গুলি! অঘোরবাবু অনুভব করলেন একটা গরম হলকা তার কান ঘেসে বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালে বিদ্ধ হল। প্রচণ্ড শব্দ আর বারুদের কটু গন্ধে ভরে গেল ঘর। অর্জুন কিন্তু আর দাঁড়াল না। গুলিটা চালিয়েই আতঙ্কিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালাতে শুরু করল।

গুলির শব্দ শুনে শিউসরণ ওপরে উঠে এল তখনও টেবিলের কাছে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন অঘোরবাবু। শিউসরণই তাকে বিছানাতে এনে বসাল। ঘড়ির শব্দটা তখন আর কানে আসছে না অঘোরবাবুর। জলটল খেয়ে ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। এমন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ধারণাই ছিল না অঘোরবাবুর। এখন কী করা উচিত তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। তিনি কি পুলিশে খবর দেবেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

ভাবছিলেন অঘোরবাবু। ভাবতে ভাবতেই মিনিট কুড়ির মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে অঘোরবাবু 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল আতঙ্কিত গণেশ লাখোটিয়ার গলা, 'মিস্টার সান্যাল, আপনি অর্জুনকে ক্ষমা করে দিন। ও মা-মরা ছেলে। আমি ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকি বলে ও অসৎ সঙ্গে বিগড়ে গেছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ও একাজ করবে না। ও যে আপনার কাছে গেছিল তা আমি জানতামই না। প্লিজ আপনি পুলিশে খবর দেবেন না। তাহলে আমার আর মানসম্মান থাকবে না। প্লিজ মিস্টার সান্যাল...।'

অঘোরবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ও কী করেছে আপনি জানেন? ও গুলি করেছিল আমাকে! অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। একদম কান ঘেসে গেছে গুলিটা! ও আমাকে একটা ঘড়ির জন্য খুন

করতে যাচ্ছিল!' গণেশ লাখোটিয়া বললেন, 'ঘড়িটার জন্য ও আপনাকে রিভলবার দেখিয়ে থ্রেট করে চরম অন্যায় করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন মানুষ খুন করার মতো সাহস ওর নেই। আসলে আপনাদের কথাবার্তা চলার সময় আপনার কুকুরটা আপনার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কুকুরে ওর দারুণ ভয়। আপনাকে নয়, কুকুরটা দেখেই ভয় পেয়ে ও গুলিটা চালিয়েছিল। তারপর পালিয়ে আসে।' অঘোরবাবু বললেন, 'কুকুর? কিন্তু...'

লাখোটিয়া বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন। প্লিজ আপনি পুলিশে খবর দেবেন না। অর্জুন আপনার কাছে মাফ চেয়ে আসবে। প্রয়োজনে আমি একলাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেব। সেই ফ্লাওয়ারভাসটাও গিফট করব। নিকেলসন কোম্পানির যে অর্ডারটার জন্য আপনি অনেক দিন চেষ্টা করছেন সেটাও পাইয়ে দেব। শুধু আপনি থানা-পুলিশ করবেন না...। এর পরই সম্ভবত যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফোনটা কেটে গেল। চেষ্টা করেও লাখোটিয়াকে আর ধরা গেল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অঘোরবাবু শিউসরণকে বললেন, 'হাঁরে ওই ছেলেটা যখন ওপরে উঠেছিল তখন টাইগার কি ওপরে উঠেছিল?'

সে জবাব দিল, 'না তো বাবু, সে তো ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। যখন ওপরে শব্দ হল, তখন আমি তার ঘরে খাবার দিতে ঢুকে ছিলাম।' জবাব শুনে নিজের মনে অঘোরবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! ছেলের অপরাধ ঢাকতে কি মিথ্যা বললেন গণেশ লাখোটিয়া?'

তিনি যা করবেন তা পরের দিন করবেন,—এই ভেবে শিউসরণকে সজাগ থাকতে বলে খাওয়া সেরে আর কিছু সময়ের মধ্যেই অঘোরবাবু বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সেদিনও আগের রাতের মতোই একটা টিকটিক শব্দ ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলেন অঘোরবাবু। এ দিনের শব্দ যেন আগের রাতের থেকে আরও বেশি তীব্র। শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু অন্ধকার ঘরে অঘোরবাবু বুঝতে পারলেন সেই শব্দের অনুরণনটা যেন তখনও তার কানে জেগে আছে! বাকি রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলেন তিনি।

বিকালবেলায় নিজের ঘরে বসে ছিলেন অঘোরবাবু। সারাদিন তিনি বাড়ির বাইরে যাননি। শিউসরণ কুকুরটাকে একটু আগে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। গতকালও সারা রাত কেঁদেছে কুকুরটা। রাতে ভালো ঘুম না-হওয়ায় শরীরটাও একটু খারাপ অঘোরবাবুর। সেদিন ঘড়িটা কিনে আনার পর থেকেই তাঁর স্বাভাবিক জীবনে কোথাও যেন একটা ছন্দপতন ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। পরপর দু-রাত ধরে সেই টিকটিক শব্দটা কি নিছকই তার মনের ভুল, নাকি অন্য কিছু? বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ঘড়িটা আবার ভালো করে দেখার জন্য পাঞ্জাবির পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। সাড়ে পাঁচটা বাজে। তেমন কিছু সন্দেহজনক বিষয় ঘড়িটার মধ্যে তার চোখে পড়ল না। তিনি এরপর ভাবলেন যে ঘড়িটা তার বাক্সে পুরে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখবেন। এত দামি জিনিস বাইরে ফেলে রাখা বা সঙ্গে নিয়ে ঘোরা ঠিক হচ্ছে না। ঘড়ির বাক্সটা টেবিলে রাখা ছিল। সেটা তুলে এনে আবার খাটে বসলেন অঘোরবাবু। খুব সুন্দর বাক্সটা। এটারই দাম অন্তত হাজার দুই টাকা হবে। কাঠের কারুকার্য করা লম্বা ধরনের বাক্সটা অনেকটা গহনার বাক্সর মতো দেখতে। বাক্সটা খুলে অঘোরবাবু ঘড়িটা রাখতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই তার মনে হল, বাক্সর নীল মখমলের চাদরের নীচ থেকে কী যেন একটা উঁকি দিচ্ছে। অঘোরবাবু মখমলের কোণটা সরাতেই তার নীচ থেকে বেরিয়ে এল, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা ভাঁজ করা কাগজ। সাবধানে কাগজের ভাঁজটা খুললেন তিনি। সম্ভবত সেটা ছিল একটা রাইটং প্যাডের পাতা। হলদেটে হয়ে যাওয়া কাগজে খুদে খুদে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ইংরেজি হরফগুলো পাঠ করার চেষ্টা করলেন তিনি। আর তা পাঠোদ্ধার করে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। আসলে সম্ভবত এটা একটা অসম্পূর্ণ চিঠি ছিল। সালটা লেখা আছে 'উনিশশো দশ'। চিঠিটা যার উদ্দেশে লেখা তাঁর নাম জোনাথন হলেও লেখকের কোনো নাম নেই। সম্ভবত লেখক চিঠিটা শেষ করেননি বা করতে পারেননি। চিঠির প্রথম ক-টা লাইন অস্পষ্টতার জন্য পাঠ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তার পর লেখা,—''ঘড়িটা এখন আমার সামনেই রাইটিং ডেস্কের ওপর রাখা।

এক চরম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আমি এখন আছি। তুমি বলেছিলে—ডাকাতরা লন্ডনে এক রাজপথে রাত্রিবেলায় এই ঘড়িটা ছিনতাই করার সময়ই যাদুকর ফিলিপ আর তার কুকুরটাকে হত্যা করে। আর তার পর থেকেই নাকি সেই যাদুকর তাঁর কুকুরটাকে নিয়ে এই ঘড়িটাকে অনুসরণ করে। মৃত্যুর পরও তাঁর প্রিয় ঘড়ির মায়া কাটাতে পারেননি তিনি! এ ঘড়ি যার কাছে যায়, ঘড়িটা চালু করার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তিনবার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তার সামনে। প্রথম দু-বার মৃত্যু তার কাছে এসে সতর্ক করে দিয়ে যায়। সে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে তীব্র টিকটিক শব্দে তার আগমনবার্তা জানান দেয় ঘড়িটা। আর তৃতীয়বার মৃত্যু নির্মম আঘাত হানে। এর আগে যাদের কাছে ঘড়িটা ছিল তারা কেউই আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি ঘড়িটা চালিয়ে রাখতে পারেনি। যাদুকরের আত্মা কাউকে ভোগ করতে দেয় না এ ঘড়ি! জোনাথন, তোমার কথা আমি সেদিন বিশ্বাস করিনি। এখনও যে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি তা নয়। গত পরশু রাত দশটায় এ ঘড়ি চালু করেছি আমি। কাকতালীয় ভাবেই তোমার কথা মিলতে শুরু করেছে। গতকাল দুপুরে আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করল, আর আজ সকালে বাড়ির সামনেই হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ল আমার গা ঘেসে। দু-বারই আমি অল্পের জন্য মৃত্যুর থেকে রক্ষা পেয়েছি। আর কী আশ্চর্য, ঘটনা দুটো ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তেই আমি শুনেছি আমার পকেটে ঘড়ির তীব্র টিকটিক শব্দ! আর আমার সোফার নাকি গতকাল রাতে আমার বাড়ির কম্পাউন্ডে একজন লোক আর তাঁর সাথে একটা কুকুরকে দেখেছে। এখন রাত দশটা বাজতে পাঁচ। অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টা হতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে''...। এখানেই শেষ হয়ে গেছে।

লেখাটা পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন অঘোরবাবু। এতে যা লেখা আছে তা কি সত্যি? সত্যি না-হলে ব্যাপারটা তার সাথেও মিলছে কীভাবে? ঘড়িটা চালু করার পর অঘোরবাবুও তো নিশ্চিত দু-বার মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আর দু-বারই ঘটনা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তে তিনিও শুনতে পেয়েছেন তীব্র টিকটিক শব্দ। এ সবই কী কাকতালীয়? ঘড়িতে এখন ছ-টা বাজতে চলেছে। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে আর এক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু এসে হানা দেবে চূড়ান্ত আঘাত করার জন্য। ব্যাপারটা যেমন ঠিক তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না, তেমন উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সময় যত এগোতে লাগল ভিতরে তত উত্তেজিত হতে লাগলেন তিনি। আরও একটা ছন্দবদ্ধ শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। সেটা তাঁর হৃৎপিণ্ডের শব্দ! হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, 'আরে, ঘড়িটাকে বন্ধ করলেই তো এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচাল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়!' অঘোরবাবু চেষ্টা করলেন ঘড়িটা বন্ধ করার। কিন্তু কিছুতেই ঘড়িটা বন্ধ হল না। এবার বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কী করা যায় ঘড়িটা নিয়ে? ঘড়িটাকে তিন ফেলে দেবেন? এর পরক্ষণেই তার একটা বুদ্ধি এল মাথায়। তিনি টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে ডায়াল করলেন একটা নির্দিষ্ট নম্বরে।

ফোনটা রিসিভ করলেন গণেশ লাখোটিয়াই। অঘোরবাবু তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'শুনুন মশাই, যা হবার তা হয়ে গেছে আমি আপনার ছেলেকে মাফ করে দিয়েছি। আর আমি ঠিক করেছি ঘড়িটা ওকেই দেব। আমি আজই বাইরে চলে যাব। আপনি এখনই, আধ ঘন্টার মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে ঘড়িটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, আধ ঘন্টার মধ্যেই। লাখোটিয়া অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছেন আপনি! আমিতো বিশ্বাসই করতে পারছি না! কাউকে আমি এখনই পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনি সত্যি বলছেন তো? আর টাকাপয়সা কী দিতে হবে যদি দয়া করে বলেন?'

অঘোরবাবু বললেন, 'ওসব কথা পরে হবে। আপনি এখনই কাউকে পাঠান। আমার হাতে সময় একদম নেই।' লাখোটিয়া বললেন, 'ঠিক আছে এখনই কেউ যাচ্ছে আপনার কাছে'।

ফোন রেখে প্রতীক্ষা শুরু করলেন অঘোরবাবু। ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে লাগল উৎকণ্ঠা তত বাড়তে লাগল তার। যেন মনে হতে লাগল এখনই যেন কিছু ঘটে যাবে। ঘড়িতে তখন পৌনে সাতটা বাজে, উৎকণ্ঠা তখন চরমে। ঠিক সেই সময় অঘোরবাবু দেখলেন একটা বাইক নিয়ে অর্জুন এসে দাঁড়াল তার বাড়ির

সামনে। ঘড়িটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নীচে নেমে এলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন মাথা নীচু করে বলল, 'আমাকে আপনি মাফ করে দিন আঙ্কেল।' অর্জুনকে আর কথা বাড়াতে না-দিয়ে অঘোরবাবু ঘড়িটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন 'ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি এটা নিয়ে এখন যাও। পরে একদিন এসো। তখন কথা হবে।' এই বলে ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়ালেন। অর্জুন লাখোটিয়া যখন অঘোরবাবুর বাড়ি থেকে ঘড়িটা পকেটে নিয়ে তার বাইক স্টার্ট করল, তখন ঘড়িতে সাতটা বাজতে পাঁচ। ঠিক তখনই ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল।

অর্জুন লাখোটিয়া ঘড়িটা নিয়ে চলে যাবার পর নিজের ঘরে ফিরে বেশ স্বস্তি বোধ করলেন অঘোরবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই টাইগারকে নিয়ে ফিরে এল শিউসরণ। দু-দিন বাদে টাইগার আবার উঠে এল অঘোরবাবুর ঘরে। বেশ চনমনে দেখাচ্ছে তাকে। সে ল্যাজ নাড়তে লাগল। সারাদিন আজ বাড়িতেই ছিলেন অঘোরবাবু। তিনি টিভি খুলে বসলেন সারাদিনের খবর শোনার জন্য। রাত ন-টা নাগাদ টিভির পর্দাতেই তিনি খবরটা প্রথমে পেলেন—'আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ টালা ব্রিজের কাছে পথ দুর্ঘটনায় অর্জুন লাখোটিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মৃত্যুর আগে দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে সে জানিয়েছে যে দ্রুতগামী বাইকের সামনে হঠাৎই নাকি বিরাটাকার এক কুকুর এসে পড়ায় এই দুর্ঘটনা। নিহত অর্জুন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গণেশ লাখোটিয়ার একমাত্র পুত্র।'

ভূতবাবার মেলায়

জয়দীপ চক্রবর্তী

বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর ডাবল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে বটে, তবু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে-কাজ শেষ হচ্ছে এই পথে যাতায়াতের মেহনতি ও সমস্যার অন্ত নেই। সিঙ্গল লাইন বলে মাঝে মাঝেই ক্রসিং এর জন্যে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায় থাকতে হয় অসহায়ের মতোই। তা ছাড়া কোনো কারণে একটা ট্রেন মিস হয়ে গেলেই বসে থাকো ঝাড়া একটি ঘন্টা।

মাঝখানে আর ট্রেন নেই। এমনকী সড়ক পথেও যে কলকাতার দিকে ফিরে আসবে সে সুযোগও নেই বললেই চলে। আমি অভিজিতকে পই পই করে বলেছিলাম মথুরাপুর স্টেশন থেকে অন্তত ছ-টার ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করতে। তা ছ-টার ট্রেনটা তো ধরা গেলই না, এমনকী সাতটার ট্রেনটাও ছেড়ে গেল একটুর জন্যে। অবশ্য অভিজিতকেই বা দোষ দিই কী করে! দীর্ঘদিন পরে এসেছে দেশের বাড়িতে, নিজের গ্রামে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা সহজে ছাড়বে ক্যানো? অগত্যা উঠছি উঠব করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। তারপর কাশীনগর থেকে মথুরাপুর স্টেশনও কম রাস্তা নয়। অবশেষে মথুরাপুর থেকে যখন শিয়ালদহগামী ট্রেনে চেপে বসলাম তখন হাতঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ। এ সময়ে কলকাতার দিকে যাবার গাড়িতে ভিড়-ভাড়াক্কা থাকে না। যত ভিড় সব ফিরতি ট্রেনে। আমাদের কামরাতেও তাই হাতেগোনা কয়েকজনই মাত্র যাত্রী। জানলা-টানলা দেখে জুত করে বসে অভিজিত বলল, "এমন কিছু রাত্তির হয়নি কী বলিস?" হাতঘড়ির দিতে তাকিয়ে নিয়ে আমি বললাম, "ঠিকই। তবে এসব দিকে ট্রেনের গণ্ডগোল হলে ফেরার বিকল্প পথ নেই বলেই চিন্তা হয়—"

"যাকগে! এই তো ফাঁকা গাড়ি পেয়ে গেলাম। দশটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব সব ঠিকঠাক চললে—"

আমি লম্বা করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম মাথার ওপর দু-হাত তুলে! তারপর আলসে গলায় বললাম, "সব ঠিকঠাক চললে—"

অভিজিত হাসল। বলল, "বাদ দে। বল আমার গ্রামের বাড়ি তোর ক্যামন লাগল?"

"খুব ভালো। ইনফ্যাক্ট যে-কোনো গ্রাম দেখতেই খুব ভালো লাগে আমার। পুকুরঘাট, মাঠ, চাষের জমি, খোড়ো চালের মাটিরবাড়ি—ফ্যানটাসটিক, মনে হয় যেন হাতে আঁকা কোনো ছবি—" আমি বললাম।

"কিন্তু সন্ধেবেলা যখন নিকষ অন্ধকার সব ল্যান্ডস্কেপ ঢেকে দেবে—বিজলি বাতি জ্বলবে না—শেয়াল ডাকবে বাঁশবনের আড়াল থেকে?"

"তখন জোনাক জ্বলবে থোকায় থোকায়। বাঁশবাগানের মাথার ওপর পেতলের থালার মতন মস্ত চাঁদ উঠবে আকাশ আলো করে—" বেশ কাব্য করে বললাম আমি।

"কিন্তু ধর যদি চাঁদটাঁদ না-উঠে বাঁশবাগানের আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করে তেনাদের কেউ কেউ?"

"তেনাদের কেউ কেউ মানে?" অবাক গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

"তেনাদের কথা জানিস না?"

"উঁহু—"

"এই রাতে নাম নেব?" মুচকি হেসে বলল অভিজিত, "আমাদের গ্রামে অন্ধকার নামলে কেউ তাদের নাম করে না। তাও আজকে আবার শনিবার—"

''ভূতের কথা বলছিস—'' হা হা করে হেসে উঠি আমি, ''তুই আবার আজকাল ভূতবিশ্বাসী হয়ে উঠছিস নাকি?''

''আমি বিশ্বাসী না-অবিশ্বাসী সেইটা আজ পর্যন্ত ভালো করে বোঝাই হল না। তবে ছোটোবেলায় ভূতের ভয় পেতাম খুব—''

আলোচনা ক্রমশ জমে উঠল। অভিজিতের গ্রামে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ভূত প্রেতের মুখোমুখি হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে, সেইসব অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উঠে আসতে লাগল এক এক করে। রাতের ট্রেন একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে হুড়মুড় করে। লোকজনের ওঠানামা বড়ো একটা নেই। অতএব গল্পের পরিবেশও জমজমাট। অভিজিত জমিয়েও দিয়েছে খুব। হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাইরে আবছা আলোয় মোড়া একটা নির্জন রেলস্টেশন। জানলা দিয়ে বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিয়ে অভিজিত বলল, ''কৃষ্ণমোহন হল্ট। আর একটা স্টেশনের পরেই বারুইপুর।''

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, ''যাক তাহলে তো এসেই পড়লাম প্রায়। আধঘন্টার মধ্যেই সোনারপুরে নেমে পড়া যাবে।''

অভিজিতও মাথা নাড়ল। আমি ওর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললাম, ''সবই ভালো লাগল তোর দেশের বাড়ি বেড়াতে এসে। শুধু একটাই অপূর্ণতা রয়ে গেল—''

''কী?'' অভিজিত জিজ্ঞেস করল।

গ্রামে-গঞ্জে কাটালাম সারাদিন, একটা ভূতটুত যদি চোখে পড়ত তো ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে যেত। ছোটোবেলা থেকে কত গল্প শুনলাম, অথচ আজ পর্যন্ত তাঁদের একজনের সাথেও দেখা করার সৌভাগ্য হল না। খুব আশা ছিল এবারে তোদের গ্রামে গিয়ে অন্তত—''

''আহা তা থাকলে কতক্ষণ বলো? অন্তত দু-একটা রাত তো কাটাতে হবে—'' আমার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করে উঠে অভিজিত।

আমি হেসে বললাম, ''রাত না-কাটাই দুপুর তো কাটালাম। সেই ছড়াটা মনে নেই, ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা—''

অভিজিত আমার কথার উত্তর দিল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, ''কী ব্যাপার বলত, ট্রেনটা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়ছে না ক্যানো। এখানে এ সময়ে তো সিগন্যালের সমস্যা হওয়ার কথা নয়—''

কথার মধ্যে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ। অভিজিতের কথায় বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ট্রেনটা কৃষ্ণমোহন হল্ট স্টেশনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।

''কী ব্যাপার বলতো, ট্রেনটা ছাড়ছে না ক্যানো?' একরাশ বিরক্তির সঙ্গে বলি আমি।

''ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে—'' অভিজিত নয়, আমাদের উলটোদিকের জানলার পাশে বসা একটা লোক বলে উঠল মিহি গলায়। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে কখন যে লোকটা কামরায় উঠে নিঃশব্দে বসে পড়েছে ওদিকে খেয়ালই করিনি। লোকটা আবার বলল, ''ট্রেন কখন ছাড়বে তার ঠিকঠিকানা নেই আর—''

''ক্যানো বলুন দেখি—'' চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করি আমি।

''কাটা পড়েছে।''

''সে কি—এই ট্রেনে?''

''উহুঁ, আগের ট্রেনে—''

''কোথায়?''

''কৃষ্ণমোহন আর শাসন স্টেশনের মাঝখানে—''

''তারপর?''

''আরপর আর কী— বিস্তির লোক জুটেছে। হইচই চলছে। বডি না-সরলে ট্রেন চলবে না—''

''কী করে কাটা পড়ল?''

লোকটা এ প্রশ্নে জুলজুল করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগল, ''কী করে বলি বলুন! অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, আবার সুইসাইডও হতে পারে! আসলে জায়গাটা তো সরেস। মৃত্যু এখানে মানুষকে আয় আয় করে ডাকে সর্বক্ষণ—''

''মানে?'' চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করে উঠল অভিজিত।

''আশ্চর্য ব্যাপার মশাই,'' লোকটা বলে চলল, খুন-দুর্ঘটনা-আত্মহত্যা মিশিয়ে ফি-বছর দু-তিনটে লোক অন্তত এখানে কাটা পড়বেই।''

''বলেন কী?''

''তা না-হলে আর বলছি কী। জায়গাটা একেবারে বিষিয়ে আছে মশাই— বাতাস ভারি হয়ে আছে সর্বক্ষণ —''

''বুঝলাম না ঠিক—''

''বুঝলেন না?''

''উঁহু।'' দু-দিকে মাথা নাড়লাম আমি।

''অশরীরী আত্মাদের একেবারে আখড়া হয়ে আছে জায়গাটা—''

''বলেন কী?'' অবাক হয়ে গিয়ে বলে অভিজিত।

''এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত। নেহাত ভূতবাবা চোখ রাখছেন সর্বক্ষণ—''

''ভূতবাবাটি আবার কে? কোনো বাবাজি-টাবাজি নাকি?'' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

''আজ্ঞে না'' উনি আসলে শিব। ভূতেদের জয় করেছেন বলে এখানে উনি ভূতনাথ। গ্রামের লোক ভালোবেসে ভূতবাবা বলে ডাকে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই তো ওনার মন্দির—''

''আপনি এতসব জানলেন কী করে?'' জিজ্ঞেস করে অভিজিত।

''আমি তো এখানেই থাকি। অধমের নাম নিবারণ দাস।''

ভূতবাবার ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল আমার। আমি বললাম, ''ভূতবাবার ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন—''

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। বলল, ''কামরার ভেতরটায় ক্যামন বদ্ধ বদ্ধ ভাব একটা। চলুন প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাক—''

অভিজিত কিন্তু কিন্তু করছিল। আমি বললাম, ''নামা যাকই না। সিগন্যাল সবুজ হলে উঠে পড়লেই হল —''

নিবারণ আবারও বলল, ''ট্রেন এখন ছাড়বে না—''

আমরা কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম।

নিবারণ আবার বলতে শুরু করল, এই মন্দির প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। আর বাবাও খুব জাগ্রত। মন্দিরের সামনের মস্ত শ্যাওড়া গাছটায় এখনও দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে ঢিল বেঁধে মানত করে। আর বাবাও তাদের ভূতপ্রেতের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অভিজিত খুব মন দিয়ে শুনছিল সব। নিবারণ থামতেই সে জিজ্ঞেস করল, ''ভূতপ্রেত কী সত্যিই এ অঞ্চলে আছে বলে মনে হয় আপনার?''

''আমার মনে হওয়াটা তো বড়ো কথা নয় বাবু,'' নিবারণ হাসল, এখানকার প্রায় সব মানুষজনই বিশ্বাস করেন যে তেনারা আছেন—''

''মাঝেমধ্যে দেখা যায় তাঁদের?'' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

''তা যায় বই কী বাবু। কতলোকই তো তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ পায়।

তবে ভূতবাবার কৃপায় এঁরা খুবই শান্ত আর নির্বিবাদী। মানুষের ক্ষতি চিন্তা করেন না কখনও—''

''একদিন তাহলে তো দেখতে এলে হয়— আমি হালকাভাবে বললাম।

''আজ যাবেন?'' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

''আজ?'' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলে উঠলাম আমি।

''আজ এখানে ভূতবাবার মেলা বসেছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আবডালে মৃদু আলোর লণ্ঠন জ্বালিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা—'' নিবারণ বলতে শুরু করল।

''এই রাত্তিরবেলা?'' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অভিজিত।

''আজ্ঞে রাতেরই মেলা এটা,'' নিবারণ বলে, ''শুনেছি মানুষের দেহ ধরে তেনারাও নাকি আসেন এ মেলায়। দোকানি সেজে দোকান দেন, কখনও ক্রেতা সাজেন—''

''যাঃ—'' নিবারণের কথার মাঝখানেই অবিশ্বাসীকণ্ঠে বলে উঠি আমি।

''চলুন না, যাবেন? এই কাছেই তো—ওখান থেকে বারুইপুর যাওয়ার ভ্যানট্যানও পেয়ে যেতে পারেন। আপনাদের বাড়ি ফেরার সুবিধা হয়ে যাবে। ট্রেনের ওপর তো আর ভরসা নেই, কখন চলে না-চলে—'' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে বলে। অভিজিতের এ প্রস্তাবে একেবারেই সায় ছিল না। একে রাত বাড়ছে, তা ছাড়া একদম অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এরকম হুট করে—আমার কিন্তু ক্যামন যেন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসল। প্রায় জোরই করে বসলাম অভিজিতের ওপর। ওকে বোঝালাম যে দশ-বিশ মিনিট মেলায় ঘুরে সত্যিই যদি বারুইপুর দিয়ে বাড়ি ফিরি তাহলে অসুবিধা হবার কথা নয়। সময়ও খুব বেশি নষ্ট হবে বলে মনে হয় না। অভিজিত নিমরাজি হয়ে হাঁটতে শুরু করল আমাদের সঙ্গে।

মেলাটা অদ্ভুত। বিজলি বাতি নেই, লোকজনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি নেই। সব ক্যামন যেন নিস্তব্ধ নিঃঝুম। ঝুপসি অন্ধকারে জংলি ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে দু-চারটে দোকান। দোকানের আলো এত কম যে দোকানির মুখ পর্যন্ত দেখা যায় না ভালো করে। দু-চারজন মাত্র খরিদ্দার থমথমে গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দোকান থেকে ও দোকানে। এমন ফিসফিস করে কথা বলছে সবাই যে পাশে দাঁড়িয়েও ভালো করে শোনা যাবে কিনা সন্দেহ।

মেলাটা অদ্ভুত...

একটা অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে আমাদের গায়ে। সেই হাওয়ায় শিরশির করে উঠছে গা। দোকানিরা অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সে তাকানোয় কোনো আহ্বান নেই। ক্যানো কে জানে ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল আমার। বুঝতে পারলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছি আমি। অভিজিতও আমার হাত ধরে আলতো টান দিল। চাপা গলায় বলল, "গতিক ভালো ঠেকছে নারে একটুও। চল পালাই।"

নিবারণ একটু তফাতে ছিল। আমাদের দিকে ফিরল হঠাৎ। হাসল ফিকফিক করে। জিজ্ঞেস করল, "ভয় পেলেন নাকি?"

আমার অস্বস্তি বাড়ল। নিবারণ আমাদের মনের কথা টের পেল কী করে! আমরা কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা বুড়োমতো রোগা লোক এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আমাদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি

বুলিয়ে তাকাল নিবারণের দিকে। দাঁত বের করে হাসল খানিক। তারপর নিবারণের থুতনি ধরে আদর করে বলল, ''আজই আসা হল মনে হচ্ছে?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' ছোট্ট জবাব দিল নিবারণ।

অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু আমার ক্যানো যেন মনে হচ্ছে এখন ঝোপঝাড়ের আশেপাশে বসে থাকা দোকানিরা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাদের চোখ, তাদের চাউনি, তাদের মাথা কিংবা বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে যেন ভয়ানক রকমের একটা অসংগতি। এই অদ্ভুত গা-ছমছমে অন্ধকারে এরা সবাই প্রাণপণে কিছু একটা যেন ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে আমাদের কাছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হল। মুহূর্তে ইঙ্গিত এল মস্তিষ্ক থেকে। অভিজিতের হাত ধরে সোজা দৌড়াতে শুরু করলাম রাস্তার দিকে। নিবারণ ডাক দিলে পিছন থেকে। সে ডাক কানে তুললাম না আমরা। বাতাসের মতো মিহি গলায় কারা যেন কলরব তুলল, ''কিছু কিনে যাও, কিছু কিনে যাও—''

তারপর নিবারণের থুতনি ধরে আদর করে বলল, "আজই আসা হল মনে হচ্ছে?"

পিছন ফিরে সে কলরবের উৎস খোঁজারও সাহস হল না আমাদের। একছুটে বড়োরাস্তায় উঠে ভাগ্যজোরে একটা রিক্সাভ্যান পেয়েছিলাম তাই রক্ষে। ভ্যানচালক মাধব দাস ঝড়ের গতিতে এনে দিল বারুইপুরে। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার গাড়ি পেতে অসুবিধা হয়নি আর।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলাম আটটা মিসডকল হয়েছে অভিজিতের ফোন থেকে। ওকে ফোন করাতে খুব উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কাগজটা দেখেছিস?"

বললাম "ক্যানো?"

ফোনের ওপার থেকে অভিজিত বলল, "দৈনিক বাংলার ছয়ের পাতার বাঁ-দিকে নীচের দিকে একটা ছোট্ট খবর আছে পড়—"

চায়ের টেবিলের ওপর কাগজটা পড়েছিল। তুলে নিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় কৃষ্ণমোহন হল্ট ও শাসন স্টেশনের মাঝে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর খবর। মৃতের নাম নিবারণ চন্দ্র দাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, আড়াই বছর আগে ওখানেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল নিবারণের রিকশাভ্যান চালক দাদা মাধবচন্দ্র দাস।

বিভূতিবাবুর গল্প

বিনোদ ঘোষাল

ভয়ংকর সমস্যায় পড়েছেন বিভূতি গুঁই। কিছুতেই মাথায় আসছে না। কিছুতেই না। এই তিয়াত্তর বছর বয়সে শেষ পর্যন্ত কিনা মাত্র তিনশো চুয়াল্লিশে আটকে যাবেন! ওফ, ভাবলেই টাক বেয়ে টস টস করে ঘাম ঝরছে। সারাদিন কাগজ-কলম নিয়ে চাতক পাখির মতো হাঁ করে টেবিলের সামনে বসে আছেন, কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছে না।

একান্ত নিরুপায় হয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক করলেন কোথাও একটা যেতে হবে। একেবারে জাতভুতুড়ে কোনো জায়গায়। সেখানে গিয়ে যদি...।

আসল ব্যাপারটি হল বিভূতি গুঁই একজন বিখ্যাত ভূতের গল্প লেখক। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে দেশি-বিদেশি ভাষায় আজ পর্যন্ত তার মোট তিনশো চুয়াল্লিশটা গল্প ছাপা হয়েছে। তার লেখা গল্পের বইয়ের সাংঘাতিক কাটতি। প্রকাশকরা তার গল্পের জন্য প্রায় সারাবছর লাইন দিয়ে থাকেন। আর পুজো সংখ্যায় তো কথাই নেই। স্রেফ তার একটা ভূতের গল্প থাকলে অনেক ওঁচা পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাও ভূতের মতোই বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়? ভূত সম্পর্কে বিভূতিবাবুর অগাধ জ্ঞান। শুধু গল্প নয়, ভূত বিষয়ক বহু তত্ত্ব, তথ্য এমনকি দু-একটি তথ্যচিত্রেও তার অবদান রয়েছে। ইচ্ছে ছিল এই বছর শারদীয় সংখ্যাগুলোর জন্য লেখা হয়ে যাবার পর 'মনীষীদের জীবনী'র মতো 'ভূতেদের জীবনী' নাম দিয়ে একটি বই লিখবেন।

এমন লিখবেন যেন প্রথম পাতা থেকে শেষ অবধি পাঠকের গোটা গা সজারু হয়ে থাকবে। কিন্তু ভাগ্য যে এমন পালটি খাবে কে জানত। এত বছর পর আচমকা কোনো ভৌতিক কারণেই কোনো ভূতের গল্প তার মাথায় আসছে না। একটাও নয়। একটুও নয়। অথচ কমপক্ষে পনেরোজন প্রকাশক তাকে রোজ ফোন করছেন গল্পের কদ্দুর এগোল তার খোঁজ নিচ্ছেন। বিভূতিবাবু ঘোষণা করে দিয়েছেন তার শরীর খুবই খারাপ। চাকর শংকরকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন কোনো ফোন এলে যেন ওনাকে না-দেওয়া হয়। বিভূতিবাবু অকৃতদার। নিজের আপনজন বলতে ওই এক শংকর। বহুকাল ধরে সঙ্গে রয়েছে। বাবুকে খুবই ভালোবাসে। বিভূতিবাবুর এমন পাগল পাগল অবস্থা দেখে আর থাকতে না-পেরে একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেলল 'বাবু আপনার কী হয়েছে?'

গোপন কথাটা শংকরকে প্রথম দিকে বলতে না-চাইলেও শেষপর্যন্ত তুমুল কান্নায় ভেঙে পড়ে জানালেন সব কথা। সব শুনেটুনে শংকর পান খাওয়া ছোপ-দাঁত বার করে বাবুকে চমকে দিয়ে খুব হাসল। তারপর নিজের কাঁধে চাপানো সাত রাজ্যের ময়লা মাখা তেলের গন্ধওলা গামছাটা দিয়ে বাবুর চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'এই কথা আগে বলবেন তো। চলে যান সিরসিরে। ক-টা ভূত চাই আপনার?'

বিভূতিবাবু হাঁ করে তাকালেন শংকরের দিকে।

শংকর আবার গোটা মুখে হাসি মাখিয়ে যা জানাল তা মোটামুটি এইরকম : শংকরদের গ্রামের পাশেই বিশাল মাঠ। সেই মাঠ পার হলে সিরসিরে গ্রাম। ওই গ্রামে নাকি সারাদিন চলে অদ্ভুত সব কাণ্ড। সবাই বলে ওই গ্রামে নাকি মানুষের থেকে ভূতের সংখ্যা বেশি। তবে মানুষদের কোনো ক্ষতি করে না তারা। আজ পর্যন্ত ঘাড় মটকানোর কোনো খবর নেই। অবশ্য দু-একটা বিচ্ছু ভূত যে নেই তা নয়, তবে তাদের শায়েস্তা করার জন্য আছে রাবণ ওঝা। তার পিটুনির ভয়ে পাজি ভূতগুলো তেমন কিছু সুবিধে করে উঠতে পারে না।

এমন খবরটি পেয়ে বিভূতিবাবু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে শংকরের গালে সপাটে দুটো চুমু খেয়ে ফেললেন। তারপর নাচতে নাচতে বললেন ব্যাগ গুছোরে কাল ভোরেই দুজনে রওনা দেব।

বর্ধমান স্টেশনে নেমে পশ্চিমে পাকা আড়াই ঘন্টা বাসে। তারপর শংকরের গ্রামে পৌঁছে সেই বিশাল মাঠ পায়ে হেঁটে পার করে বিকেলের দিকে সিরসিরে পৌঁছোলেন বিভূতিবাবু আর শংকর। এতবড়ো মাঠ বিভূতিবাবু জীবনে দেখেননি। শেষই হতে চায় না। যেন সাহারা মরুভূমি। সিরসিরে পৌঁছোতেই ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই তক্ষুনি কিছু একটা ভৌতিক কাণ্ড ঘটবে। কিন্তু কিছুই হল না। দিব্যি সমাজ, পরিবেশ গ্রামটায়। তবে সারাক্ষণ ধরে নানারকমের হাওয়া দেয়। কোনোটা পাতলা হাওয়া, কোনোটা বেশ ভারি। গায়ে ধাক্কা লাগে। কেমন সিরসির করে ওঠে গা। গ্রামের মোড়ল শ্রীভূতনাথ মণ্ডল নেহাতই ভালো মানুষ। শংকরের কাছে বিভূতিবাবুর পরিচয় পেয়ে উনিতো বেজায় খুশি। বললেন, 'ভুতলে লিকবেন তো লিখুন না যতখুশি। ভূতেই তো ভর্তি আমাদের সিরসিরে।'

অনেক লোকজন বউ-বাচ্চা-বুড়ো বিভূতিবাবু আর শংকরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মোড়লমশাই আঙুল তুলে বললেন, 'এই যে লোকগুলোকে দেখতিছেন এদের মধ্যিই কতজনা তেনারা রইচেন কে জানে। মানুষের রূপ ধরি আপনেদের দেখতি এয়েচে হয়ত।'

কথাটা শুনে বিভূতিবাবুর আবার গা সিরসির করে উঠল। বলে কী লোকটা! দিনদুপুরেও ভূত ...যাহ!

গ্রামের ধারে ছোট্ট একটা মাটির বাড়িতে বিভূতিবাবু আর শংকরের থাকার ব্যবস্থা করা হল। বাড়িটার সামনে নিকোনো চকচকে উঠোন। চারদিকে তালপাতার বেড়া দেওয়া। বিভূতিবাবুর খুব পছন্দ হল বাড়িটা। ভূতনাথ বাবু বললেন, 'এই ঘরটা ছিল কালীবুড়ির। খুব ভালো মানুষ ছিল। তো বুড়ি মারা যাবার পরেও ঘরের মায়া ছাড়তি পারেনি। এখনো নিজের ঘরেই থাকে। কিন্তুক গাঁয়ে অতিথি এলি দিব্বি নিজের ঘর ছেড়ি দেই, তালগাছটায় থাকে তখন।'

বিভূতিবাবু বারদুয়েক ঢোক গিলে সামনের তালগাছটার দিকে তাকালেন। হাওয়াতে না-কীসে কে জানে তালগাছের মাথাটা দুলছে।

'তবু কোনো অসুবিধা হলে জানাবেন। রাবণ ওঝাতো আছেই' বলে নমস্কার জানিয়ে ভূতনাথবাবু চলে গেলেন।

বিভূতিবাবুর মাথায় এর মধ্যেই গোটা দু-খানা প্লট খুরপাক খেতে শুরু করেছিল। শংকর ঘরদোর গুছিয়ে বাবুকে ডাকতেই বিভূতিবাবু একলাফে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সাঁইসাঁই লেখার পরেই তাকে কলম থামাতে হল। আশেপাশে কারা যেন গুজগুজ ফুসফুস করছে। চারদিকে তাকালেন। কিছু নেই। অথচ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কারা যেন তার খুব কাছেই ফিসফাস করছে। বিভূতি গুঁই পোড়খাওয়া ভূতের গল্পলেখক। জীবনে বহু গল্পে তিনি এমন সিচুয়েশন লিখেছেন তাই খুব অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা আসলে কী। তেনারা সব এসেছেন। বিভূতিবাবুকে নিয়েই গল্পগাছা করছে নিজেদের মধ্যে। যাকগে করুক। তাকে ডিসটার্ব না-করলেই হল। মনটাকে সাংঘাতিক শক্ত করে আবার লেখায় মন দিলেন তিনি। রাত্রি দশটা পর্যন্ত হ্যারিকেনের আলোতে পাক্কা পনেরো পাতা লিখে বেজায় ক্লান্ত হয়ে কলম বন্ধ করলেন বিভূতিবাবু। মনটা খুশিতে নাচছে। সাংঘাতিক ভালো হচ্ছে গল্পটা। কাল সকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এরপর আরো দুটো গল্পের প্লটও এসে গেছে মাথায়। এখানকার ভূতগুলো সম্পর্কেও খুবই ভালো ধারণা হল বিভূতিবাবুর। তারা শুধু বিভূতিবাবুকে দেখেশুনে ফিরে গেছে। কেউ তার কাজে এতটুকু ব্যাঘাত ঘটায়নি। রাত্রে মুরগির মাংস বানিয়েছিল শংকর। খাঁটি দেশি মুরগি। খেয়েদেয়ে উঠোনো এসে দাঁড়ালেন। বিশাল আকাশটায় ভর্তি তারা। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এক-একটা হাওয়ায় আবার সেই ফিসফিস শব্দ। বিভূতিবাবু বুঝেও গেলেন, তেনাদের কেউ কেউ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছেন। উহ দারুণ জায়গা বটে। কেন যে এতদিন আসেননি। ভাগ্যিস আর কোনো ভূতের গল্পলেখক এখানের খবরটা পায়নি। নইলে ... ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনের তালগাছটার মাথায় চোখ পড়তেই ছ্যাত করে উঠল বুক। সাদা কাপড় মুড়ি দেওয়া কে যেন তাল গাছটার মাথায় বসে রয়েছে। চোখ রগড়ে নিয়ে

আবার ভালো করে তাকালেন বিভূতিবাবু,... হ্যাঁ সত্যিই তো... হঠাৎ মনে পড়ল মোড়ল মশাইয়ের বলা সেই কালীবুড়ির কথা। এই ঘরটাই তো কালীবুড়ির।

সাদা কাপড় মুড়ি দেওয়া কে যেন তাল গাছটার মাথায় বসে রয়েছে...

বিভূতিবাবু রয়েছেন বলে বুড়ি এখন নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে তালগাছে রয়েছে। নিমেষে ভয় উধাও হয়ে গিয়ে মনটা কালীবুড়ির জন্য শ্রদ্ধায় ভরে উঠল তার। দুম করে হাতজোড় করে দু-বার প্রণামও করে ফেললেন তালগাছের মাথাটাকে উদ্দেশ্য করে।

২

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চক্ষু চড়কগাছ। একী কাণ্ড! গতকাল সারাসন্ধে ধরে যে গল্পটা লিখেছিলেন, আর একটু মাত্র বাকি ছিল, একরাত্তিরেই গল্পটা পুরো পালটে গেছে। বিভূতিবাবুর লেখার সঙ্গে কোনো মিল নেই।

কী বিচ্ছিরি হয়েছে গল্পটা। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কোথাও কোথাও আবার শব্দ-অক্ষরগুলো পর্যন্ত উলটে-পালটে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বিভূতিবাবু। কে করল এমন সর্বনেশে কাণ্ড?

শংকর পুরো ব্যাপারটা শুনে গম্ভীর হয়ে বলল 'হুম বুঝেছি। এটা তেনাদেরই কারো কম্ম হবে। আপনি এক কাজ করুন বাবু, আজকে আবার গল্পটা লিখুন। তারপর বাক্সতে ভরে তালাচাবি দিয়ে দেবেন। ব্যাস আর চিন্তা নেই। শংকরের কথা শুনে বিভূতিবাবু আবার লিখতে বসলেন গল্পটা। সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত্তির গড়িয়ে ন-টার সময় শেষ হল লেখাটা। আগের থেকে আরো ভালো হয়েছে গল্পটা। শংকরকে ডেকে নিজের মোটা চামড়ার সুটকেসটার জামাকাপড়ের ভাঁজে গল্পটা রাখলেন। তারপর বাক্সে তালা দিয়ে চাবি নিজের বালিশের নীচে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম।

পরদিন সকালে উঠে দুরুদুরু বুকে চাবি দিয়ে বাক্সের তালা খুললেন। তারপর জামার ভাঁজ থেকে গল্পটা বার করে চোখের সামনে মেলে ধরতেই আবার মাথায় বজ্রপাত। সবেবানাশ, ফের পালটে গেছে! প্রায় কেঁদে ফেললেন বিভূতিবাবু। এত পরিশ্রম আবার জলে গেল। পুরো গল্পটা আবার উলটে-পালটে চটকানো।

শংকরবাবুর এমন কাহিল অবস্থা দেখে বিভূতিবাবুর টাকে হাত বুলিয়ে বলল, 'ব্যবস্থা আরো কঠিন করতে হবে।'

তারপর পুরো তিন-তিনটে দিন একই ঘটনা। বিভূতিবাবু রোজ প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গল্পটা লিখলেন আর রাত্তিরে সেটা পালটে যেতে থাকল। একদিন বাক্সতে গল্পটা ভরে তালাচাবি দিয়ে তার ওপর মোটাদড়ি দিয়ে বাক্সটা কষে বাঁধা হল। কোনো লাভ হল না। পরদিন বাক্সটা দড়ি দিয়ে বাঁধার পর বিভূতিবাবু নিজে সারারাত বাক্সর ওপর জেগে বসে রইলেন। তারপরেও একই কাণ্ড। শেষদিন শংকর আর উনি সারারাত দুজনে গল্পটাকে চেপে ধরে রইলেন। সারারাত কিছু হল না। ভোরের দিকে দুজনেরই কখন একটু চোখ লেগে গেছিল, চোখ খুলতেই .... যাহ আবার গেছে!

সকালে মোড়লমশাই এসেছিলেন বিভূতিবাবুর গল্পের কদ্দূর কী হল জানার জন্য। শংকর আর বিভূতির এমন কালো চেহারা দেখে উনি বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বিভূতিবাবুর কাছে পুরো ঘটনা শুনে সাংঘাতিক রেগে গিয়ে বললেন, 'আমাকে আগে জানাননি কেন?... আহরে এত খাটুনির কাজ সব পণ্ড.... এ নিশ্চয়ই ব্যাটা পাঁচুগোপালের কম্ম।' 'কে পাঁচুগোপাল' উদাসভাবে জিজ্ঞেস করলেন বিভূতিবাবু।

'আর বলবেননি। পাঁচু ছিল এই গায়ের নাম করা সিঁদেল চোর। মহাচালাক। কিছুতেই ধরা যেত না। ব্যাটা যেখানে-সেখানে লুকিয়ে পড়তে পারত। একবার পাশের গ্রামে চুরি করতে গিয়ে লোকের তাড়া খেয়ে একটা পুকুরে পাকা দেড়দিন ডুবে লুকিয়েছিল। গ্রামের লোকেরাও ছাড়েনি। সারাদিন ধরে পুকুরের পাশে বসেই পাহারা দিয়েছিল সকলে। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না-পেরে পাঁচু ভেসে উঠেছিল তবে জ্যান্ত আর ধরা দেয়নি, মরা। তো ব্যাটার মরার পরেও স্বভাব যায়নি। এখনতো ভূত হয়ে আরো সুবিধে হইছে। চোখেও দেখা যায় না। এর-ওর পুকুরের মাছ ও চুরি করে। যার-তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্তর লোপাট করে। ঘেঁটেঘুঁটে দেয়। এইতো দিন চারেক আগেই আমার পুকুরটার সব মাছ সাবাড় করে পুকুরেই লুকিয়ে ছিল। রাবণ ওঝা এসে মন্ত্রপুত জাল ফেলে ব্যাটাকে ধরে এইসান পিটুনি দিয়েছে যে তারপর থেকে ওর টিকিটি নেই ওই বজ্জাতটাই এখানে এসে আপনার কাজ পণ্ড করছে। চিন্তা নেই আমি রাবণ ওঝাকে ডেকে আনছি।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুপুর দুটোর সময় ভূতনাথবাবু রাবণ ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বিভূতিবাবু মনে মনে কল্পনা করেছিলেন রাবণ ওঝার চেহারা রাবণের মতোই হবে। কিন্তু পুরো উলটো। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে এমন লিকপিকে চেহারা। কদমছাঁট চুল। কপালে কমলা রঙের লম্বা টিপ। পরনে লাল রঙের ফতুয়া আর লুঙ্গি। গলায় নাভি পর্যন্ত ঝোলানো ইয়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। রাবণ ওঝা এসেই তার মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে তারপর লম্বা নাকটা মেঝেতে ঠেকিয়ে বারকয়েক মাটির গন্ধ নিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে বলল 'পেয়ে গেছি। সেই আঁশটে গন্ধ। ব্যাটা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।' বলেই আকাশ ফাটানো চিৎকার করে উঠল রাবণ। 'এ্যাই বজ্জাত, ভালো চাসতো এক্ষুনি এঘর ছেড়ে পালা। ছি-ছি

গাঁয়ের অতিথির সঙ্গে কিনা বদমাসি, আজ তোর কান কেটে যদি কিমা না-বানিয়েছি তো আমার নাম রাবণ ওঝা নয়।' এই বলে ফতুয়ার পকেট থেকে এক খাবলা কীসের গুঁড়ো বার করল রাবণ। জিনিসটা কী বোঝার আগেই হাওয়ায় চোখ-নাক জ্বলে উঠল বিভূতিবাবুর। ওরে বাপরে, রাবণ শুকনো লংকার গুঁড়ো বার করেছে।

রাবণ ওঝার চোখ-মুখ পালটে গেছে ততক্ষণে। বড়ো বড়ো চোখ দুটো লাল টকটকে। চোখের গুলিদুটো সাঁইসাঁই করে এদিক-ওদিক পাক খাচ্ছে।

'আপনার সমস্যার জায়গাটা দেখানতো' প্রচণ্ড ভারি গলায় বলল রাবণ। 'এ্যাঁ ... হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে বিভূতিবাবু দৌড়ে গিয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বার লেখা গল্পটার কাগজগুলো রাবণের সামনে এনে সবে করুণ সুরে নিজের দুঃখের কাহিনিটা বলতে যাবেন, রাবণ হাত তুলে বিভূতিবাবুকে থামিয়ে দিল। 'কিছু বলতে হবে না। আমি সব শুনে নিয়েছি। মজা দেখাচ্ছি ওর। কাগজগুলো ওই টেবিলটার ওপর রাখুনতো। আর আমাকে একটা লাঠি দেন বেশ মোটা দেখে।'

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুপুর দুটোর সময় ভূতনাথবাবু রাবণ ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন...

বিভূতিবাবু দুরুদুরু বুকে কাগজগুলোকে টেবিলের ওপর রাখলেন। শংকর কী ভেবে ঘরের দরজার বিশাল মোটা খিলটা এনে দিল রাবণকে। খিলটা হাতে নিল রাবণ। তারপর পকেট থেকে লাইটার বার করে হাতের গুঁড়ো লংকাটুকু একটা কাগজে ঢালল, ঢেলেই ফস করে জ্বালিয়ে দিল কাগজটা।

ওরে বাপরে, কাকে বলে চোখ-মুখে জ্বালা। চোখে অন্ধকার দেখলেন বিভূতিবাবু। রাবণ কিন্তু নির্বিকার। পোড়া লংকা বিভূতিবাবুর গল্পের কাগজে ঢেলে দিয়ে খিল তুলে দমাদম পিটোতে শুরু করল। পেটাই পর্ব শুরু হবার একটু পরেই বিভূতিবাবু দেখলেন তার লেখা কাগজগুলোর অক্ষরগুলো সব ঠ্যাঙানির চোটে পাঁই পাঁই করে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে। রাবণ মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকটা কাগজকে আলাদা আলাদা করে পেটাল। তারপর একসময় বিভূতিবাবু নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার গল্পের কাগজ থেকে ধোঁয়ার মতো কীসের একটা ডেলা থপ করে মেঝেতে পড়ল।

রাবণ ওঝার আরেকটা খিলের বাড়ি ওটঠার ঘাড়ে পড়তেই সাঁ করে জানলা দিয়ে গলে উড়ে গেল ডেলা পাকানো ধোঁয়াটা।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভূতের গল্পলেখক বিভূতি গুঁই, সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে 'আঁ-আঁ-আঁ হ্যাঁক... ধুর ছাই' বলে জীবনে প্রথম খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ভয় পেয়ো না

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ভিড়ে ঠাসা স্টেশনে ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও সুমনের শিরদাঁড়া বরাবর একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। সে নিজের আগের মুহূর্তের দেখাটাকে মুছে ফেলতে চোখ বন্ধ করল। নিজেকে বোঝাল সে ভুল দেখেছে। তারপর চোখ খুলল।

শশব্যস্ত হাওড়া স্টেশন। সবাই হুটোপাটি করছে। পাশাপাশি তিনটে ট্রেন ঢুকেছে। শতশত লোক। তার মধ্যে একটা মেনলাইন বর্ধমান লোকাল অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। দৌড়াদৌড়ির পরিবেশ। শুধু সুমন পত্রপত্রিকার হুইলার স্টল ঘেঁসে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। ভিড়ের মধ্যে ওই অদ্ভুতদর্শন লোকগুলো কারা? সংখ্যায় জনা-সাতেক। চেহারা সাধারণ মানুষের মতো হলেও চোখমুখ অবিশ্বাস্যরকম থমথমে। কারও চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কারও বা এমন কোটরাগত, যে চোখ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। হালচাল দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। অথচ আশ্চর্য রকম নির্বিকারভাবে হাঁটছে।

এরা কারা? ওদের পাশে পাশে যারা চলেছে। তাদের কারো কি ব্যাপারটা চোখে পড়েনি? নাকি গন্তব্যে যাওয়ায় ব্যস্ততায় কেউ আমল দিচ্ছে না? তাহলে সুমনের এমন অস্বস্তি লাগছে কেন? সুমন একটু ভরসা পেতে পাশের একজনকে ছুঁয়ে দেখল। তাতে ভদ্রলোক একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় সুমন চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে অন্য দিকে ঘাড় ঘোরাল। আরো ওদিকেও তো দুজন একইরকম লোক! এমন হচ্ছে কেন আজ তার সঙ্গে? সুমনের সব ধারণাগুলো কেমন ঘেঁটে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটার ধকল এখনও কাটেনি সুমনের।

স্টাডি লিভের ভেতর স্যার হঠাৎ করে ডেকে পাঠানোয় তার ইউনিভার্সিটি আসা। আসার ইচ্ছা ছিল না। সুমনের দেখতে সমস্যা হচ্ছিল। আগেরদিন হাত থেকে পড়ে চশমাটার একদিকের কাচ ভেঙেছে। দোকানদারের দেওয়া একটু কম-পাওয়ারের টেমপোরারি চশমাটায় চারপাশ দেখে সন্তুষ্টি হচ্ছে না। এই অবস্থায় স্যারের অর্ডার—'চটপট চলে এসো। তোমার প্রোজেক্ট রিপোর্টটায় কিছু যোগবিয়োগ করতে হবে।'

অগত্যা আসতেই হল। আর এই গঞ্জের দোকানগুলোও হয়েছে বটে! আজকের দিনে এসেও আধুনিক হল না। লেন্সের কাজ সেই কলকাতা থেকেই করে আনবে। ফল, একদিনের অসুবিধা ভোগ করো!

সুমনের সারাটা দিন তেমন কিছু অস্বাভাবিক কাটেনি।

কাজ মিটিয়ে কলেজ স্ট্রিট ফেরত জ্যামে পড়েছিল। তাই বাস থেকে নেমে ছ-টা পঞ্চান্নর কর্ড লাইন লোকালটা ধরবার জন্য প্রায় দৌড় লাগাতে হয়েছিল। রাস্তা পেরিয়ে, যত জোরে পা চালানো সম্ভব চালিয়ে সে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গিয়েছিল। ট্রেন ধরা ছাড়া অন্য কোনো কথা মাথায় রাখার সময় ছিল না তার। অবশ্য তাতেও একটু দেরি হয়ে যায়। চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা লাইন ধরে দূরে চলে যাচ্ছে দেখে সুমন বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক তখনই তার মনে হল চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে তারা কেউ 'পাবলিক' নয়। যেন অনেকগুলো ছায়া তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়ে গেলে যেমনটা হয়, সুমন সেভাবেই বিভ্রান্ত ভয়ার্ত হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল যে সবার পায়ের পাতা পিছনে গোড়ালি সামনে।

লোকে ভয়ের স্বপ্ন ভাঙতে চোখ খুলে চেনা চারপাশ দেখে নেয় আশ্বস্ত হতে। সুমন খোলা চোখে আতঙ্কের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছিল। তাই ভয় কাটাতে সে চোখ বন্ধ করেছিল। আর ভাবতে চেষ্টা করেছিল সে ভুল দেখেছে।

এরপর থেকে ওই অবাস্তব লোকগুলো সুমনের চোখের আড়াল হতেই চাইছে না। সুমনের ভয় বাড়ছিল। এত আলো, এত লোকজনের মধ্যে থেকেও মনে হচ্ছিল—সে অন্ধকারে একা।

সুমন এবার পত্রপত্রিকা বিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

'দাদা, ওই অদ্ভুত লোকগুলোকে দেখেছেন? কারা বলুন তো?'

সামনে সুমনকে অকারণে অস্থির দেখে দোকানদার কিছু বুঝতে পারল না। সে সুমনের আঙুলের ইশারা মতো প্ল্যাটফর্মে ডিসপ্লে বোর্ডটার নীচেটায় হালকা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কোন লোক দুটো? কোনো টিভি আর্টিস্ট?'

সুমন তাঁকে শুধরে দিয়ে আসল লোকদুটোকে দেখাতে চাইছিল। কিন্তু লোকদুটো তাদের ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো পাকিয়ে এমনভাবে তাকিয়েছিল—যেন সুমনকে শাসন করছে। সুমনের গলা দিয়ে এরপর আর আওয়াজ বেরল না। লোক দুটো তার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে সে পালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইল। কিন্তু কোন ভিড়? কোথায় মিশে যাওয়া? ওই অবাস্তব লোকগুলোও তো ভিড়ের মধ্যেই মিশে রয়েছে। তারাই সুমনের পাশে চলে এসেছিল। তারপর থেকেই একটা ভয় সুমনকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

যেন অনেকগুলো ছায়া তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে...

'সাতটা সতেরোর মশাগ্রাম লোকাল সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।'

অ্যানাউন্সমেন্টটা কানে আসতেই সুমন প্রায় অন্য কোনো দিকে না-তাকিয়ে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এল। ঠাসাঠাসি লোকজন। কে আগে দৌড়ে উঠে বসার জায়গা নিতে পারে তার প্রতিযোগিতা। ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। সুমন যে কামরাটা সামনে পেল ভিড়ের পিছন পিছন উঠে পড়ল। বসার সুযোগ না-পেলেও দাঁড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা জুটিয়ে নিয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে স্টেশনের দিকে ফিরে চাইল। না, তেমন কিছু নেই। শুধু জনঅরণ্য। প্রতিদিনের মতো। সে নিশ্চয়ই ভুল দেখছিল। ওসব কিছু নেই। কুসংস্কার, মনের ভুল।

বালীতে বেশ কিছু লোক নামার পর ডানকুনিতে এসে ট্রেন প্রায় খালি হয়ে গেল। সুমনকে সেই বারুইপাড়া পর্যন্ত যেতে হবে। সে জানলার ধারে সিট বাগিয়ে নিয়ে বাইরের হাওয়ায় নিজেকে মেলে ধরল। বেশ আরাম!

'বাড়ি ফেরার সময় কোলেদার দোকান থেকে চশমাটা নিতে হবে। ভারি অসুবিধা হচ্ছে এই ভুলভাল চশমাটায়।' সুমন নিজেকে বলে মনে মনে। আর কোলেদাটারও হয়েছে আজব স্বভাব। সারাদিন পাগলের মতো ঘসা কাচ নিয়ে কী সব গবেষণা করে চলেছে। ব্যবসায় মন নেই। আজকের কাজ কাল। কালকের কাজ পরশু করব ভাব। এইভাবে কাস্টমারকে ঠিকঠাক সার্ভিস দেওয়া যায়! এই যে সুমন ভুগছে—কম তো দেখছেই, গ্লাস উলটোপালটা দেখছে—এর জন্য কী কোলেদার ঢিলেমি দায়ী নয়! দশ বছর হয়ে গেল ব্যবসার, নিজে নিজে লেন্স পালটানোর পরিকাঠামো তৈরি হল না। সুমনের সব রাগ ভরতকোলের ওপর গিয়ে পড়ে। আজ কী ভয়টাই না-পেয়েছিল সে! হয়তো চশমার পাওয়ারের গোলমালের জন্যই সে স্বাভাবিক মানুষজনকে বিকৃত অবস্থায় দেখেছে। সুমন অন্য সম্ভাবনাটা নাকচ করে আশ্বস্ত হতে চায়।

যাক গে! যা হয়েছে হয়েছে। ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো।

'কী হয়েছে? এতো ঘামছ কেন?'

পাশের যাত্রীর এই কথায় সুমন নিজের জামাতে হাত রাখল। জামাটা জ্যাবজ্যাবে হয়ে ভিজে গেছে। সুমন মনে মনে বলল—আসলে ঘাম দিয়ে ভয় ছাড়ছে। মুখে বলল, 'কই না তো। ওই যা ঠেলাঠেলি ভিড়।'

'কোথায় ভিড়? আজ তো ট্রেন ফাঁকা!'

'আসলে আমার একটুতেই ঘাম হয়। হাওড়ায় দৌড়াদৌড়ি হয়েছে তো।'

পাশের যাত্রী কিছুটা নিশ্চিন্ত মুখ করে বলল, 'ও, আমি ভেবেছিলাম, বুঝি শরীর খারাপ লাগছে।'

সুমনের আর কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

সে ঘাড় ফিরিয়ে ট্রেনের ভিতরটায় চোখ বুলিয়ে নিল। গরমের দাপটে সবাই কম বেশি কাহিল। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমনের পাশাপাশি উলটোদিকের সিটগুলো প্রায় ফাঁকা। একদম কোণের সিটের লোকটা তো পা তুলে উবু হয়ে বসে আছেন। যদিও মুখটা অন্যদিকে তবে দেখে মনে হচ্ছে কোনো মেঠো লোক হবে। পরনে ময়লা ফতুয়া, নোংরা ধুতি, পিছন থেকেই বোঝা যাচ্ছে উসকো-খুসকো চুল। সুমন এইটুকু দেখা সেরে নিয়ে আবার জানলার দিকে ফিরল। কামরার পিছন দিকে একজন হকারের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন থামল। জনাই রোড এল বোধহয়।

স্টেশন পার হতেই বাইরের দৃশ্যরা অন্ধকারে হারাল। পিছনের হকারটাও বোধহয় বকবক করতে করতে থেমে গেল। সুমন যাবে বারুইপাড়া। এখনও দুটো স্টেশন।

অন্যদিনের চেয়ে আজকের যাত্রা যেন বড্ড তাড়াতাড়ি শুনশান হয়ে আসছে। যদিও তার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আবার কখন জিজ্ঞাসা করে বসবেন—শরীর খারাপ কিনা। সুমন নিজেকে একবার পরখ করে নিল। না, আর ঘাম হচ্ছে না।

এককীত্ব কাটাতে সে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করল, 'আপনি কতদূর যাবেন?'

সুমনের প্রশ্নে ভদ্রলোক চট করে উঠে পড়ে উত্তর দিলেন, 'এই তো নামার সময় হল। বেগমপুর।'

তিনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ কী দেখে আঁতকে উঠে সুমন তাঁকে হাত টেনে বসিয়ে দিতে চাইল। ভদ্রলোক হতচকিত হয়ে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল।

'আপনি কি পাগল নাকি? না-কিছু ছিনতাইয়ের মতলব।' লোকটি সুমনের ওপর চড়াও হয়।

সুমনের গলা থেকে আওয়াজ সেটুকু বেরল তাতে সে কাতর হয়ে বলল, 'ওই সিটের লোকটাকে দেখুন। আমার প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল!'

'কোন সিটের? কোথায় লোক? ইয়ার্কি পেয়েছেন?'

'ওই যে! পা তুলে উবু হয়ে বসে থাকা লোকটা! ওর পায়ের দিকটা লক্ষ করুন।'

আমি তখনই বলতে চাইছিলাম, 'তোমার শরীর খারাপ। এখন বুঝতে পারছ।'

সুমন কিছু বুঝতে পারছিল না। ইনি কি লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না? হে ভগবান! সে চিৎকার করে ওঠে, 'হবহু এইরকম লোক আমি হাওড়া স্টেশনেও দেখেছি। ওই যে ওইখানে বসে আছে.......।'

'একজন ভূত তাইতো? 'লোকটা হাঃ হাঃ করে কয়েক মুহূর্ত হেসে নিল। তারপর সুমনকে ধমকে বলল, 'দেখে তো কলেজ টপকেছ মনে হচ্ছে। তবু এমন ছেলেমানুষি? আর অতই যখন ভয়, তখন একা একা বেরিয়েছ কেন।'

লোকটার হাসিটা আস্তে আস্তে কেমন দুর্বোধ্য কুটিল হয়ে গেল। সুমনকে একা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই একটা থমথমে ভাব ছেয়ে ফেলল পরিবেশে। লোকটা প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল, না-মিলিয়ে গেল? ভাবনাটা আসতেই সুমনের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। স্টেশন থেকে একজন মানুষও কি উঠছে? সুমন রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করে।

না, কেউ নেই। এবার শুধু সে আর ওই উবু হয়ে বসে থাকা লোকটা। এতক্ষণ সে এককোণে বসে ঝিমোচ্ছিল। এখন চিৎকার চেঁচামেচিতে জেগে বসেছে। ঠিক হাওড়ায় দেখা অবাস্তব লোকগুলোর মতো থমথমে মুখ। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটো দিয়ে দেখছে। যেন সুমনের দেহ থেকে সব কিছু শুষে নিতে চায়। এমন ভয়ানক দৃষ্টি। সুমন এখন ঘামছে না। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে দিলে হয়তো বেঁচে যাবে। ঝিকঝিক ঝিকঝিক আওয়াজ করে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। কিন্তু পরের স্টেশনটা কি কোনো দিন সুমনের জন্য আসবে? লোকটা নড়েচড়ে বসল। এবার কি উঠে এগিয়ে আসবে? কামরায় আর কেউ নেই। ভর সন্ধেবেলা এই কর্ড লাইন লোকাল জনশূন্য হয়ে যাওয়াও ওই লোকটার উপস্থিতির মতো অবাস্তব ঘটনা। সুমন জানে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করেওনি।

লোকটা উঠছে! এগিয়ে আসছে। কঙ্কালসার হাতে লম্বা লম্বা নখযুক্ত আঙুল। হয়তো তেড়ে এসে সুমনের গলাটা ওই হাত দিয়েই চেপে ধরবে। সুমন দরজার কাছে দৌড়ে যায়। এরপর পালাতে হলে একটা লাফ দিতে হবে। কিন্তু তারপর?

সুমন পিছন হাঁটছিল লোকটার গতিবিধির দিকে নজর রাখতে রাখতে। ট্রেনটা ব্রেক কষল। হঠাৎ সুমন শূন্যে ঝুলে গেল কয়েক পলকের জন্য। সে পড়েই যাচ্ছিল, কে তার হাত টেনে ধরেছে।

'কোলেদা!'

'কী-রে? কী ব্যাপার? ফাঁকা ট্রেনে এমন করে ঝুলছিলি কেন?'

'কোলেদা ও কে?' সুমন কাঁপা কাঁপা আঙুল নেড়ে অদ্ভুত লোকটাকে দেখায়। লোকটা এখন সুমনের ছেড়ে আসা জায়গাটায় বসে আছে। জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

'ওই লোকটা...আমাকে মেরে ফেলবে...!'

সুমন কাঁদোকাঁদো স্বরে বলে চলেছিল।

'ও কিছু নয়। আমার আনমনে বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছিল রে। এখন তোর নিজের চশমটা নে তো। দ্যাখ, একদম নতুন বানিয়ে দিয়েছি।'

কোলেদা সুমনকে শান্ত করতে করতে নিজের ব্যাগের ভিতর হাত ঢোকাল। সেখান থেকে একটা ছোটো পলিথিনের প্যাকেট তুলে নিল। এরপর সেটা সুমনের হাতে দিল। সুমন চোখে পরে থাকা চশমাটা খুলে নিয়ে আসল চশমাটা চড়িয়ে নিল। ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে আরও কমে আসছিল। সুমনের কাঁপুনি তখনও কমেনি। কোলেদা হাস্যমুখে সুমনের নাকের ওপর চশমাটা আরেকটু ঠিকঠাক করে দিয়ে বলল, 'দেখে নে। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস কিনা।'

কোনও দিকে না-তাকিয়ে নিজের ছেড়ে আসা জায়গাটার দিকে দেখে সুমন। তার হৃৎস্পন্দনের ধকধক শব্দটা বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। 'কোলেদা, ওই লোকটা!'

কোথায় গেল লোকটা! সুমনের ছেড়ে আসা জায়গাটা তো ফাঁকা। সুমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

'আরে বোকা। অত ভয় পাওয়ার কী আছে। এই যে হাওড়া, শিয়ালদায় এত লোকে লোকারণ্য প্রতিদিন। ওদের সবাই কি আর মানুষ?' পিছন থেকে কোলেদা ফিসফিস করে বলল।

লোকটা উঠছে! এগিয়ে আসছে। কঙ্কালসার হাতে লম্বা লম্বা নখযুক্ত আঙুল...

'তাহলে কি?' ঘুরে তাকাতে গিয়ে ট্রেন থামার ঝাঁকুনিতে সুমন উলটে যাচ্ছিল। বারুইপাড়া এসে গেছে।

সে ঘোর কাটিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে পা রাখল। 'কোলেদা কী বলছিলে?' সুমন বেশ জোরালো আওয়াজে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

কোনো উত্তর ফিরে এল না। 'কোলেদা?' ট্রেন থেকে নামার মতো ওই কামরায় আর কাউকে দেখতে পায় না সুমন।

প্ল্যাটফর্মে দুজন অফিস ফেরত মধ্যবয়সি ভদ্রলোক সুমনের কাছে চলে এসেছিল।

তাঁরা সুমনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি ঠিক আছো তো। বেগমপুর থেকে আমাদের এক বন্ধু মোবাইলে ফোন করে বলল—এই কামরায় তুমি নাকি একা পড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তাই দেখতে এলাম।'

সুমনের শরীর তখনও আতঙ্কে শক্ত হয়ে আছে। সে বলতে চাইছিল, 'এই কামরায় হাত-পা বাঁকা একজন লোক...।'

কিন্তু তার কথা তাঁরা শেষ করতে দিল না। বলল, 'ও কিছু নয়। আসলে প্রতিবন্ধীদের একটা সম্মেলন ছিল তো। সব ওই কামরাটায় উঠেছিল। বেশির ভাগ ডানকুনিতে নেমে যাওয়ায় একদম খালি হয়ে গেছে। তুমি কামরা চেঞ্জ করে নিতে পারতে তো। একা একা অসুবিধায় পড়তে হত না।'

সুমন চেঁচিয়ে ওঠে, 'প্রতিবন্ধী নয়। হতে পারে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস করুন!'

লোকদুটো অবিকল ট্রেনের ভদ্রলোকের মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। তারপর কুটিল ভ্রূ ভঙ্গি করে বলল, 'তবে কি ভূতের সঙ্গে সফর করছিলে তুমি?'

সুমনের মনে হল এবার এরাও অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে দৌড় লাগাল। সিঁড়ি ভেঙে বাজারে নেমে মনাদার সাইকেল স্ট্যান্ডে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। সুমনকে সাইকেল ধরিয়ে দু-টাকার খুচরোটা নিতে নিতে মনাদা বলে, 'কলকাতা থেকে এলি? চশমা দোকানের কোলের খবরটা শুনেছিস? আজ কীভাবে কে জানে বেগমপুরে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে.....।'

খবরটা শুনে সুমনের থমকে থাকার সময় ছিল না। তাকে পালাতে হবে। সে যা দেখেছে সেটা বললে মনাদা কি বিশ্বাস করবে? নাকি 'হাঃ হাঃ' করে হাসতে হাসতে হাওয়া হয়ে যাবে? সে সাইকেল নিয়ে চটপট এগিয়ে গেল।

'দুর্ঘটনা কখন কীভাবে আসে। মানুষ এই আছে এই নেই!'

সুমন এসব কথায় কর্ণপাত করে না। কোলেদা তাকে চশমা দিয়ে গেল। অথচ মনাদা বলছে—কোলেদা নেই। কিন্তু মনাদা জলজ্যান্ত না-অবাস্তব? সুমন এবার সেই ধোঁয়াশায় হারিয়ে যেতে চলেছে। সে পিছন ফিরে না-তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেয়।

ওপরের আকাশে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ। ঝোড়ো বাতাস গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুমন পিচ রাস্তা ধরে প্রাণপণ বাড়ির দিকে।

আচ্ছা, কোলেদা কি ভুল করে ফেলেছিল? ঘসাকাচ নিয়ে এলোমেলো গবেষণা করতে করতে নতুন কিছু বানিয়ে ফেলেছিল? যা দিয়ে আরেকটু বেশি কিছু দেখা যায়? তার জন্যই কি আজ?

সুমন সাইকেলে গতি বাড়াল। একটু আগে মনাদা বলল, মানুষ এই আছে, এই নেই। কয়েক ঘন্টায় এ ব্যাপারে অনেক কিছুই অনুভব করেছে সে। সুমন তার নিজের চশমার ভিতর দিয়ে হালকা আলোয় পারিপার্শ্ব দেখতে থাকল। কিছুটা দমকা হাওয়া ঘাড়ে ঝাপটা মেরে চলে গেল। ওই তো রাস্তার একপাশে একটা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সামনের মোড়ের বকুলগাছের ডালটা হঠাৎ অস্বাভাবিক কেঁপে উঠল। ইচ্ছা না-থাকলেও সে-সব দিকে সুমনের চোখ চলে যাচ্ছিল। সতর্কভাবে। সে কিছু দেখতে পেল না। তবু কেউ যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল—আছে। চারপাশে এত উপস্থিতি, এত স্পন্দন তার সবটুকুই কি মানুষের?

হঠাৎ সুমনের মনে হল জামার বুক পকেটটা ভারী ভারী লাগছে কেন? চশমা পালটানের সময় খুলে ফেলা চশমাটা সে ট্রেনে রেখে এল? না......পকেটে রাখল? নাকি কোলেদা নিজের ভুল নিজেই নিয়ে গেল? সুমন আস্তে আস্তে কাঁপাকাঁপা ডান হাতটা পকেটের ওপর রাখতে যায়। এবার দমকা হাওয়াটা আরও জোরদার

হল। দূরে কটকট করে পোকা ডেকে থেমে গেল। হাওয়ার বিপক্ষে একহাতে চালাতে গিয়ে টলে গেল সাইকেলটা, আর কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠল সুমনের।

লেখক পরিচিতি

শক্তিপদ রাজগুরু

জন্ম ১৯২২ সালে। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও লেখেন। কিশোর খুবই প্রিয় তাঁর সৃষ্ট 'পটলা' চরিত্রটি। নির্মল হাস্যরসের গল্পগুলি পাঠক-সমাদৃত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *মেঘে ঢাকা তারা, অগ্নিসাক্ষর, আঁধারে একটু আলো* প্রভৃতি।

শৈলেন ঘোষ

জন্ম ১৯৩১ সালে। তিনি শুধুমাত্র ছোটোদের জন্যেই লেখেন। তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাস পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। রূপকথার গল্প লেখায় তিনিই বাংলা সাহিত্যের শেষ লেখক। 'শিওরঙ্গন' সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *মিতুল নামে পুতুলটি, আমার নাম টায়রা, ভালোবাসার ছোট্ট হরিণ* প্রভৃতি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৪ সালে। প্রথমে জাহাজের কর্মী ছিলেন। সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরে শিক্ষকতা করেন কিছুদিন। শেষে সাংবাদিকতার চাকরি। বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের জন্যেও অনেক লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *বিন্নির খই লাল বাতাসা, অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা, ফেনতুর সাদা ঘোড়া, অলৌকিক জলযান, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* প্রভৃতি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৫ সালে। স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু করেছেন। পরে সাংবাদিকতায় আসেন। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। বড়োদের মতো ছোটোদের জন্যেও অনেক ভালো লেখা লিখছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *ঘুণপোকা, মানবজমিন, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, গোঁসাইবাগানের ভূত* প্রভৃতি।

শরদিন্দু কর

জন্ম ১৯৪০ সালে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সোভিয়েত রাশিয়ায় চাকরি সূত্রে ছিলেন। অবসর নিয়েছেন। বড়োদের ও ছোটোদের জন্যে লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *মানুষের রূপকথা, মায়ামানুষ* প্রভৃতি।

বলরাম বসাক

জন্ম ১৯৪৩ সালে। ছোটোদের জন্য দারুণ সব লেখা লিখেছেন। বিখ্যাত বই : *পিঁপড়ে হাতি, হালুম* প্রভৃতি।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৪৪ সালে। বাংলা সাহিত্যে এম.এ.। অধ্যাপনা করতেন। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *কিস্তিবন্দি, গোয়েন্দার নাম ম্যাক, পার্কের সেই বুড়ো* প্রভৃতি।

শ্যামল দত্তচৌধুরী

জন্ম ১৯৪৫ সালে। ইঞ্জিনিয়ার, স্টিম বোলিং মিল থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে পুরোদমে সাহিত্য রচনায় আছেন। বড়োদের চেয়ে কিশোররা তাঁর লেখার ভক্ত পাঠক। উল্লেখযোগ্য বই : *বমাল গ্রেফতার, কেমন আছে ইয়েতিরা* প্রভৃতি।

গৌর বৈরাগী

জন্ম ১৯৪৬। বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। সরকারি কর্মী ছিলেন। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও মনকাড়া লেখা লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *আকাশকুসুমপুরের ডাইরি, গম্ভীরপুরের রাজামশাই, আকাশবাণী মহাদেবপুর* প্রভৃতি।

শিশির বিশ্বাস

জন্ম ১৯৪৯ সালে। ভারত সঞ্চার নিগমের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। মূলত ছোটোদের জন্যে লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই, *রোমাঞ্চ সব গল্পেই*।

রতনতনু ঘাটী

জন্ম ১৯৫৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এখন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সহ সম্পাদক। বড়োদের পাশাপাশি শিশু ও কিশোরদের জন্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *মামাদের পোষা পরি, তিতির বন্ধু, কমিকস দ্বীপে টিনটিন* প্রভৃতি।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৫৬ সালে। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। শিক্ষকতা করেন। বড়োদের ও ছোটোদের জন্যে লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *মধুরা নিরুদ্দেশ, মিথ্যে রূপটানে* প্রভৃতি।

দেবাশিস সেন

জন্ম ১৯৬১ সালে। বিজ্ঞানের স্নাতক। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বড়োদের ও ছোটোদের জন্যে লেখেন।

প্রচেত গুপ্ত

জন্ম ১৯৬২ সালে। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর পেশা। বড়োদের গল্প-উপন্যাসের তাঁর ভক্ত-পাঠক অনেক। কিশোরদের লেখা তাঁর উপন্যাস এবং গল্প পাঠকমন জয় করেছে। উল্লেখযোগ্য বই : *কাঞ্চনগড়ের কোকিল স্যার, নীল আলোর ফুল, ঝিলডাঙার কন্যা* প্রভৃতি।

সৈকত মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৬৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। কমার্শিয়াল ট্যাক্স দপ্তরের উপ মহাধ্যক্ষ। বড়োদের জন্যে গল্প-উপন্যাস লেখেন। সমানতালে কিশোরদের জন্যেও লিখে চলেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *গ্রহান্তরের গাঁজাখোর*।

সুকুমার রুজ

জন্ম ১৯৬৩ সালে। পদার্থবিদ্যায় স্নাতক। সরকারি পরিবহণ কর্মী। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *দোয়েলের শিস, বিষাদ মেঘ, তোমরাও করবে আবিষ্কার* প্রভৃতি।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৬৪ সালে। তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ার। একটি বেসরকারি বিদ্যুৎসংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মী। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *আয় ঘুম, রাধিকা, পাপবিদ্ধ, শূন্যস্থান* প্রভৃতি।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৬৬ সালে। পড়াশোনা স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণি। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে কর্মরত। উল্লেখযোগ্য বই : *দোর্দোরুরর বাক্স, বনপাহাড়ি গল্পগাথা, কল্পলোকের গল্পগাথা* প্রভৃতি।

দীপান্বিতা রায়

আটের দশকের শেষদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেছেন। পেশা সাংবাদিকতা। ছোটোদের জন্যে লিখে পাঠকের নজর কেড়েছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *দিঠির দুপুর, বাহনের বায়নাক্কা, রূপকথার অরূপরতন* প্রভৃতি।

রাজেশ বসু

জন্ম ১৯৭১ সালে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিকসে স্নাতক। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকে কর্মরত। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও চমৎকার লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *পরির দুঃখ, কে* প্রভৃতি।

উল্লাস মল্লিক

জন্ম ১৯৭১ সালে। শিক্ষকতাই তাঁর পেশা। বড়োদের জন্যে গল্প-উপন্যাস লেখেন। পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *বন্ধকনামা, তিন চাকা, বক্সের বাইরে* প্রভৃতি।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

জন্ম ১৯৭৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ.। এখন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে অনেক ভালো উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *মানুষ-কুমির, কৃষ্ণলামার গুম্ফা, রানি হাটস্পেসুটের মমি* প্রভৃতি।

জয়দীপ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৭৪ সালে। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। শিক্ষকতাই তাঁর পেশা। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। মজাদার গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *নতুন স্কুলে গঙ্গাপদ, হিজিবিজির দেশে* প্রভৃতি।

বিনোদ ঘোষাল

জন্ম ১৯৭৬ সালে। বাণিজ্য শাখার স্নাতক। সাংবাদিকতার কাজ করেন। বড়োদের এবং ছোটোদের জন্যে লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই, *ডানাওলা মানুষ*।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৭৯ সালে। তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি সংস্থার কর্মী। বড়োদের ও ছোটোদের জন্যে লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *ডাকাতিয়া*।